Banglapdf.net

মারুফ

সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা

একটি জাতির জন্ম

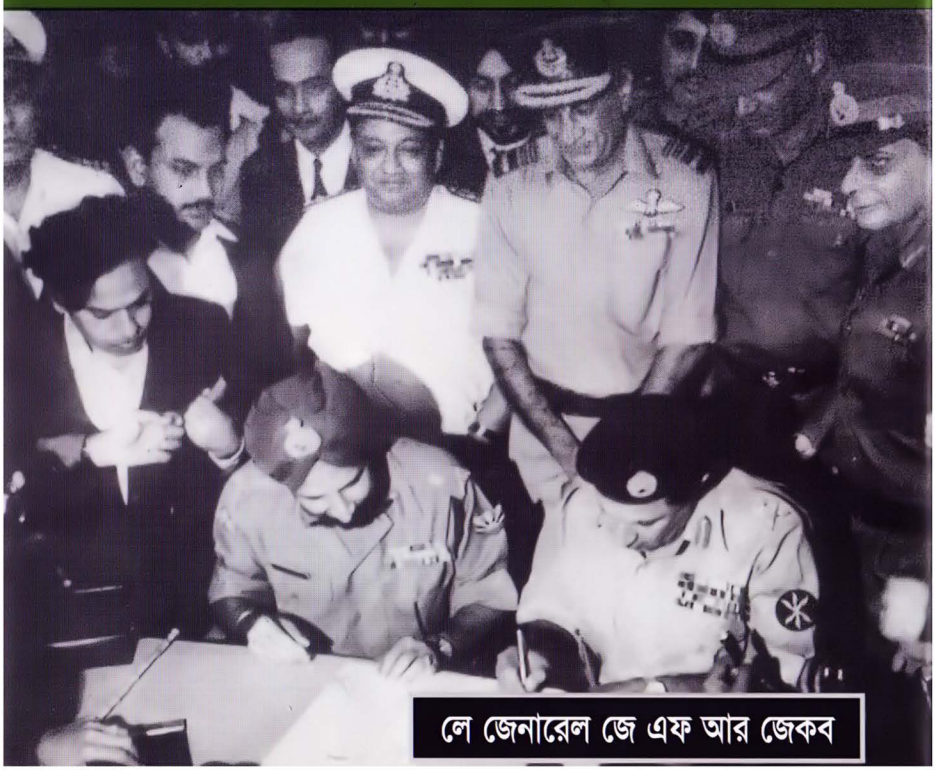

লে জেনারেল জে এফ আর জেকব

লে জেনারেল জে এফ আর জেকব

সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা

একটি জাতির জন্ম

২

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু দ্রুত গতিসম্পন্ন। মাত্র তের দিনব্যাপী এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মূলত নদীবহুল অঞ্চলে, আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যা আদর্শ।

২৬ মার্চ ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নগ্ন হামলা থেকে শুরু করে ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ সন্ধ্যায় পশ্চিমাঞ্চলে ভারতীয় বিমানঘাঁটিতে পাকিস্তানি বোমাবর্ষণ থেকে সৃষ্ট সর্বাত্মক যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সামরিক অভিযান, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ইস্টার্ন কম্যান্ডের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে যার পরিসমাপ্তি ঘটে – সবকিছুই লেখক বর্ণনা করেছেন।

স্ট্র্যাটেজির রূপরেখা আঁকতে গিয়ে কীভাবে প্রধান সড়ক এড়িয়ে পার্শ্বরাস্তা ব্যবহার করে শত্রুদের প্রতিরোধের শক্ত ঘাঁটিগুলোকে পাশ কাটিয়ে আক্রমণরেখা নির্বাচন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে মেইন্টেন্যান্সের জন্য পথ খুলে দেয়া হয়েছে, তার সমস্ত খুঁটিনাটি বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। দেশের প্রধান ভূ-রাজনৈতিক কেন্দ্র ঢাকার সাথে যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্রগুলো আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা ও দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের অসীম ত্যাগের কথা তিনি তুলে ধরেছেন। নিরাপত্তা পরিষদের চাপ এবং চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান-ঘেঁষা ভূমিকা ছাড়াও আত্মসমর্পণের আলোচনা ও দলিলে স্বাক্ষরের একটি প্রত্যক্ষ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন।

অপর ফ্ল্যাপে দেখুন

টাকা ৩০০.০০

এই অভিযানের রাজনৈতিক ও সামরিক পটভূমি থেকে লেখক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং রাজনৈতিক ও সামরিক – উভয় ক্ষেত্রে এবং যুদ্ধের জন্য অস্থায়ী উর্ধ্বতন কম্যান্ড স্থাপনে পরিষ্কার দিক-নির্দেশনার অভাবের কথা তুলে ধরেছেন। ১৯৭১-এর যুদ্ধ থেকে এখনো অনেক কিছু শেখার আছে। সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে সশস্ত্র বাহিনী, স্টাফ ও ওয়ার কলেজ এবং সামরিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেরই এই বইটি ভাল লাগবে।

লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল জ্যাক জেকব ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের ইস্টার্ন আর্মির চিফ অভ্ স্টাফ ছিলেন। যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধ চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর পালিত ভূমিকার জন্য ভারত সরকার তাঁকে পিভিসিএম (PVCM) পদকে ভূষিত করেন। জুলাই ১৯৭৮-এ জ্যাক জেকব সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ISBN 978 984 8815 64 9

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Banglapdf.net

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং MARUF

এডিটিং মারুফ

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা

সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা

একটি জাতির জন্ম

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে এফ আর জেকব

আনিসুর রহমান মাহমুদ
অনূদিত

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট হাউস
৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৫৬৫৪৪১, ৯৫৬৫৪৪৩, ৯৫৬৫৪৪৪
মোবাইল: ০১৯১৭৭৩৩৭৪১
E-mail: info@uplbooks.com.bd
Website: www.uplbooks.com.bd

প্রথম ইংরেজি সংস্করণ ১৯৯৭
স্বত্ব © লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে এফ আর জেকব

সপ্তম মুদ্রণ ২০১৪
প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৯৯৯
গ্রন্থস্বত্ব © দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

প্রচ্ছদ
তোফাজ্জল হোসেন

ISBN 978 984 8815 64 9

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০। মুদ্রণ: ইলোরা আর্ট পাবলিসিটি, ৬৩৫, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

Surrender at Dhaka: Ekti Jatir Janmo a Bengali translation of *Surrender at Dacca: Birth of a Nation* by Lt. Gen. J F R Jackob. This edition of the book is published in association with Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, India. This edition published in January 1999 by Mohiuddin Ahmed, The University Press Limited, Red Crescent House, 61 Motijheel C.A., Dhaka 1000, Bangladesh.

ভারতীয় সেনাবাহিনী
এবং
রেজিমেন্ট অভ্ আর্টিলারির প্রতি

I've eaten your bread and your salt.
I've drunk your water and wine.
The deaths ye died I've watched beside
and the lives ye lived were mine.

RUDYARD KIPLING

বাংলাপিডিএফ.নেট
স্ক্যান ও এডিট
মারুফ
fb.com/groups/Banglapdf.net
MARUF
Exclusively for
Banglapdf.net

সূচিপত্র

ভূমিকা	ix
গোড়ার কথা	১
যুদ্ধের অবতারণা	১৭
রাজনৈতিক পট পরিবর্তন	২৪
ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি	৩৬
পরিকল্পনার বিবর্তন	৪০
স্ট্র্যাটেজি	৪৩
রসদ ও সরবরাহ	৫৯
পাকিস্তানিদের সেনাবিন্যাস	৬৪
প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ	৬৬
মুক্তিবাহিনী	৬৯
মার্কিন ও চীনা ভূমিকা	৭৭
লড়াই	৮২
যুদ্ধের অগ্রগতি	৮৬
যুদ্ধের পরিণতি	১২৭
নাটকের কুশীলব	১৩১
অর্জিত শিক্ষা	১৩৫
স্মৃতিচারণ	১৪১
পরিশিষ্ট	১৪৭
নির্ঘণ্ট	২২৭

চিত্রসূচি

২৭-৩০ পৃষ্ঠার মধ্যে

১. জ্যাক জেকব, ১৯৪২ সালে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে

২. ১৯৯২ সালে মউ-এর অফিসার্স' ট্রেনিং স্কুলে নাম্বার ১ প্লাটুন 'এ' কোম্পানি। ওপরের সারির বাম দিক থেকে পঞ্চম জ্যাক জেকব, তাঁর ডানে 'ট্যাপি' রায়না

৩. ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ'

৪. লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

৫. লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল জ্যাক জেকব

৭১-৭৪ পৃষ্ঠার মধ্যে

৬. মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন সদস্য

৭. প্রশিক্ষণরত বাঙালি তরুণ-যুবক

৮. সশস্ত্র সংগ্রামে মুক্তিবাহিনী

৯. বয়রাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত পাকিস্তানি শ্যাফী ট্যাঙ্ক

১২৩-১২৬ পৃষ্ঠার মধ্যে

১০. বাম দিক থেকে: লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি, ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং, ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং ও জেকব — আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের আগে

১১. মার্চ ১৯৭২-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিদায়ী কুচকাওয়াজ

১২. আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছেন লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি; তাঁকে লক্ষ করছেন অরোরা (তাঁর ডানে) ও জেকব (পেছনে, বামে)

১৩. লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল জেকব ইস্টার্ন কম্যান্ডের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন; পেছনে উপবিষ্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

মানচিত্রসূচি

মানচিত্র ১	প্রাথমিক সেনাবিন্যাস এবং সৈন্য সমাবেশের এলাকায় সৈন্য চালনা	৮৩
মানচিত্র ২	পশ্চিম সেক্টর	৮৭
মানচিত্র ৩	উত্তর-পশ্চিম সেক্টর	৯২
মানচিত্র ৪	উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর	৯৬
মানচিত্র ৫	পাকিস্তানি সেনাবিন্যাস এবং ভারতীয় আক্রমণরেখা	বইয়ের শেষে

ভূমিকা

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণের ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত, যা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কম্যান্ডের আত্মসমর্পণ ত্বরান্বিত করেছিল, নিঃসন্দেহে এ যাবত আমাদের সামরিক ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য। এরপর প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেলেও এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তেমন কোনো প্রামাণিক নথিপত্র পাওয়া যায় না। সরকারি উদ্যোগে একটি ইতিহাস রচিত হলেও এখন পর্যন্ত তা প্রকাশের অপেক্ষায়। এর প্রণেতারা স্পর্শকাতর নথিপত্রের তেমন প্রবেশাধিকারও পাননি। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পাবার পর এই বই সরকারি ইতিহাস বলে স্বীকৃত হবে। ১৯৬২ সালের হেন্ডারসন ব্রুক্স (Henderson Brooks) রিপোর্ট এবং ১৯৬৫ সালের অভিযানের ইতিহাসই যখন এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, তখন প্রায় ধরেই নেয়া যায় যে, ১৯৭১-এর অভিযানের ইতিহাসও অদূর ভবিষ্যতে আলোর মুখ দেখবে না।

ইস্টার্ন কম্যান্ডের চিফ অভ্ স্টাফ হিসেবে মে ১৯৬৯-তে আমি নিয়োগ পাই এবং জুন ১৯৭২ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকি। সেটা ছিল এমনই এক সময়, যখন এই অঞ্চলের ঘটনাবলিতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল এবং আমরাও ক্রমশ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি এসে পড়ছিলাম। পশ্চিমবঙ্গে নক্শাল আন্দোলন তখন এমন আকার ধারণ করে যে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে রীতিমতো সন্দেহ দেখা দেয়। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আমাদেরকে দুই ডিভিশন সৈন্য ও ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেড নিয়োজিত করতে হয়। পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের জনগণের ওপরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হামলার অব্যবহিত পরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের অস্থিতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে আকস্মিক কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তা সামাল দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে সেনাবাহিনী মজুত রাখতে হয়। কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সে থেকে আমরা ঠিকই বুঝতে পারছিলাম যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার বিরোধ যে কোনো সময় মূর্ত হয়ে উঠতে পারে এবং সেক্ষেত্রে যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে আমাদের ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। আমরা বরং শঙ্কিত ছিলাম এর রাজনৈতিক বিস্তৃতি নিয়ে, যা নিয়ন্ত্রণ করা অনেক বেশি দুরূহ বলে পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়। যুদ্ধে অর্জিত আমাদের সমস্ত সাফল্য ১৯৭২-এ সিমলায় অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক আলোচনায় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বাংলাদেশের জন্ম এই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের

ওপরে যে প্রভাব ফেলে, সে বিষয়টি আগে থেকে বিবেচনা করা হয়নি এবং এজন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতিও আমাদের ছিল না।

যুদ্ধ এক জটিল ব্যাপার। এতে সব শ্রেণীর জনগণ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। সামরিক অভিযান পরিচালনা করা সহজ ব্যাপার নয় এবং এর গতিপ্রকৃতিও খুব স্বচ্ছন্দ নয় আর এ ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে কোনো আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা কখনোই সম্ভব নয়। অভিযানের সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করে উদ্ভাবনী পরিকল্পনা, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবার মতো নমনীয়তা, দ্রুত রিঅ্যাক্ট করার ক্ষমতা এবং সেই ধরনের দূরদৃষ্টির ওপরে যাতে পরিকল্পনা ও প্রত্যাশা বাস্তবতার সীমা অতিক্রম না করে। এছাড়াও সফল সামরিক অভিযানের জন্য চাই সুষ্ঠু অবকাঠামো এবং রসদ ও যোগাযোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। ভাগ্যও অবশ্য এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই, যে অপারেশনে আমরা জড়িত, সেটার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, সামরিক ও অবকাঠামোগত ধারণালাভের জন্য তার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। ১৯৭১-এর যুদ্ধের বিবরণ ও পূর্ব রণাঙ্গনে পরিচালিত সামরিক অভিযানের বর্ণনা আমি এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছি। এটা এমন এক বিষয়, যার সাথে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম এবং যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার আছে।

১৯৭১-এর যুদ্ধের পর ভারত আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তার ভূকৌশলগত (geostrategic) স্বার্থ শুধু ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। স্থলসীমানা ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও তার স্বার্থ বিস্তৃতি লাভ করে। ভবিষ্যতে কখনো যুদ্ধ হলে নিশ্চিতভাবে তা ১৯৬৫ ও ১৯৭১-এর যুদ্ধের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী হবে। অপারেশনের ধরনও হবে ভিন্নতর। অবকাঠামোগত ও শিল্পস্থাপনাসমূহ প্রায় নিশ্চিতভাবেই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে বলে ধরে নেয়া যায়। কাজেই আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে আরো ভালভাবে আমরা উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারি। সেই লক্ষ্য অর্জনে এই বই কিছুটা হলেও অবদান রাখতে সমর্থ হবে বলে আমি আশা রাখি।

১৯৬২, ১৯৬৫, এমনকি ১৯৭১ সালেও আমরা আমাদের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট ও স্বার্থের জন্য হুমকি - এমন বিষয়গুলোর ভূকৌশলগত ও সামরিক গুরুত্ব নিরূপণে ব্যর্থ হয়েছি। স্বচ্ছ কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য বা সুনির্ধারিত দিকনির্দেশনা ছিল না। যুদ্ধ পরিকল্পনা, সমন্বয় ও নির্বাহ করার মতো উপযুক্ত অবকাঠামো ছিল না। এমনকি এখনও আমাদের স্থায়ী একজন চিফ অভ্ ডিফেন্স স্টাফ নেই বা পর্যাপ্ত জনবলসহ একটি সাহায্যকারী সংস্থা নেই। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল বলতে কিছু নেই। অদূরভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের সংস্থার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলে সেটাও হবে স্বল্পায়ু পূর্বসূরীদের মতোই নামসর্বস্ব ও মেরুদণ্ডহীন। অতীতে গোয়েন্দা তথ্যের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এই অবস্থার আজ পর্যন্ত তেমন

কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়নি। এসব কারণে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের পরিচালিত অভিযান থেকে আমাদের লব্ধ শিক্ষা নথিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি, যাতে এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের সামরিক অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ করে আমরা অনাগত দিনের নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারি। আমাদের একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন তাঁর নেই, কারণ তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেন। কিন্তু একথাও তো সত্যি যে, যাঁরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন না, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করাই তাঁদের ভাগ্যর লিখন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে, সামরিক ইতিহাস পাঠ করে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমার বিশ্বাস, একটি যুদ্ধের শুরু থেকে যুদ্ধ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, রসদ, সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা কীভাবে করতে হয়, যুদ্ধের পরিকল্পনায় কী কী বিষয় বিবেচনায় আনতে হয় এবং সর্বোপরি কীভাবে যুদ্ধ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা এই বই থেকে পাওয়া যাবে।

নয়া দিল্লী, ১৯৯৭ জে এফ আর জেকব

গোড়ার কথা

৩১ জুলাই ১৯৭৮-এর ঘটনা। আর্মি কম্যান্ডার হিসেবে আমার চার বছরের মেয়াদ শেষ পর্যায়ে। শেষবারের মতো আমি ইউনিফর্ম গায়ে চড়ালাম। স্যাম ব্রাউন-এর বাক্‌ল্‌স এঁটে তরবারিটি খাপে পুরলাম। চামড়ার এই উজ্জ্বল ঝকমকে চেহারা শুধু গোর্খা পরিচারকের ঐতিহ্যবাহী থুতু-পালিশ আর কনুইয়ের গ্রিজের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিলাম — চিরাচরিত নিয়মে টুপিটা (peak cap) ডানদিকে ঈষৎ বাঁকা; অতীতে শুভাকাঙ্ক্ষী সিনিয়র অফিসাররা এই দোষ শোধরাবার জন্য কত ব্যর্থ উপদেশই না আমাকে দিয়েছেন! ফোর্ট উইলিয়ামে অবস্থিত ইস্টার্ন কম্যান্ডের হেডকোয়ার্টার্সে আমার শেষদিনের অফিস করতে যাবার জন্য আমি তৈরি। অফিসার ও জওয়ানরা অপেক্ষা করছে — তাদের কেউ কেউ আমার উত্তরসূরির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত, পরদিন যাঁর আসার কথা। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আমি সবাইকে বিদায়সম্ভাষণ জানালাম।

কামান পার্কের সামনে জাঁকজমকপূর্ণ গার্ড অভ্‌ অনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় যতসব বিচিত্র ধরনের কামান আমি দেখেছি, তার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি সংগ্রহ করে আমি ইস্টার্ন আর্মির স্থাপনায় মনুমেন্ট হিসেবে বসাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। ব্রোঞ্জ আর পিতলের তৈরি কামানগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের কত ঘটনার সাক্ষী — সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্য তৈরি একটি কামানে এখনো গোলার আঘাতের চিহ্ন আছে। এছাড়াও আছে মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের সেনাবাহিনীর কামান, ফোর্ট উইলিয়ামে ঢালাই করা কামান, ওলন্দাজ জাহাজের কামান এবং পলাশীর যুদ্ধে ব্যবহৃত কামান।

ঘন কালো মৌসুমী মেঘ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, সূর্য তার রশ্মি দিয়ে মেঘের দুর্ভেদ্যতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। পালিশ-করা পিতল আর ঝকঝকে জুতো সূর্যের ক্বচিৎ কিরণে ঝিকিয়ে উঠছে। গার্ড অভ্‌ অনারে অনেক পরিচিত মুখ দেখলাম – এদের অনেকে আমার বাসায় পাহারার কাজ করেছে। আমার পথপ্রদর্শক (pilot) ও অগ্রবর্তী নিরাপত্তা রক্ষীদের (outrider) সাথে বেরিয়ে এলাম। প্রথা অনুযায়ী সমবেতকণ্ঠে সৈন্যরা শ্লোগান দিল, "জেনারেল জেকব সাহিব কি জয়"। অফিসারদের মেস পেরিয়ে এলাম — এর সামনে গ্রানাইটের দুটো সিংহ; একটির ভঙ্গি সতর্ক, অন্যটি শায়িত। এই সিংহদুটো আমি এনেছিলাম হুগলি নদীর তীরবর্তী প্রিনসেপ

(Princep) ঘাট থেকে। বিতর্কিত একটি ব্রিজ নির্মাণের জন্য ঘাটটি তখন ভেঙে ফেলা হচ্ছিল। মোটর শোভাযাত্রা ফোর্টের ইস্ট গেটের (আগে এর নাম ছিল পলাশী গেট) প্রধান নিষ্ক্রমণপথ দিয়ে বেরিয়ে কলকাতা শহরের দিকে যাত্রা শুরু করল।

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালের শুরুর দিকে এই পলাশী গেট থেকেই আমার সামরিক জীবন শুরু হয়েছিল এবং সেই একই গেট দিয়ে এক জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটল। স্মৃতি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল সেই উত্তপ্ত উজ্জ্বল এপ্রিলে। গ্রীষ্মের দাবদাহে কালো অ্যাসফল্টের রাস্তা সেদিন চকচক করছিল আর আমি পলাশী গেট ও সংলগ্ন পরিখার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলাম। কাছাকাছি আঁসার পর ব্রিটিশ গ্যারিসন ব্যাটালিয়নের এক সেন্ট্রি আমাকে থামাল। পরনে তার কড়া মাড় দেয়া খাকি হাফপ্যান্ট, হোসটপ (hosetop), অ্যাঙ্কলেট (anklet), চকচকে জুতো আর একটা সোলার টুপি—সে যুগের বাধ্যতামূলক শিরাবরণ। আমাকে যে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়েছে, সেটা বলার পর সে আমাকে এরিয়া হেডকোয়ার্টার্সের রাস্তা দেখিয়ে দিল। বিশাল চারতলা ব্যারাক। সেখানে পুরো ব্যাটালিয়নের থাকার ব্যবস্থা, তার দপ্তর, স্টোর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা। এই গ্রহের সবচেয়ে বড় ব্যারাক সম্ভবত এটাই।

এরিয়া কম্যান্ডার মেজর জেনারেল হেইডিম্যান (Heydeman) আমার ইন্টারভিউ নিলেন। তাঁকে প্রথমে আমার খুব কড়া নীরস ধরনের মানুষ বলে মনে হলেও সময়ের সাথে সাথে তাঁর কঠোর মুখোশ নরম হতে থাকল। স্কুল-কলেজ, ক্রিকেট, রাগার (এক ধরনের রাগবি) ও ক্যাডেট কোরে আমার জীবন নিয়ে আমরা দীর্ঘক্ষণ কথা বললাম। কথাবার্তার পর তিনি আমাকে জানালেন যে, এরপর আমাকে সিমলায় অবস্থিত জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে আরেকটি ইন্টারভিউ দিতে হবে। ফুরফুরে মেজাজে আমি পলাশী গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম। নতুন এক জীবনের দ্বারপ্রান্তে আমি। এখন শুধু শুরুর অপেক্ষা।

ব্রিটিশ ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলা হিমালয় পর্বতমালার অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর একটি জায়গা। বনাচ্ছন্ন এই শহর একটি মোচাকৃতি শৈলচূড়ার ওপরে অবস্থিত। ভারতের রাজধানী ও জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে দিল্লীর গরম আর ধুলো থেকে শীতল পাহাড়ে চলে যেত। যে ইমারতগুলোতে আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের থাকার ব্যবস্থা হত, সেগুলোর নির্মাণশৈলী ছিল অদ্ভুত — স্টীলের কাঠামোর ওপরে কাঠের তৈরি ইমারত। জোড়াগুলো এমনভাবে দেয়া, যাতে তা ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলাতে পারে। বড় বড় বানর সেখানে করিডরে দোল খায়, মনের আনন্দে তিড়িং-বিড়িং লাফালাফি করে। আর তাদেরকে ধরার চেষ্টা বা তাড়া করার মতো বোকামি কেউ করলে তাকে আঁচড়ে দিয়ে বা মুখ ভেংচি দিয়ে পালায়।

গ্যাবার্ডিনের সার্ভিস ড্রেসপরা কয়েকজন অফিসার আমার ইন্টারভিউ নিলেন। তাঁদেরকে সহায়তা করছিলেন একজন অধস্তন মহারাজা। পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, স্কুল, ইউনিভার্সিটি, খেলাধুলো, শিকার ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলির মধ্যে

থেকেই প্রশ্ন হল। যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো কথাই হল না। দূরের যুদ্ধ দূরেই রয়ে গেল। এরপর অফিসার্স' ট্রেনিং স্কুলের নির্দেশের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে বলা হল।

অক্টোবর ১৯৪১-এ আমি মউ (Mhow)-তে অবস্থিত অফিসার্স' ট্রেনিং স্কুলে রিপোর্ট করি। মউ নামের এই ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্টটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রতিষ্ঠিত। ধারণা করা হয় যে, মউ নামটি মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্স অভ্ ওয়ার (**M**ilitary **H**eadquarters **o**f **W**ar)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। কিন্তু এই নামটি ক্যান্টনমেন্টসংলগ্ন মউ (Mau) গ্রামের নামের অপভ্রংশ হবার সম্ভাবনাই বেশি। ১৮৫৭ সালে বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহের সময় প্রথম এই ক্যান্টনমেন্টের গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাদ্রাজ, বোম্বে ও বাংলার মধ্যে শুধু বাংলার সিপাহিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং মউই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে জেনারেল স্যার হিউ রোজ (Hugh Rose) ঝাঁসির রানির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য বোম্বে থেকে সৈন্য জড়ো করেছিলেন।

ক্যাডেটের জীবন বড় কঠিন জীবন। আমাদেরকে অফিসার হিসেবে দেখা হলেও ট্রেনিং ছিল খুবই কঠিন। প্রতি দু'জনের জন্য একটি করে রুম বরাদ্দ ছিল। ঘরের কাজকর্ম ও জুতো-বেল্ট পালিশের জন্য একজন করে আরদালি ছিল। ট্রেনিং কোর্স ছ'মাস মেয়াদের হবার কথা ছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারি ১৯৪২-এ কোম্পানি কম্যান্ডারের অফিসে আমার ডাক পড়ল এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আমাকে আর্টিলারিতে যোগ দিতে বলা হল। আমি বললাম, যেহেতু আর্টিলারি আমার প্রথম পছন্দ হিসেবে আমি উল্লেখ করিনি এবং আমার ফলাফলও এ যাবৎ যথেষ্ট ভাল, সেহেতু আমাকে আমার পছন্দ অনুযায়ী কমব্যাট আর্মে দেয়া উচিত। আমাকে যেটা করতে বলা হয়েছে, আমাকে সেটাই করতে হবে বলে তিনি কথাবার্তার ইতি টানলেন। সেই যুগে আর্টিলারি খুব জনপ্রিয় ছিল না। কারণ, এজন্য বাড়তি ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন পড়ত। এর অর্থ, অন্যান্য ক্যাডেটদের তুলনায় কয়েকমাস পরে কমিশন পাওয়া। এছাড়াও কাকুল (Kakul) থেকে দেওলালি (Deolali)-তে সরিয়ে নেয়া আর্টিলারি স্কুলে সেই প্রথম যুগে আবাসিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছিল খুবই অপ্রতুল। তার ওপরে ট্রেনিংয়ে অকৃতকার্যতার হারও ছিল খুব চড়া। ফলে আর্টিলারিতে যাবার ব্যাপারে ক্যাডেটরা স্বভাবতই নিরুৎসাহিত হত।

কয়েকদিনের ছুটি কাটিয়ে ছুটির পরে আমাকে সরাসরি দেওলালিতে চলে যেতে বলা হল। সেটা ছিল ১৯৪২ সালের গ্রীষ্ম। আমিসহ মোট চারজনকে একটি তাঁবুতে থাকতে দেয়া হল। লণ্ঠনের আলোতে রাতে আমাদেরকে পড়াশোনা করতে হত। লোকজন যারা ছিল, তারা হয় অদক্ষ, না হয় অনভিজ্ঞ। আমাদের ইনস্ট্রাক্টর ছিল কলকাতার এক পাট কোম্পানির রিজার্ভ অফিসার (আমাদের ভাষায় "বক্সওয়ালা" অর্থাৎ ব্যবসায়ী)। তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল নিয়মিত ফিল্ড রেজিমেন্টের এক বম্বার্ডিয়ার, শিক্ষকতার কোনো অভিজ্ঞতাই যার ছিল না। পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ দেবার চেয়ে গালিগালাজ ও ভর্ৎসনার পেছনে সে বেশি সময় ব্যয় করত। তা সত্ত্বেও মাত্র সাত

সপ্তাহের মধ্যে এত ট্রেনিং সারাজীবনে আর পাইনি। বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামের ওপরে আমাদের ট্রেনিং হল: অপ্রচলিত বাতিল হয়ে যাওয়া ১৮ পাউন্ডের কামান, ৪.৫ ইঞ্চি কামান এবং তারপরে নির্ভরযোগ্য সেই ২৫ পাউন্ডের কামান। ক্যাডেটদের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। বাকিদেরকে ইনফ্যান্ট্রিতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। ৭ জুন ১৯৪২-এ কাঁধের ওপরে সেকেন্ড লেফ্‌ট্‌ন্যান্টের চিহ্ন একটি ঝকঝকে তারকা নিয়ে আমি দেওলালি ত্যাগ করি।

ট্রেনিং ডিভিশনে অল্প কিছুদিন থাকার পরে অগাস্ট ১৯৪২-এ একটি রেজিমেন্টের কাজে আমাকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। বোম্বে থেকে বসরা (Basra) পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রার মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। আমরা অফিসাররা কেবিনে আরামদায়ক পরিবেশে থেকেছি আর চমৎকার পরিবেশে পানাহার করেছি। কিন্তু সাধারণ সৈন্যদের জীবন ছিল একেবারে বিপরীত — খোলা ডেক, টয়লেটের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা আর বাজে খাবার ছিল তাদের বরাদ্দ। অধিকাংশ সৈন্যেরই সী-সিকনেস দেখা দিয়েছিল। ফলে, দুর্গন্ধে ডেকের ওপরে এক পূতিগন্ধময় বিবমিষা উদ্রেককারী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর আমরা আবাদান (Abadan)-এর তেল শোধনাগার পেরিয়ে বসরার খেজুর গাছশোভিত উপকূলে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত শাত-ইল-আরব (Shatt-el-Arab)-এর শান্ত সমুদ্রে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মালগাড়িতে করে বাগদাদ (Baghdad) রওনা দেবার আগে কয়েকদিন শাইবা (Shaiba)-র ট্রানজিট ক্যাম্পে থাকতে হয়েছিল। সম্ভবত শাইবাতেই মরুভূমির মাছির কামড়ে আমার জ্বর হয়। ফলে বাগদাদে পৌঁছেই ব্রিটিশ মিলিটারি হাসপাতালে আমাকে ভর্তি হতে হয়।

সুস্থ হওয়ার পরপরই আমাকে একটি আর্টিলারি রেজিমেন্টে পোস্টিং দেয়া হয়। পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রচণ্ড মার খাবার পর রেজিমেন্টটি পুনর্গঠন করা হচ্ছিল। আমাকে একটি গান-ট্রুপের কম্যান্ড দেয়া হয়। আমার সিনিয়র গানম্যান কোনোরকমে শুধু পড়তে আর লিখতে জানতেন। তিনি আমাকে শেখান কীভাবে কামান খুলতে আর সার্ভিস করতে হয়। আরেক ট্রুপের কম্যান্ডার র‍্যাল্‌ফ সেটাট্রি (Ralph Settatree) আগে ব্যাংকে কাজ করেছেন। তিনি আমাকে জনশক্তি ব্যবস্থাপনা আর কীভাবে সৈন্যদের চালাতে হয়, তা শেখান। পেশায় আইনজীবী আমার ব্যাটারি কম্যান্ডার ও এলাকাভিত্তিক আর্মি অফিসার মেজর ডিক পিটার্স (Dick Peters) ছিলেন দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। ভূতপূর্ব স্বর্ণকার নরম্যান হার্ডিং (Norman Harding) ছিলেন ব্যাটারি ক্যাপ্টেন। ডিক পিটার্স আর নরম্যান হার্ডিংয়ের কাছে আমার অনেক ঋণ। তাঁদের দুজনই আমাকে কম্যান্ডের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো শিখিয়েছেন।

উত্তর ইরাকে স্থাপিত ৮ ইন্ডিয়ান ডিভিশনের অংশ ছিলাম আমরা। আসন্ন ইতালি অভিযানের জন্য ডিভিশনটি প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। নিজের কাজে দক্ষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ডিভিশনাল কম্যান্ডার রাসেল 'পাশা' (Russell 'Pasha') সব স্তরের সৈন্যদের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন। এর বহু বছর পরে ১৯৪৯ সালে রাসেল 'পাশা'র সাথে আমার যখন দেখা হয়, তখন তিনি চিফ অভ্ আর্মি স্টাফ জেনারেল কারিয়াপ্পা (Cariappa)-র

উপদেষ্টা। পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পাশার প্রতিভা জেনারেল কারিয়াপ্পা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের একজন জেনারেল স্টাফ অফিসার হিসেবে পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে প্রায়ই আমাকে যেতে হত। যতবারই গেছি, প্রতিবারই তাঁর কাছে আমি নতুন কিছু শিখে এসেছি। রাসেল 'পাশা' ছিলেন ভদ্রতা ও সৌজন্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। তাঁর কাছে আমি অনেক শিখেছি। তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। কস (Cos) ও লেরস (Leros) দ্বীপপুঞ্জ দখলের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক পরিকল্পনা বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন। পরিকল্পনাকারীরা শেষে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, দ্বীপগুলোতে যেহেতু জার্মান আর ইতালিয়ানদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান, তারাই পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখবে। ফলে ৮ ইন্ডিয়ান ডিভিশনের পক্ষে দ্বীপ দখল করা কঠিন হবে না। সভা পরিচালনাকারী অ্যাডমিরাল একদম শেষ পর্যায়ে রাসেলের মত জানতে চাইলেন। এ পর্যন্ত আলোচিত কোনো বক্তব্যের সাথেই রাসেল একমত ছিলেন না। তিনি উত্তর দিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, গ্রিম ব্রাদার্স পড়া আমি ছেড়েছি সেই বারো বছর বয়সে।"

১/৫ রয়্যাল গুর্খা রাইফল্‌সের সাথে আমাদের ট্রুপের অ্যাফিলিয়েশন ছিল। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ব্রিগ্‌স (Briggs) ছিলেন ব্যাটালিয়নের কম্যান্ডিং অফিসার। 'ব্রিগো (Briggo এই নামেই সবাই তাঁকে ডাকত)' ছিলেন পিতৃসুলভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সবই তাঁকে খুব পছন্দ করত। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর শ্রবণশক্তি ছিল একটু কম। কখনো কোনো মৌখিক অর্ডার ইস্যু হলে তাঁর জন্য সেটা আমি নোট করে নিতাম। ১৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের কম্যান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনকিন্‌স (Jenkins)। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ কিরকুক (Kirkuk) তৈলক্ষেত্রে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা করছিল বলে উত্তর ইরাকে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য এই ব্রিগেডকে নির্দেশ দেয়া ছিল। আর্টিলারি সাপোর্ট ও ট্যাঙ্কবিধ্বংসী প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমাকে ডেপুটেশনে সেই ব্রিগেডে পাঠানো হয়েছিল। র‍্যাঙ্কের দিক থেকে সামান্য সেকেন্ড লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট হলেও অমূলক আতঙ্ক যাতে আমাকে গ্রাস না করে, সে ব্যাপারে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। ট্রুপ নিয়ে আমি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে আশেপাশের সম্পূর্ণ এলাকা ভালভাবে জরিপ করে নিয়ে ব্রিগেড অর্ডার্স গ্রুপে রিপোর্ট করলাম। ব্রিগেডিয়ার জেনকিন্‌স প্রস্তাবিত আত্মরক্ষামূলক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইলেন। যৌবনের দৃপ্ততা নিয়ে আমি উত্তর দিলাম, "স্যার, আপনার আত্মরক্ষামূলক পরিকল্পনা আমার কাছে যথাযথ মনে হচ্ছে না। কারণ ট্যাঙ্ক প্রতিরোধের সামান্যতম ব্যবস্থাও এতে নেই।" উঁচু-নিচু খানিকটা জায়গা দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এটার ব্যাপারে তোমার ধারণা কী?" আমি বললাম, "এটা পরিষ্কার করার জন্য ৭৫ মিমি. কামানের গোটা-দুয়েক গোলাই যথেষ্ট।" এক মিনিটের পিনপতন নিস্তব্ধতার পর জেনকিন্‌স প্রশ্ন করলেন, "ঠিক আছে গানার (gunner), তাহলে তোমার পরামর্শটা কী?" আমি বললাম, "কয়েকশ গজ পেছনে যে মরূদ্যানটা আছে, সামান্য পরিশ্রম করলে সেটাকেই ট্যাঙ্ককে বাধা দেবার একটা ফলপ্রদ ব্যবস্থায়

রূপান্তরিত করা যেতে পারে।" জেনকিন্‌স তখন বললেন, "ব্রিগো, গিয়ে দেখে এস কী করা যায়।" আমার পরামর্শ গৃহীত হলে আমার আত্মবিশ্বাস প্রবলভাবে বেড়ে যায়। জেনকিন্‌স ছিলেন যোগ্য কম্যান্ডার এবং সবাই তাঁকে পছন্দ করত। পরবর্তী সময়ে ইতালিতে ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসারবিদ্বেষী মন্টগোমারি (Montgomery) কর্তৃক বার্ধক্যের অজুহাতে তাঁকে কম্যান্ড থেকে সরিয়ে দেবার ঘটনাটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, স্যান্ডহার্স্ট (Sandhurst)-এ মন্টগোমারি ইন্ডিয়ান আর্মিতে পোস্টিংয়ের জন্য দরখাস্ত করলেও মনোনীত হবার মতো যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন।

আমাদের প্রশিক্ষণ হয় সুদক্ষ সুশিক্ষিত গ্লুব'স অ্যারাব লেজিয়ন (Glubb's Arab Legion)-এর সাথে। সেই এলাকায় নিয়োজিত ইরাকি সৈন্যদল ছিল অদক্ষ ও বিশৃঙ্খল। কিন্তু জেনারেল অ্যান্ডার্স (Anders)-এর অধীনে পোলিশ কার্প্যাথিয়ান ডিভিশনের আস্তানা ছিল অদূরেই। ওরা ছিল খুব অতিথিপরায়ণ। অ্যান্ডার্সের সাথে আমার বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাঁর ঐকান্তিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ওই এলাকার কুর্দদেরকেও আমি বেশ পছন্দ করতাম, যদিও তারা স্রেফ মজা করার জন্যই দূর থেকে আমাদের দিকে এলোমেলো গুলি ছুঁড়ত।

আমাদের রেজিমেন্টটি শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে না পারার কারণে শক্তি বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়। রেজিমেন্টটি তাই পুনর্গঠিত করার জন্য আমাদেরকে ভারতে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত আমাদেরকে প্রচণ্ড নিরাশ করে। প্রথমে আমাদেরকে ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে যেতে বলা হয়। পরে অবশ্য এই পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। কারণ আমাদের যানবাহনগুলো কাজে লাগাবার জন্য রেখে যেতে বলা হয়। ফলে সমুদ্রপথে আমরা প্রথমে করাচি ও পরে শিয়ালকোটে পৌঁছাই। খুব শিগ্‌গিরই আমাদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জামাদির ঘাটতি পূরণ করা হল। কিন্তু আমাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যের বদলে জঙ্গলের যুদ্ধের ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হল রাঁচির কাছাকাছি এক জঙ্গলে। আমাকে অল্প সময়ের জন্য রামগড়ের নিকটবর্তী এলাকায় প্রশিক্ষণরত স্টিলওয়েলের চাইনিজ (Stilwell's Chinese) ফোর্সে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়। আমরা ছিলাম ১৫শ ইন্ডিয়ান কোরের অন্তর্ভুক্ত ২৬ ইন্ডিয়ান ডিভিশনের অংশ। জেনারেল 'বিল' স্লিম ('Bill' Slim) ছিলেন এই কোরের কম্যান্ডার। বাস্তববাদী ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন স্লিম সকলের কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি জানতেন, মানবসম্পদ কীভাবে পরিচালনা করতে হয়। সকলের সাথেই তাঁর কথাবার্তা ছিল খোলামেলা এবং কোনো প্রটোকলের পরোয়া তিনি করতেন না। শিগগিরই তাঁকে ১৪শ আর্মির কম্যান্ডার হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। ফলে ১৫শ কোর সরাসরি হেডকোয়ার্টার্স অ্যালাইড ল্যান্ড ফোর্সেস সাউথ-ইস্ট এশিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। স্লিমের বদলে ১৫শ কোরের অধিনায়কত্বে আসেন লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল ক্রিস্টিনসন (Christinson)। মেধা ও প্রতিভার দিক থেকে ক্রিস্টিনসন স্লিমের সমকক্ষ ছিলেন না বলে আমরা খুব হতাশ হয়েছিলাম। ২৬ ইন্ডিয়ান ডিভিশনের অংশ

হিসেবে এই রেজিমেন্ট বার্মার আরাকান (Arakan) রণাঙ্গনে কাজ করে। মায়ু (Mayu) রেঞ্জের ঘন জঙ্গলে ও আরাকান উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় স্থল ও জলযুদ্ধে এই ডিভিশন অসামান্য কৃতিত্বের সাথে লড়াই করে। জাপানিদের বিমানহামলায় আমি যেখানে আহত হয়েছিলাম, সেই র‍্যামরী (Ramree) দ্বীপ দখলের পর ডিভিশনের অংশবিশেষের সাথে পাওনা ছুটি কাটাতে ট্রুপ-শিপ এমভি দুনেরা (MV Dunera)-তে করে আমি মাদ্রাজে চলে যাই। কিন্তু আমরা মাদ্রাজে পৌঁছানোর পর আমাদের ওপরে হুকুম আসে সমস্ত সাজ-সরঞ্জামসহ শহরের রাস্তা দিয়ে রুট মার্চ করে যাবার। এরপর আমাদেরকে আবার জাহাজে উঠিয়ে সমুদ্রে রওয়ানা করানো হয়। প্রতিশ্রুত বিশ্রাম না পেয়ে আমরা খুবই নিরাশ হয়ে পড়ি। র‍্যামরী দ্বীপের তটরেখা দেখার আগে পর্যন্ত আমরা কেউই জানতাম না কোথায় যাচ্ছি। নোঙর ফেলার পর নতুন ডিভিশনাল কম্যান্ডার মেজর জেনারেল চেম্বার্স (Chambers) আমাদের পরিদর্শনে এলেন। এই চেম্বার্স আগে ছিলেন ১৫শ কোরের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ এবং কোর কম্যান্ডারের প্রিয়পাত্র। তিনি এসেছিলেন এই ডিভিশনের জনপ্রিয় কম্যান্ডার মেজর জেনারেল লোম্যাক্স (Lomax)-এর পরিবর্তে। চেম্বার্স সকলের উদ্দেশ্যে একটি বক্তৃতা দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন এবং একটি দীর্ঘ অপ্রাসঙ্গিক ছেলে-ভোলানো ভাষণ দেন। সৈন্যদের, বিশেষত ব্রিটিশ ব্যাটালিয়ন লিঙ্কনশায়ার (Linconshire) রেজিমেন্টের ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা গেল এবং খুকখুক কাশির শব্দও বেশ শোনা গেল। চেম্বার্স ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করা শুরু করতেই ব্রিটিশ সৈন্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, 'দুয়ো' ধ্বনি ও বিড়ালের ডাক দিতে শুরু করল। চেম্বার্স গ্যাংওয়ে বেয়ে গটগট করে নেমে আরো দুয়ো আর হিস্‌হিসের মধ্যে পাশে ভেড়ানো লঞ্চে গিয়ে উঠলেন। ব্যাটালিয়নের ব্রিটিশ অফিসাররা তাঁদের সৈন্যদেরকে থামানোর কোনো চেষ্টাও করেননি। আমাদের জাহাজ ঘাটে ভেড়ার পরপরই ১৫শ কোরের বেশ কিছু স্টাফ অফিসার এসে আমাদেরকে পরিদর্শন করে আমাদের মনোবল যাচাই করে গেলেন। লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন (Louis Mountbatten) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ঘুরে ঘুরে সকলের সাথে কথা বললেন। বহু বছর পরে ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ট ব্র্যাগ (Bragg)-এ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে আবার আমার দেখা হয়। র‍্যামরীর ঘটনা স্মরণ করে তখন তিনি বলেছিলেন যে, হাই কম্যান্ড সে সময়ে রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তারপরে অবশ্য তিনি বলেন যে, অপারেশনের পরিকল্পনাকারী ও ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে সমন্বয়ের মারাত্মক ঘাটতি ছিল। প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ওপরে সরাসরি আক্রমণ করা। পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন ও শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্য র‍্যামরী দ্বীপের ওপরেও আক্রমণের ভান করতে ইন্টেলিজেন্সকে বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে পরিকল্পনার পরিবর্তন করা হয় এবং র‍্যামরী দ্বীপই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। এই খবর ইন্টেলিজেন্সকে জানানো হয়নি। ফলে তারা র‍্যামরীতে মহড়া-আক্রমণ অব্যাহত রাখে। ভাগ্যক্রমে তারা আমাদের অবতরণক্ষেত্রের কয়েক মাইল দক্ষিণে

মাউন্ট পিটার (Mount Peter)-এর উপকূলে আক্রমণ চালাচ্ছিল। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মাউন্টব্যাটেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। বার্মা অভিযানের স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলোর কথা ছাড়াও তিনি ভারতবর্ষের জন্য তাঁর ভালবাসার কথা বললেন। আর গর্বের সাথে স্মরণ করলেন সাউথ-ইস্ট এশিয়া কম্যান্ডের সুপ্রীম কম্যান্ডার হিসেবে তাঁর দিনগুলোর কথা।

জাপানিরা কয়েকদিন আগে শহর ছেড়ে যাওয়ায় ২৬ ইন্ডিয়ান ডিভিশন শিগগিরই রেঙ্গুন দখল করে নেয়। এরপরে ডিভিশনটি বিশ্রামের জন্য ভারতে ফিরে যায় এবং তারপরে তাদেরকে ব্যাঙ্গালোরে পাঠানো হয় অপারেশন 'জিপার (Zipper)'-এর প্রস্তুতি নিতে। জিপার ছিল মালয় আক্রমণের সাঙ্কেতিক নাম। যাহোক, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফেলার পরে জাপানিরা আত্মসমর্পণ করে। এরপরেই আমাদের ডিভিশনকে সুমাত্রায় পাঠানো হয় জাপানিদেরকে নিরস্ত্র করতে এবং যুদ্ধবন্দি ও নারী-পুরুষনির্বিশেষে সমস্ত বেসামরিক নাগরিককে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে স্বাভাবিক জীবনে তাদের প্রত্যাবাসনে সহায়তা করতে। বেলাওয়ান (Belawan)-এ অবতরণ করে আমাদের রেজিমেন্ট মেদান (Medan)-এ চলে যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রথমদিকে আমাদের সাথে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে। কিন্তু যখন তারা বুঝল যে, জাপানিদেরকে নিরস্ত্র করাই আমাদের একমাত্র কাজ নয়, বরং এর পাশাপাশি তাদের শাসক হিসেবে ওলন্দাজদেরকেও আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি, তখন তাদের আচরণ বদলে গেল। আমাদের রেজিমেন্টের পাঞ্জাবি মুসলমান সৈন্যরা ইন্দোনেশীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল বলে তাদের ওপরে ন্যস্ত দায়িত্ব তারা খুবই অশ্রদ্ধার সাথে পালন করত। অনেক ব্রিটিশ অফিসারের মনোভাবও ছিল একই রকম। এরপরে শুরু হল দীর্ঘ ক্লান্তিকর বিদ্রোহদমন অভিযান। এতে ক্ষয়ক্ষতির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বিশেষত ৬ রাজপুতনা রাইফ্‌ল্‌স খুব অল্প সময়ের মধ্যে চারজন অফিসারকে হারায়। একটা অপারেশনে মেজর সাবনিস (Sabnis) আমার সাথে ছিল। আমার সাথে যাওয়ার সময় তার পেটে হালকা অস্ত্রের এক ঝাঁক গুলি এসে লাগে।

আমাদের ডিভিশনের ইন্টেলিজেন্স অফিসার ছিল আধা-তুর্কি আধা-ওলন্দাজ টারকো ওয়েস্টারলিং (Turco Westerling)। স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল যে, তার নিষ্ঠুরতা ছিল পশুর মতো। জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় তাকে ধরে দেবার জন্য তারা ২০,০০০ মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। আমার সাথে তার সামনাসামনি বিরোধও হয়েছে বেশ কয়েকবার। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে: একবার সে জোর করে আমার দায়িত্বের মধ্যের এক সীমানা কোনোরকম পূর্ব-অনুমোদন ছাড়াই অতিক্রম করার চেষ্টা করে। পোস্ট কম্যান্ডার হাবিলদারকে আমি তাকে থামানোর নির্দেশ দিলাম। হাবিলদারও মহা উৎসাহে রাইফ্‌লের বাট দিয়ে হুকুম পালন করল। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই ওয়েস্টারলিংয়ের পরিবর্তে নতুন একজন ব্রিটিশ অফিসার আসে। নতুন অফিসার আসে চারজন সার্জেন্টের সাথে মার্চ করে। পোস্ট কম্যান্ডারের কাছে ভেতরে আসার অনুমতি চেয়ে বলল যে, তাদের কাছে উপযুক্ত অনুমোদন আছে

এবং তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য বিপক্ষের কথিত সামরিক স্থাপনা খুঁজে দেখার জন্য তাদেরকে ভেতরে যেতে হবে। এই বোকামি করতে আমি তাদেরকে নিষেধ করলাম। তারা অবশ্য আমার পরামর্শ না শুনেই জঙ্গলের ভেতরে পা বাড়াল। সেটাই তাদের সাথে আমার শেষ দেখা। তিনদিন পরে ব্রিজের ওপারে অফিসারের লাশ খুঁজে পাওয়া যায়। কয়েক বছর পর ওয়েস্টারলিং আবার সংবাদের শিরোনাম হয়। এবারে সে তার চারপাশে কিছু অ্যামবোনিজ (Ambonese) জড়ো করে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিজেকে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ওয়েস্টারলিংয়ের ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হেডকোয়ার্টার্স অ্যালাইড ফোর্সেস কয়েকজনকে সংক্ষিপ্ত ছুটি কাটাবার জন্য বালিতে পাঠিয়ে দেয়। নির্বাচিত বারোজনের মধ্যে আমারও থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। ডিসি ৩ (DC 3) পরিবহন বিমানে করে একটি জিপ ও ট্রেইলারের সাথে আমাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। দেনপাসার (Denpasar)-এ ঘাসের একটি এয়ারস্ট্রিপে আমরা অবতরণ করি। পাইলট আমাদেরকে চোদ্দদিন পরে ঠিক এই জায়গাতেই তার সাথে দেখা করতে বলে চলে যায়। বালি অসাধারণ এক জায়গা। প্রশান্ত বাধাহীন এক স্থান। রমণীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী বর্ণময় পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বালির সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য যেন দেশটাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছে। কোথাও কোনো শান্তিরক্ষী বাহিনী নেই, পুলিশ নেই; আছে শুধু সুখী তৃপ্ত মানুষ। লা মেয়্যুর (Le Mayeur) নামে এক বেলজিয়ান চিত্রশিল্পীর সাথেই আমার ছুটির বেশির ভাগ সময় কেটেছিল। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পোলক (Pollock) নামের সুন্দরী এক বালিনীজ মহিলা — তাঁর অনেক অসাধারণ ছবির মডেল। তাঁর ছবির স্টাইল গগাঁ (Gaugin)-র কথা মনে করিয়ে দেয়। সমুদ্রতীরে যে বাংলোতে মেয়্যুর থাকতেন, সেটা আজ জাদুঘর। সেখানে তাঁর আঁকা ছবি ছাড়াও আরো অনেক সংগ্রহ আছে।

বালি থেকে ফেরার পথে এয়ার ফোর্সের ক্রু তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাবার জন্য বেশ কিছু শুয়োর প্লেনে তুলে নিয়েছিল। মাঝ-আকাশে একটা এঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ায় ক্রুকে শুয়োরগুলোসহ অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিমানকে আমরা নিরাপদ উচ্চতায় রাখতে এবং মাঝপথে এক জায়গায় ল্যান্ড করাতে সমর্থ হই। প্রয়োজনীয় মেরামতির পর আবার আমরা উড্ডয়ন করি।

১৯৪৬-এর নভেম্বরে আমরা মেদান ছাড়ি। আমরা ওলন্দাজদের কাছে আমাদের দখলকৃত এলাকা যখন হস্তান্তর করছিলাম, ইন্দোনেশীয়রা দূর থেকে তখন গুলি ছুঁড়ছিল। বেলাওয়ান (Belawan) বন্দরে আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের গাড়িগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। ওখানেই আমাদেরকে মাদ্রাজে নিয়ে যাবার জন্য জাহাজ অপেক্ষা করছিল। প্রবল গুলিবর্ষণের মধ্যে দিয়ে আমরা বিদায় নিই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কেউ আহত হয়নি।

ভারতে পৌঁছার পর আমাদের রেজিমেন্ট রাঁচিতে যাত্রা করে আর লার্কহিল (Larkhill)-এ গানারি স্টাফ কোর্স (Gunnery Staff Course) করার জন্য আমি রওয়ানা দিই যুক্তরাজ্যে। প্রবল বায়ুতাড়িত স্যালিসবুরি (Salisbury) সমতলে অবস্থিত লার্কহিলে ১৯৪৬~৪৭-এর শীতটা ছিল মনে রাখার মতো। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যা হয়, টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক জিনিসগুলোও দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল: আমাদের মেসে কোনো হিটিং সিস্টেম ছিল না, খাদ্যঘাটতিও ছিল প্রবল। এসব সমস্যার কথা বাদ দিলে ওখানে থাকাটা আমি বেশ উপভোগ করেছি। কোর্সের সময়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হলেও ছুটির দিনে আমরা বাইরে বেড়াতে যেতে পারতাম। এরমধ্যে ভারতে ফেরার আগে স্কটল্যান্ডে মৎস্যশিকারের একটা সংক্ষিপ্ত ছুটি এবং পারী (Paris)-তে স্মরণীয় কয়েকটা দিন কাটাবার ব্যবস্থা আমি করতে পেরেছিলাম।

১৯ অগাস্ট ১৯৪৭-এ আমি স্বাধীন ভারতের মাটিতে পা রাখি এবং দেওলালির স্কুল অভ্ আর্টিলারিতে রিপোর্ট করি। ব্রিগেডিয়ার 'ফ্যাটি' ফ্রোয়েন ('Fatty' Frowen) ছিলেন স্কুলের কম্যান্ডার। পশ্চিমের মরুভূমিতে তিনি একটি পা হারান এবং জার্মানদের হাতে বন্দি হন। জনশ্রুতি আছে, তিনি বন্দি হবার পরে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলে জার্মানরা তাঁকে ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে জেনারেল মন্টগোমারীর সাথে দেখা হলে মন্টি জানতে চান, কেন তিনি জার্মানদের হাতে ধরা দিয়েছিলেন। ফ্রোয়েনের উত্তর ছিল, "স্যার, আপনার একটা পা উড়ে গেলে আপনিও ধরা পড়তেন (Sir, you too would have been a prisoner had you left a leg behind.)।"

স্কুল অভ্ আর্টিলারি এক জটিল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। স্কুলের যাবতীয় সম্পত্তি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাগাভাগির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রশিক্ষকরা দেশে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়াতে যোগ্য প্রশিক্ষক বলতে স্কুলে রইলেন মাত্র দুজন — মেজর এম আর আপ্তে (M R Apte) আর আমি নিজে। ইংল্যান্ডের লার্কহিলে কোর্সের সময় আমরা দুজনে একসাথে ছিলাম এবং যুদ্ধের সময়ও আমরা একই রেজিমেন্টে ছিলাম। আপ্তেকে নবীন অফিসারদের দায়িত্ব দেয়া হল। আমার ওপরে দায়িত্ব পড়ল গানারি স্টাফ কোর্সের। আর্টিলারিতে গোলন্দাজিবিদ্যার প্রশিক্ষক তৈরি করা এই কোর্সের লক্ষ্য। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কয়েকজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পক্ষে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কয়েক সপ্তাহ পর তারা পাকিস্তানে পাড়ি জমায়।

দেওলালিতে আমার তিনবছরের জীবন বেশ উপভোগ করেছি। পরবর্তীতে স্বল্পসময় আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে থাকার পর আমি ওয়েলিংটনে (Wellington) চলে যাই। কোর্স শেষ হবার পর আমাকে পাতিয়ালা মাউন্টেন ব্যাটারি (Patiala Mountain Battery)-র কম্যান্ড নিতে পাঠানো হয়। এই ব্যাটারি প্রথমে স্টেট ফোর্সেসের অংশ ছিল। এখন এটা ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে একীভূত । প্রথমে এটা কাশ্মীরের তংধর (Tangdhar)-এ এবং পরবর্তীতে পুন্ছ (Poonch) ও রাজৌরি (Rajouri)-তে ছিল। মেজর হিসেবে মাউন্টেন ব্যাটারি কম্যান্ড করা আমার জীবনের অন্যতম সুখকর অভিজ্ঞতা। আমি সব সময়ই ঘোড়া পছন্দ করলেও খচ্চরও আমার প্রিয়। তখনকার

দিনে মাউন্টেন ব্যাটারিতে থাকত কিপলিং (Kipling)-এর স্ক্রু গান (screw gun)-এর উত্তরসূরী ৩.৭ ইঞ্চি কামান। চারজন অফিসার, পৌনে তিনশ'র মতো সাধারণ সৈন্য, পঁচিশটি ঘোড়া আর ছিয়ানব্বইটি খচ্চর — এই নিয়ে ছিল ব্যাটারি। সেখানে আমি দু'বছর ছিলাম। এরপর আমাকে ১ আর্মার্ড ডিভিশনে ব্রিগেড মেজর আর্টিলারির দায়িত্ব দেয়া হল। ১৯৫৬ সালে আমাকে দিল্লীতে একটি নতুন ফিল্ড রেজিমেন্ট গঠনের নির্দেশ দেয়া হয় — ৩ রেজিমেন্ট। একেবারে শূন্য থেকে আমাদেরকে শুরু করতে হয়। ছয়মাস পর মহড়া করা হয় এবং রেজিমেন্টকে যুদ্ধ করার উপযোগী বলে ঘোষণা করা হয়। ৪ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনে যোগ দেবার জন্য এরপর আমরা আম্বালা (Ambala)-য় চলে গেলাম। এই ডিভিশনের কম্যান্ডার ছিলেন মেজর জেনারেল বি এম কাউল (B M Kaul), যাঁর রেজিমেন্টাল সার্ভিসের অভিজ্ঞতা বলতে শুধু আর্মি সার্ভিস কোরে কিছুদিনের অভিজ্ঞতা। নেহরু (Nehru)-র সাথে তাঁর পারিবারিক সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন (Krishna Menon)-এর সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক তাঁকে বেশ একগুঁয়ে ও অহঙ্কারী করে তুলেছিল। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি চীনা সামরিক প্রতিনিধিদলের জন্য আমাকে একটি যুদ্ধের মহড়ার আয়োজন করতে হয়। মহড়া সফলভাবেই শেষ হয়। জেনারেলের প্রিয়পাত্র বা স্তাবক হবার চেষ্টা করিনি বলে এরপর থেকে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক শীতল ও আন্তরিকতাশূন্য হয়ে যায়। উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময়ও হয়েছে বেশ কয়েকবার। বিষয় আরো জটিল হবার আগেই সৌভাগ্যবশত জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড ১ হিসেবে দিল্লী ও রাজস্থান এলাকায় আমার পোস্টিং হয়ে যায়।

পেশাগত ও সামাজিক — দুইদিক থেকেই দিল্লী ও রাজস্থানে আমার অবস্থানকাল ছিল উপভোগ্য। ১৯৫৮~৫৯ সালে জলদূষণ থেকে দিল্লীতে মহামারী আকারে হেপাটাইটিস দেখা দেয়। সে সময়ে বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে দিল্লীতে পানি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। আমি তাঁকে বললাম যে, কোনো শহরের পানি সরবরাহ-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার কোনোরকম জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই। বিদ্রূপাত্মক স্বরে তিনি উত্তর দিলেন যে, আমার শিখে নেয়া উচিত ছিল। ভাগ্যক্রমে দিল্লীতে সেই সময়ে লেফটন্যান্ট কর্নেল লক্ষ্মণন (Lakshmanan)-এর কম্যান্ডে একটি এঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ও মেইনটেন্যান্স কোম্পানি ছিল। আমরা ওয়াজিরাবাদ (Wazirabad) পানিশোধন প্রকল্প পরিদর্শন করে সমস্যার উৎস খুঁজে পেলাম। পরিশোধনের জন্য পানির সরবরাহ আসছে পয়ঃনিষ্কাশন-প্রণালীর মাত্র ৫০ গজ উজান থেকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে আমরা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে এটার দায়িত্ব হস্তান্তরের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। পরবর্তীতে কৃষ্ণ মেনন আর্মি চিফ জেনারেল থিমাইয়া (Thimayya)-কে সাথে নিয়ে এই প্রকল্পটি পরিদর্শন করতে আসেন। আমরা যেহেতু প্রায় ছয়মাস ধরে প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনায় ছিলাম, আমি চিফকে অনুরোধ করলাম, তিনি যাতে তাঁকে দিয়ে প্রকল্পটি বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে দেন। কৃষ্ণ মেননের

সাথে থিমাইয়ার সম্পর্ক খুব ভাল না থাকায় তিনি সরাসরি মন্ত্রীর কাছে আমার বক্তব্য পেশ করার পরামর্শ আমাকে দিলেন। তাঁর কথামতো আমি সরাসরি মন্ত্রীর কাছে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। কয়েক সেকেন্ডের বিরতি দিয়ে আবার কথাটা বললাম, তিনি যথারীতি নীরব রইলেন। তৃতীয়বারের মতো অনুরোধ জানাতেই তিনি ক্রুদ্ধভাবে আমার দিকে ফিরে তীব্র স্বরে বললেন, "কর্নেল, কথাটা আমি প্রথমেই শুনতে পেয়েছি।" যাই হোক, কয়েকদিন পরেই আমরা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্পটি হস্তান্তরের অর্ডার পাই।

এর কাছাকাছি সময়ে আরেকটা আমি অর্ডার পাই। এটি হল আর্মালাইট (Armalite) হালকা অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার যাচাই ও উপযুক্ততা পরীক্ষা করা। দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনী বোল্ট-অ্যাকশন থ্রি-নট-থ্রির বিকল্প খুঁজছিল। বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিস্টেমটি বেশ ভাল বলে প্রমাণিত হয় এবং আমরা এটার পক্ষে সুপারিশ করি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জেনারেল স্টাফের কাছে আর্মালাইট উপযুক্ত বলে মনে হয়নি। কারণ, এটা দিয়ে একশ গজ দূর থেকে টার্গেটে চার ইঞ্চি গ্রুপ তৈরি করা যায় না। ফলে, এটা জেনারেল স্টাফের চাহিদা পূরণ-করতে-না-পারা একটা অনুপযোগী জিনিসে পরিণত হয়। পরে জেনারেল স্টাফ চূড়ান্তভাবে আর্মালাইট বাতিল করেন এই যুক্তিতে যে, এটা আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের উপযুক্ত নয়। পরবর্তীতে এফএন (FN) রাইফ্‌ল্-এর ভারতীয় সংস্করণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর আরো তিরিশ বছর পর স্থানীয়ভাবে ডিজাইন করা একই ক্যালিবার ও ক্ষমতাসম্পন্ন হালকা রাইফ্‌ল্ সেনাবাহিনীতে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অগাস্ট ১৯৫৯-তে আমাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা (Oklahoma)-র ফোর্ট সিল (Fort Sill) ও টেক্সাস (Texas)-এর ফোর্ট ব্লিস (Fort Bliss)-এ অ্যাডভান্সড আর্টিলারি অ্যান্ড মিসাইল কোর্সের জন্য মনোনীত করা হয়। রওয়ানা দেবার আগে ব্রিফিংয়ের জন্য কৃষ্ণ মেনন আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে কয়েকটা কাগজে মনোনিবেশ করলেন। তারপর আমাকে চা আর বিস্কুট অফার করলেন। এর আগে কৃষ্ণ মেনন অনেকবার আমাদের ইউনিট পরিদর্শনে গেছেন এবং প্রতিবার তাঁর স্টাফ তাঁকে বিলাতি বিস্কুটের সাথে চা দেবার কথা বলেছে। বিলাতি বিস্কুট যোগাড় করতে আমাদের মেস সেক্রেটারির কী পরিমাণ কষ্ট হত, তার সাক্ষী আমি। আমাকে অফার করা বিস্কুটে কামড় দেবার আগে আমি একবার বিস্কুটের দিকে, আর একবার মন্ত্রীর দিকে তাকালাম। এটা আপাদমস্তক আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয় বিস্কুট এবং মন্ত্রীও তো সেটাই খাচ্ছেন। আমি মৃদু হাসলাম। প্রতিদানে মন্ত্রী আমার দিকে নোংরা দৃষ্টিতে তাকালেন। এরপরে তিনি শুরু করলেন দীর্ঘ এক আমেরিকাবিরোধী বক্তৃতা। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে প্রশ্ন করলাম যে, এতই যদি তাঁর আমেরিকাবিদ্বেষ, তাহলে সেখানে কাউকে পাঠাবার প্রয়োজনটা কী? ধেয়ে এল আরেকটি ক্রুদ্ধ বক্তৃতা। এরপর তিনি আমাকে বিদায় নিতে বললেন।

যাবার আগে আমার দু'বছরবয়সী চিতাবাঘের ব্যবস্থা করতে হল। চিতাবাঘটাকে আমি তার শিশু-অবস্থা থেকে লালনপালন করেছি। সেই সাথে আমার শখের এমজি স্পোর্টস কারটাও বিক্রি করতে হল। এই জিনিসদুটো ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। বোম্বে হয়ে যাবার পথে জেনারেল কাউলের সাথে দেখা করলাম। আমেরিকা যাবার পথে আমি তাঁর সাথে দেখা করেছি বলে তিনি খুব অবাক হলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, তিনি যদি আমার এই যাওয়া বাতিল করতে চান, আমি এর বিরুদ্ধে আপীল করব না। তিনি ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু কোনো অ্যাকশন নিলেন না। ইউনাইটেড স্টেট্স আর্মিতে একটা বছর আমি খুব উপভোগ করেছি। ফোর্ট সিলের ফিল্ড আর্টিলারি অ্যান্ড মিসাইল স্কুলে প্রথমে আমি রিপোর্ট করলাম। সেখান থেকে আমাকে এল পাসো (El Paso)-র উপকণ্ঠে অবস্থিত ফোর্ট ব্লিসের এয়ার ডিফেন্স স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হল। শিক্ষাসূচির মধ্যে ছিল আকাশ প্রতিরক্ষা, ক্ষেপণাস্ত্র এবং রাডার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ব্যবহার। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমার কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। ট্রেনিংয়ের গতির সাথে তাল মেলানোর জন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ফোর্ট ব্লিসে তিন মাস কাটাবার পরে আমাদেরকে আবার ফোর্ট সিলে পাঠানো হয়।

আমেরিকান যেসব অফিসার আমাদের সাথে ট্রেনিং নিচ্ছিল, তাদের অধিকাংশই এসেছিল রিজার্ভ অফিসার্স' ট্রেনিং কোর (ROTC) থেকে। ভিয়েতনাম-যুদ্ধে আমেরিকার জড়িত হয়ে পড়ার ফলে স্বল্পসময়ে প্রচুর অফিসার তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে। সংখ্যাধিক্যের ওপরে জোর দেয়াতে সঙ্গত কারণেই ট্রেনিংয়ের মান ঠিক থাকেনি। সামরিক শিক্ষার আমেরিকান পদ্ধতিও আমাদের চেনা পদ্ধতির তুলনায় অনেক ভিন্ন। ছোট ছোট ক্লাসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দিকে আলাদা করে মনোযোগ দেয়া হয়। এর ফলে এই শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানে বা ইউনিটে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকে শেখাবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। পরীক্ষা ছিল অসংখ্য। রেজাল্ট দেয়া হত এমনভাবে, যাতে সকলের রেজাল্ট সকলে জানতে পারে। আমেরিকার বন্ধুপ্রতিম অনেক দেশের শিক্ষার্থী সেখানে ছিল। দেশের মাথা উঁচু করার জন্য একটা প্রত্যয় আমার ভেতরে তখন জন্ম নেয়। আমি ভাল ফল করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই। কোর্স যখন শেষ হল, তখন সামগ্রিকভাবে আমার অর্জিত নাম্বারের শতকরা হার নব্বই শতাংশেরও বেশি। ছাড়ার সময় শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে চিতাবাঘের একটা বাঁধানো চামড়া আমি স্কুলে উপহার দিলাম। দুর্ভাগ্যবশত ভ্রমণকালীন এর একটা দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। চামড়া আর ভাঙা দাঁত নিয়ে আমি লটন (Lawton)-এর এক ডেন্টিস্টের কাছে যাই। ডাক্তার প্রথমে অবজ্ঞার ভান করে বলল যে, চিতাবাঘের দাঁত মেরামত করতে বলে আমি তার পেশার রীতিমতো অবনাননা করেছি এবং এ ব্যাপারে তার কিছু করার নেই। অবশ্য আমি যখন চড়া দাম দিতে রাজি হলাম, তখন অবশ্য সে কাজ করতে সম্মত হল।

প্রথমে নিউ ইয়র্ক থেকে কুইন মেরি (Queen Mary)-তে করে সাদাম্পটন (Southampton), তারপরে একটা অ্যাংকর লাইন জাহাজে চড়ে ভারতে পৌঁছালাম।

সে যুগে সমুদ্রভ্রমণ ছিল সত্যিকারের আনন্দদায়ক আর উপভোগ্য। দিনের বেলায় বিভিন্ন ধরনের ডেক গেমে মেতে থাকতাম, নয়ত সুইমিং পুলের পাশে গিয়ে রিল্যাক্স করতাম। ডিনার ছিল খুবই ফর্মাল, যাকে বলে 'ব্ল্যাক টাই অ্যাফেয়ার্স (black tie affairs)'। ভারতে ফিরে নভেম্বর ১৯৬০-এ হেডকোয়ার্টার্স ওয়েস্টার্ন কম্যান্ডের জেনারেল স্টাফ অফিসার অপারেশন্স-এর দায়িত্ব নেবার আগে পর্যন্ত স্কুল অভ্ আর্টিলারিতে চিফ ইনস্ট্রাকটর, ট্যাক্টিক্স হিসেবে কাজ করেছি। সেই সময়ে ওয়েস্টার্ন আর্মির চিফ ছিলেন লেফ্টন্যান্ট জেনারেল থাপার (Thapar)। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে চীনের সাথে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের আগে তিনি চিফ অভ্ আর্মি স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

লাদাখ (Ladakh)-এর নিরাপত্তার ব্যাপারে আর্মি কম্যান্ডার ও তাঁর চিফ অভ্ স্টাফ মেজর জেনারেল গোপাল বেয়ূর (Gopal Bewoor)-এর সাথে আমার মতদ্বৈধতা ছিল। আমাদের মধ্যে বাক্যালাপ প্রায়ই উত্তপ্ত হয়ে উঠত। অবকাঠামো, বিশেষত রাস্তা নির্মাণের ওপরে আমি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার প্রেম চাঁদ (Prem Chand) ছিলেন যোগ্য অফিসার। তিনি আমার মতামত সমর্থন করেন। সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিন পরেই মেজর জেনারেল মানেকশ' (Manekshaw) তিন বছরের জন্য আমাকে ইনস্ট্রাকটর হিসেবে ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। সামরিক স্থাপনা হিসেবে ওয়েলিংটন ছিল বেশ সুসংগঠিত। আমি থাকতাম ওয়েলিংটন ক্লাবে। ইনস্ট্রাকটরের কাজ ছিল খুবই পরিশ্রমের এবং এতে সামাজিক দায়িত্বের মাত্রাও অনেক বেশি। অবশ্য খেলাধুলোর ব্যবস্থা ছিল অসাধারণ এবং অন্য সমস্ত অসুবিধা ও প্রতিকূলতা ঢেকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট: গল্ফ, টেনিস, স্কোয়াশ, অশ্বারোহণ, সৌখিন ঘোড়দৌড় এবং পাহাড়ের জলাশয়ে ট্রাউট (trout) ও সমতলে অন্যান্য জায়গায় মাশীর (masheer) মাছ শিকার। মাছ ধরায় বরাবরই আমার খুব আনন্দ।

স্টাফ কলেজের কিছু কিছু টেকনিক ও এক্সারসাইজ ছিল মান্ধাতা আমলের। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা আমার মনে পড়ছে, সেটা হল মাউন্টেন ওয়ারফেয়ার। আমাকে এটার আধুনিকীকরণ করতে হয়েছিল। এক্সারসাইজটি বিলুপ্ত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির পিকেটিং-ট্যাক্টিক্সের ভিত্তিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। আমি এটা পরিবর্তন করে এক্সারসাইজের এলাকা হিসেবে বোমডি লা (Bomdi La) নির্ধারণ করি। পরবর্তীতে ঘটনাচক্রে ভারত-চীন যুদ্ধের সময়ে এই এলাকাটিই একটি রণাঙ্গনে পরিণত হয়। মানেকশ'র বিরুদ্ধে জেনারেল কাউলকে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগান দিতে ব্যর্থ হওয়ার খেসারত হিসেবে এই অপারেশনে আমাকে কোনো ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। স্টাফ অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে আমাকে পুনা (Poona)-র সাদার্ন কম্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কাউল সেনাবাহিনী ছাড়ার পর আমাকে লাদাখে একটি আর্টিলারি ব্রিগেডের কম্যান্ড দেয়া হয়।

লাদাখে আমি দু'বছর কাটাই। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত এই মরুভূমি সেসময়ে ছিল পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর ও নিষ্কলুষ জায়গা। বাতাস ছিল বিশুদ্ধ ও নির্মল। মানুষগুলোও শান্তিপ্রিয়। সেখানে আমি প্রচুর ঘোরাফেরা করেছি। বৌদ্ধদের অনেক মঠে গেছি এবং তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছি। পশুপাখির বুনো জীবন অবলোকন করাও ছিল অত্যন্ত আনন্দদায়ক: আইবেক্স (ibex), বন্য ভেড়া ও গাধা, চকোর (Asian partridge), মনভোলানো রঙের তুষার-পাখি (ice pheasant) এবং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য তুষার চিতা (snow leopard)।

লেহ্ (Leh)-তে অনেক পুরনো একটা মোরাভিয়ান (Moravian) মিশন ছিল। এটার আঙিনায় একটা লোমবার্ডি পপলার (Lombardy poplar) লাগানো ছিল। আমি আমার বাহিনীর লোকদেরকে পপলার ও উইলো লাগাতে উৎসাহিত করতাম। অন্য কোনো সেনাস্থাপনা পরিদর্শনে গেলে আমি তাদের মধ্যে কলম-করা চারা বিতরণ করতাম। আজ আমার ভাবতে ভাল লাগে যে, লাদাখের বিস্তীর্ণ সবুজে সামান্য হলেও আমার অবদান আছে। বারো হাজার ফুট উচ্চতায় বালুময় মাটিতে আমরা একটা গল্‌ফ কোর্সও তৈরি করেছিলাম।

স্কুল অভ্ আর্টিলারিতে কম্যান্ড্যান্ট হিসেবে (১৯৬৫~৬৬) আমি আমার পরবর্তী দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমার হৃদয়ে সব সময়ই দেওলালির জন্য আলাদা একটা জায়গা আছে। এখানে আমি দায়িত্ব বুঝে নেবার অল্পদিন পরেই যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসে। রাজস্থান, গুজরাট এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্ত অঞ্চলের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে। পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হবার পর পরই চীনারা আমাদেরকে হুমকি দেয় যে, তারা এতে হস্তক্ষেপ করবে। দুর্ভাগ্যবশত জেলাপ লা (Jelap La)-র শৃঙ্গদেশ থেকে আমরা সরে আসার সাথে সাথে চীনারা সেটা দখল করে নেয়।

কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধে কেউই জয়ী হয়নি। আমার পরবর্তী দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের পাঞ্জাবসংলগ্ন সাম্বা (Samba)-য় একটি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডকে কম্যান্ড দেয়া। শিগ্‌গিরই আমরা সীমান্তসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলাম। আমার পাকিস্তানি কাউন্টারপার্ট ব্রিগেডিয়ার আজমত হায়াত (Azmat Hyat) ছিলেন আপাদমস্তক ভদ্রলোক। সীমান্ত নির্দেশ করার জন্য আমরা নিয়মিত মিটিং করতাম। সীমান্ত চিহ্নিত করার কাজে তাঁর সরকার স্থায়ী কংক্রিট পিলার নির্মাণের অনুমোদন না দেয়াতে খালি-হয়ে-যাওয়া পেট্রোলের ড্রাম মাটি দিয়ে ভরে মাটিতে পুঁতে আমরা সীমানা নির্দেশের কাজ চালাই। এই ব্রিগেড চালাতে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি। নিয়মিত আমরা ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বহরসহ মাঠের মধ্যে দিয়ে পুরো ব্রিগেড চালনা করতাম। ১৯৬৭ সালে মেজর জেনারেল পদে আমার পদোন্নতি হয় এবং রাজস্থানের ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের চার্জে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই ডিভিশনটি তখনও সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় এবং সরাসরি কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সের তত্ত্বাবধানে ছিল। আর্মি কম্যান্ডার লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল মতি সাগর

(Moti Sagar) ছিলেন দক্ষ ও দৃঢ়চিত্ত সৈনিক। মউতে যখন আমি অফিসার ক্যাডেট হিসেবে ছিলেন, তখন তিনি ছিলেন আমাদের প্লাটুন কম্যান্ডার। আমার কম্যান্ডের ট্রেনিংয়ের জন্য সব ধরনের সহযোগিতা তিনি করেছিলেন।

মরুভূমিতে যুদ্ধের ওপরে আমি একটি এক্সপেরিমেন্ট চালাই এবং সেটা এই ডিভিশনকে দিয়ে এক্সারসাইজ করানোর অনুমোদন পাই। পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে লক্ষ্যবস্তুর ধরন ও শত্রুপক্ষকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে মরুভূমিতে যুদ্ধের কৌশলসমূহের বিবর্তন ঘটাতে থাকি। লক্ষ্যবস্তু হবে অবশ্যই যোগাযোগকেন্দ্র। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে ভারতীয় সেনাবাহিনী মূলত সড়কনির্ভর অক্ষরেখা ধরে চলাচলে অভ্যস্ত এবং তাদের প্রশিক্ষণও হয়েছে সেভাবেই। আমরা আমাদের মূল অক্ষরেখা লক্ষ্যবস্তুকেন্দ্রিক করার প্রশিক্ষণ দিই। আমাদের দিকনির্দেশক কোনো সরঞ্জাম ছিল না। জিম্‌ব্যাল (gimbal — ঝুলন্ত বস্তুকে আনুভূমিক রাখার যন্ত্র)-এর কম্পাস বসিয়ে বিশেষভাবে তৈরি এই কাজে নিয়োজিত গাড়ির ম্যাগনেটিক ভাইব্রেশন গ্রাফ ব্যবহার করে একটি সাধারণ কিন্তু নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি আমি উদ্ভাবন করি। ৫০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত এর নির্ভুলতা ছিল ২০০ গজের মধ্যে। এই পদ্ধতি এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। মরুভূমিতে যুদ্ধের ওপরে আমার তৈরি ম্যানুয়াল পরবর্তীতে আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের ম্যানুয়াল তৈরিতে কাজে লাগে। আমরাই সর্বপ্রথম সেই এলাকার চলাচলের ম্যাপ তৈরি করি। এতে চাকাযুক্ত ও ট্র্যাকযুক্ত যানবাহনের উপযোগিতাও চিহ্নিত করা ছিল।

১৯৬৯-এর এপ্রিলে আমার কাছে লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল মানেকশ'র ফোন আসে। তিনি আমাকে বলেন যে, চিফ অভ্ আর্মি স্টাফ হিসেবে তিনি হেডকোয়ার্টার্সে চলে যাচ্ছেন এবং আমাকে তিনি কলকাতায় ইস্টার্ন কম্যান্ডের চিফ অভ্ স্টাফ হিসেবে পোস্টিং দিচ্ছেন। তিনি আরো বলেন যে, আমি যে তাঁর চিফ অভ্ স্টাফ অফিসার হিসেবে কাজ করতে অনাগ্রহী, এটা তাঁর জানা আছে। কারণ এর আগে তাঁর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ হিসেবে পোস্টিং না দেবার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। তারপরেও আমাকে তাঁর সাথে দুই সপ্তাহ কাজ করতে হবে এবং এতে আমার তেমন অসুবিধা হবার কথা নয় বলে তিনি জানান। আমি ফোর্ট উইলিয়ামের ওয়াটার গেট হাউসে চলে এলাম। ওয়াটার গেটে ফোর্ট উইলিয়ামের কেল্লার ওপরে এই চমৎকার বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল আনুমানিক ১৭৮০ সালে। দুর্গের চারপাশের পরিখা পূর্ণ করার জন্য হুগলি নদী থেকে পানি আনার ব্যবস্থা ছিল। বিশাল আকৃতির কক্ষসম্বলিত ঐতিহাসিক এই বাড়িটি ছিল অসাধারণ সুন্দর। কেল্লার আঙিনায় দাঁড়ালে নদীর যে দৃশ্য দেখা যায়, তা এক কথায় শ্বাসরুদ্ধকর। আমি ফিরে এসেছি সেই কলকাতায় যেখানে আমার জন্ম, যেখানে আমি আমার অমল শৈশব কাটিয়েছি, যে কলকাতাকে আমি ভালবাসি। এটা সেই কলকাতা যার কথা ভাবতেও আমি ভালবাসি, যে কলকাতায় আছে প্রচুর বন্ধুভাবাপন্ন সুসংস্কৃত উষ্ণ হৃদয়ের মানুষ।

যুদ্ধের অবতারণা

১৯৬৯-এর মে মাসে ইস্টার্ন কম্যান্ডের চিফ অভ্ স্টাফ হিসেবে আমি দায়িত্ব বুঝে নিই। প্রথমেই যে সমস্যাগুলোর ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামাতে হয়, তা হল নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সৃষ্ট অশান্ত পরিস্থিতি। চীনের সাথে হিমালয়সীমান্তে ইতোমধ্যেই আমাদের সেনাশক্তির বৃহত্তর অংশ নিয়োজিত ছিল। এরপর নক্শালিদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে কলকাতার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। এদেরকে প্রতিরোধের জন্য বেসামরিক প্রশাসন সেনাবাহিনীর সহায়তা কামনা করে। রাজ্যসভা (State Assembly)-র নির্বাচন ছিল সমাসন্ন। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে শান্তিরক্ষার লক্ষ্যে ভোটকেন্দ্র পাহারার কাজে আমাদেরকে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে নক্শাল আন্দোলন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়লেও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অস্থিতিশীলতা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে থাকে। সেনা-অভিযানও এসব ক্ষেত্রে খুব একটা ফলপ্রদ হয়নি। এমনও মনে হচ্ছিল যে, আন্দোলন ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। বনাঞ্চলে চলাচলের অক্ষমতার কারণে বাহিনীর কার্যক্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সড়ককেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ থাকে। কৌশল পরিবর্তনের জন্য কম্যান্ডারদেরকে বারবার পীড়াপীড়ি করেও আমি তেমন কোনো ফল পাইনি।

এরই মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি পাখা বিস্তার করতে থাকে।

পাকিস্তানের দুই অংশ — পূর্ব ও পশ্চিম — মাঝখানে ভৌগোলিকভাবে হাজার মাইলের ভারতীয় এলাকা দিয়ে বিচ্ছিন্ন। এই দুই অংশের মধ্যে আয়তন ও জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য ছিল ব্যাপক। আয়তনের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ছয় গুণ। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমের জনসংখ্যা ছিল চার কোটি তিরিশ লক্ষ আর পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি দশ লক্ষ। ভাষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ইত্যাদি সবকিছুতে ছিল পার্থক্য। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠী। সংখ্যায় তারা এক কোটিরও বেশি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অনুভব করতে শুরু করে যে, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী তাদের ওপরে 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ' চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে শোষণ করছে। পূর্বের কষ্টার্জিত অর্থে পশ্চিমের উন্নয়ন তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯৬০ সালে প্রবৃদ্ধির উচ্চতর বার্ষিক হার ছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় ৩২ শতাংশ বেশি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম এবং ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ছাড়া

অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবিতে তাঁর 'ছয় দফা দাবি' পেশ করেন (পরিশিষ্ট ১১ দ্রষ্টব্য)।

১৯৬৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে ভারতের সহায়তায় সরকার পতন আন্দোলনের সূচনা করার অভিযোগে মামলা করা হয়। এই মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত। ১৯৬৯ সালে ঢাকায় পরিচালিত এই মামলা মুজিবকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট আইউব খান (Ayub Khan) মার্চ ১৯৬৯-এ রাওয়ালপিন্ডিতে এক গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করেন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবকে সেখানে আমন্ত্রণ জানান। আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং আইউব খান পদত্যাগ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "পদত্যাগ করে পাকিস্তানের সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের একমাত্র বৈধ ও কার্যকর সংস্থা প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে দাঁড়ানো ছাড়া আমার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই (I am left with no option but to step aside and leave it to the defence forces of Pakistan, which today represent the only effective and legal instrument to take over full control of the affairs of the country.)।" সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান (Yahya Khan) ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

১৯৬৯-এর নভেম্বরে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০-এর শেষদিকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন দেবেন। এই নির্বাচনে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ (National Assembly)-এ ১৬০টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন না পেলেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ (Provincial Assembly)-এ দুটি ছাড়া সমস্ত আসন লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ভুট্টো (Bhutto)-র পাকিস্তান পিপ্‌ল্‌স পার্টি ৮১টি আসন লাভ করে — সেটারও অধিকাংশ পাঞ্জাব ও সিন্ধে। আওয়ামী লীগের বিজয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তি মূর্ত হয়ে ওঠে এবং পশ্চিমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে পূর্বের তীব্র অসন্তোষ প্রতিফলিত হয়। ভুট্টো অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আধিপত্যের আশঙ্কাকে কাজে লাগান। আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এমন একটি ফরমুলা বের করার চেষ্টা করেন, যাতে মুজিবের সাথে তিনিও ক্ষমতার অংশীদার হতে পারেন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে ইয়াহিয়া খান টালবাহানা শুরু করেন। ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে ঢাকায় এসে তিনি মুজিবের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চেষ্টা করেন, যাতে শাসনকর্মে প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর অবস্থান নিশ্চিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে তিনি 'ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে মুজিবের নাম উল্লেখ করলেও তখন পর্যন্ত প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেননি। জানুয়ারির শেষভাগে মুজিবের সাথে একটি আপোস-রফার লক্ষ্যে ভুট্টো ঢাকায় এলেও তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।

এর মধ্যে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শ্রীলঙ্কা হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যসমাবেশ শুরু হয়েছে। মার্চের ১ তারিখে ইয়াহিয়া খান অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি রাখা এবং মেজর জেনারেল ইয়াকুব খান (Yakub Khan)-কে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর

হিসেবে নিয়োগ করার ঘোষণা দেন। আওয়ামী লীগ এর জবাবে গণ-অসহযোগের ডাক দেয়। ইয়াহিয়া তখন নতুন করে ঘোষণা দেন যে, ইয়াকুব খানকে সরিয়ে পরিবর্তে লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান (Tikka Khan)-কে (বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ দমনে প্রদর্শিত নিষ্ঠুরতার কারণে ইনি বিদিত) পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করা হবে এবং ২৫শে মার্চে অধিবেশন বসবে। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য মোতায়েনের কাজ অব্যাহত থাকে। তাদের গতিবিধির ব্যাপারে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি কী, এটা সম্ভবত পাকিস্তানিরা মাথায় আনেনি। কারণ এটাকে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবেই দেখছিল।

১৫ মার্চে ইয়াহিয়া ঢাকায় আসার পর জাতীয় পরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং ছয় দফা দাবি প্রসঙ্গে আলোচনায় বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের আরেকটি হাস্যকর উদ্যোগ দেখা যায়। ভুট্টো দাবি করেন যে, মুজিবের দাবি অনুযায়ী নতুন সংবিধান প্রণয়নের আগে ক্ষমতা হস্তান্তর যদি করতেই হয়, তাহলে তা একই সাথে করতে হবে পাকিস্তানের উভয় অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে। ২২ মার্চ আওয়ামী লীগ এই পরামর্শ গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে সেনাবাহিনী এটাকে আন্দোলোন-নিবৃতির লক্ষ্যে একটি কার্যকর সাংবিধানিক ফরমুলায় রূপান্তরিত করে। হাসান জহীর (Hasan Zaheer) তাঁর *দ্য সেপারেশন অভ্ ইস্ট পাকিস্তান: দ্য রাইজ অ্যান্ড্ রিয়্যালাইজেশন অভ্ বেঙ্গলি মুসলিম ন্যাশনালিজ্‌ম (The Separation of East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism)* নামক বইতে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখলেও ইয়াহিয়া খান

সামরিক স্থাপনাগুলো পরিদর্শন এবং ক্যান্টনমেন্টে আর্মি অফিসারদের সাথে আলোচনা করছিলেন.....প্রতিটি পরিদর্শন ও আলোচনার পরই তিনি সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে আরও আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং সেনাবাহিনী যে খুব সহজেই এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, সে বিষয়ে অতি-সরলীকৃত মত প্রকাশ করেন। সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা তিনি প্রচণ্ড প্রভাবিত হন যে, রাজনীতিবিদদের কাছে নতি স্বীকার করার তাঁর কোনো প্রয়োজনও নেই এবং এঁটা তাঁর উচিতও না (.....was visiting army installations and meeting army officers in the cantonment .....after every visit and meeting he came back with a more aggressive attitude towards political settlement and with an over simplified view of the army's capability to control affairs. He was heavily influenced by the top brass that he need not or should not concede too much to the politicians.)।

পরিষ্কারভাবে যখন বোঝা গেল যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবারও স্থগিত হয়ে গেছে, ঢাকা ও অন্যান্য শহর তখন বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে সারা ভূখণ্ডে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়।

২৫ মার্চ বিকেলে সব সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে ইয়াহিয়া খান কলম্বো হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে রওয়ানা দেন। এর আগেই টিক্কা খান ২৬ মার্চ মধ্যরাত একটায় (হিসাবটা ছিল এই যে, প্রেসিডেন্ট ততক্ষণে করাচী পৌঁছে যাবেন) আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে রাখেন। ২৫ মার্চ রাত এগারোটায় বাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহরের দিকে রওয়ানা দেয় এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই 'অপারেশন

সার্চলাইট'-এর গোলাগুলি শুরু হয়। সে সময়ে রেডিওতে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বার্তা শোনা যায়। তাতে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "হয়ত এটাই আমার বলা শেষ কথা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাই। বাংলাদেশের মাটিতে দখলদার একটি পাকিস্তানি সৈন্য অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকবে।"

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখলে চলে গেল। হতাহতের সংখ্যা কয়েক হাজার। মুজিবকে তাঁর ধানমণ্ডির বাসা থেকে ২৬ মার্চ রাত একটায় গ্রেফতার করা হয় এবং তিনদিন পর তাঁকে করাচীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া অধিকাংশ বাঙালি নেতা আত্মগোপন করেন। ২৭ মার্চের মধ্যে দেশত্যাগের জন্য বিদেশী সাংবাদিকদেরকে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অন্তরীণ রাখা হয়।

প্রতিরোধ ছিল প্রবল, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কারণ পাকিস্তানিরা ট্যাঙ্ক, রকেট লঞ্চার, রিকয়েললেস গান ও মর্টার ব্যবহার করে। 'পাকিস্তান রক্ষা' করার জন্য সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। তারপরেও পরিস্থিতির ওপরে তারা পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং ২৭ মার্চ বেতারকেন্দ্র দখল করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এই ঘোষণা অনেকেই শুনেছেন। যাঁরা শোনেননি, মুখে মুখে এটা তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে চারটি পাকিস্তানি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড ছিল। পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে এই পরিমাণ দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশটি নিয়মিত ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নে। তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনা আধা-সামরিক বাহিনীর সাতটি উইং, পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের সশস্ত্র বাহিনীর সাতটি উইং, ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল প্রটেকশন ফোর্সের কয়েকটা কোম্পানি, এবং প্রচুর অনিয়মিত মুজাহিদ ও রাজাকার ছিল। ছয়টি ফিল্ড রেজিমেন্ট, বেশ কয়েকটি স্বাধীন ফিল্ড ও ভারি মর্টার ব্যাটারি এবং হালকা বিমানবিধ্বংসী কামান দিয়ে আর্টিলারি সজ্জিত ছিল। এক রেজিমেন্ট আমেরিক্যান শ্যাফী (Chaffee) ট্যাঙ্ক, শ্যাফী ট্যাঙ্কের একটি স্বাধীন স্কোয়াড্রন এবং শ্যাফী এবং রাশিয়ান পিটি৭৬ (PT 76) ট্যাঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্কোয়াড্রন নিয়ে ছিল আর্মার বিভাগ। পঁচিশটি স্যাব্‌র (Sabre) জেট ফাইটার, পরিবহন বিমান ও কয়েকটা হেলিকপ্‌টার ছিল বিমানবাহিনীর উপাদান আর নৌবাহিনী গঠিত ছিল কয়েকটা গানবোট দিয়ে।

বাঙালি বাহিনী বলতে ছিল প্রধানত বাঙালি অফিসারদের নেতৃত্বাধীন পাঁচটি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এবং বাঙালিদের নিয়ে তৈরি ইস্ট পাকিস্তান রাইফ্‌ল্‌স (ইপিআর)। এছাড়াও বাঙালিদের মধ্যে ছিল বেশ কিছু মুজাহিদ, আনসার ও পুলিশ। চূড়ান্ত আক্রমণের আগে এদেরকে বিভিন্নদিকে ছড়িয়ে দেবার কাজটা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভালভাবেই করেছে।

মেজর জিয়া সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সমস্ত বাঙালি সদস্য নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। যুদ্ধ দাবানলের মতো ইপিআর হেডকোয়ার্টার্সে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে পাকিস্তানিরা ট্যাঙ্ক, এয়ারক্র্যাফ্‌ট, কামান ও নৌবাহিনীর গানবোট থেকে গোলাবর্ষণ করে। ৩১ মার্চ এটা তারা দখল করে। এরপরে

তারা আক্রমণ চালায় রিজার্ভ পুলিশ লাইনের ওপরে। প্রায় বিনা প্রতিরোধেই এটার পতন হয়। জিয়া তখন বেলোনিয়ার দিকে পশ্চাদপসারণ করেন এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ঢাকার সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফেনী ব্রিজ উড়িয়ে দেন।

এর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে যশোরের ১ ইস্ট বেঙ্গল প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কিছু সাফল্য লাভ করে। কুষ্টিয়া এলাকায় প্রচণ্ড লড়াই হয় এবং পাকিস্তানিদের এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাবনাতেও ইপিআর বেশ সাফল্য লাভ করে। ঢাকার উত্তরে জয়দেবপুরে ২ ইস্ট বেঙ্গল কিছু বিক্ষিপ্ত লড়াইয়ের পর আরো উত্তরে সরে যায়।

১৮ এপ্রিলের মধ্যে ১ ইস্ট বেঙ্গল বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী চুয়াডাঙ্গা শত্রুমুক্ত করে ফেলে এবং সীমান্তরক্ষীদের সাথে ভারতীয় সীমানা বনগাঁর দিকে সরে যায়।

ইতোমধ্যে পাকিস্তানি আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ভারতেও অনুভূত হতে শুরু করে। প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হবার পর সেখানে জনমত দানা বেঁধে ওঠে এবং তারা অবিলম্বে হস্তক্ষেপের দাবি জানায়। ৩১ মার্চ ভারতীয় সংসদে পাকিস্তানকে 'পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর'-এর আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (পরিশিষ্ট ১৩ দ্রষ্টব্য)। পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতায় সারাদেশ বিমূঢ় হয়ে যায়। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ভারতে শরণার্থী আসতে থাকে। মার্চের শেষের দিকে যে প্রবাহ ছিল বিচ্ছিন্ন ধারার মতো, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পরিণত হয় এবং অক্টোবর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

এপ্রিলের শুরুর দিকে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল এস এইচ এফ জে মানেকশ' টেলিফোনে জানান যে, সরকার চাইছে ইস্টার্ন কম্যান্ড অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করুক। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, "এটা অবাস্তব। কারণ আমাদের হাতে আছে শুধু পার্বত্য এলাকায় অভিযান পরিচালনার উপযোগী মাউন্টেন ডিভিশন। তাদের কাছে ব্রিজ তৈরির কোনো ধরনের সাজ-সরঞ্জাম নেই এবং সমতলে চলাচলের উপযোগী যানবাহনের পরিমাণও তাদের খুবই কম। কলকাতা থেকে ঢাকার মধ্যে বেশ কয়েকটি বড় ও চওড়া স্রোতস্বিনী নদী আছে। আবার বাংলাদেশের অপর পাশে আগরতলার প্রতিরোধব্যবস্থাও ভঙ্গুর। প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে শুধু এক গ্যারিসন ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন আছে। দুরূহ যোগাযোগব্যবস্থার কারণে শক্তি বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। আমাদের মাউন্টেন ডিভিশনগুলোকে উপযুক্ত সরঞ্জামে সজ্জিত করে নদীবহুল অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতেও বেশ সময় লেগে যাবে। আসন্ন-বর্ষাকালে নিমজ্জিত ধানক্ষেতের কারণে সেতুবিহীন নদীগুলো পার হওয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে রওয়ানা দিলেও আমরা বড় জোর পদ্মা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবির পক্ষে বিশ্বজনমত তখনও পর্যন্ত সংগঠিত হয়নি। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলোও পূর্ব পাকিস্তানের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারে ততটা ওয়াকিবহাল ছিল না।"

জেনারেল মানেকশ' জানতে চাইলেন, কবে নাগাদ আমরা তৈরি হতে পারব। আমি জানালাম, "আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম দেয়া হলে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে আমরা তৈরি হতে পারব। এর মধ্যে বর্ষার পানি সরে গিয়ে রাস্তাঘাটও

চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠবে।" হতাশ বিরক্ত মানেকশ' বললেন, এ বিষয়ে পরে তিনি আমার সাথে কথা বলবেন।

পরদিন জেনারেল মানেকশ' আবার ফোন করে যখন বললেন, উচ্চ পর্যায়ের সরকারি আমলারা সেনাবাহিনীকে "কাপুরুষ না হলেও অতি-সাবধানী" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল তখন স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ। তিনি বললেন, বিষয়টি আমাদের পুনর্বিবেচনা করা উচিত। আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে অবিচল থেকে আমি বললাম যে, তিনি ইচ্ছে করলে সরকারকে জানিয়ে দিতে পারেন, ইস্টার্ন কম্যান্ডই টালবাহানা করছে এবং তারাই এই দেরির জন্য দায়ী। এই কথার ফলে তীব্র অভিযোগের মুখোমুখি হবার একটা আশঙ্কা আমরা সৃষ্টি করলাম। তারপরেও এটা জেনারেল মানেকশ'র কৃতিত্ব ও সাহসিকতা যে, তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আমাদের অবস্থান পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। (ইন্দিরা গান্ধীকে প্রদত্ত মানেকশ'র পরবর্তী বিবৃতির বিশদ বিবরণীর জন্য পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য।)

এর অব্যবহিত পরে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর ডিরেক্টর জেনারেল কে রুস্তমজী (K Rustomji)-র নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ফোর্ট উইলিয়ামে আমার বাসায় আসেন। তাঁর সাথে ছিলেন ডেপুটি ইন্সপেকটার জেনারেল গোলক মজুমদার (Golok Mazumdar) মেজর জেনারেল নরিন্দর সিং (Narinder Singh)। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খুব উত্তেজিত। রুস্তমজী বললেন যে, হাতে বেশি সময় নেই, অথচ করণীয় কাজ প্রচুর। আমি জানতে চাইলাম, তিনি কীসের কথা বলছেন। তিনি বললেন, "পাকিস্তানিদেরকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাড়ানোর কাজটা ইস্টার্ন কম্যান্ড করতে রাজি না হওয়ায় সরকার বিএসএফ-এর ওপরে এই কাজের দায়িত্ব দিয়েছে।" তিনি রসিকতা করছেন মনে করে আমি হেসে উঠলাম। কিন্তু গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন যে, আগামী দু-তিন সপ্তাহ পরে ঢাকায় যে বিজয়ী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেছেন, তাতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে একটা দল পাঠানোর জন্য ইস্টার্ন কম্যান্ডকে আমন্ত্রণ জানাতেই তাঁর এখানে আসা। এর মধ্যে নদীর ওপারে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্টে হঠাৎ বিস্ফোরণের আলোয় আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি বর্তমানে ফিরে এলাম। আমি অনুধাবন করলাম যে, তাঁরা সত্যিই সিরিয়াস এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সেনাবাহিনী তার সমস্ত শক্তি ও সংস্থান দিয়েও যা করতে পারবে না বলে এই মুহূর্তে মনে করছে, সেটা করার ক্ষমতা তাঁদের আছে।

যখন আমি রাজস্থানে ১২ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের কম্যান্ডে ছিলাম, তখন থেকেই রুস্তমজীকে আমি চিনি। তাঁকে আমি বললাম, সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে তাঁর বাহিনীকে ফিরে আসতে হবে। তিনি যদি তাঁর বাহিনীকে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগাতে চান, তাহলে তাঁর উচিত হবে সুন্দরবনের জলাভূমিতে অথবা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করা। এর ফলে তিনি ভবিষ্যতে সুবিধাজনকভাবে অপারেশন পরিচালনা করতে পারবেন।

বিএসএফ-এর পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দেবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু একটা ঘটনার উল্লেখ করলে সেখান থেকেই অনেক কিছু বোঝা যাবে বলে আমার ধারণা। সপ্তাহ দুয়েক পরে যশোর রোডের বনগাঁ সীমান্ত পোস্টে নিয়োজিত বিএসএফ-এর কম্যান্ডিং অফিসারের একটা ফোন পেলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের কয়েক মাইল ভেতরে

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে এবং পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক তাদেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত। আমি জানতাম, ওই এলাকায় কোনো পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক নেই। এই ফোনের আসল উদ্দেশ্য ছিল লড়াইয়ের মধ্যে আমাদেরকে আগেই জড়িয়ে ফেলা। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁদেরকে উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী সেনাদল সেখানে পৌঁছাতে পারবে কি না। তিনি বললেন, পারবে। আমি তখন বললাম, যে পথ দিয়ে উদ্ধারকারী সেনাদল পৌঁছাতে পারবে, সেই একই পথ দিয়ে তাদেরও বেরিয়ে আসতে পারা উচিত। শেষ পর্যন্ত যদি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অথবা ইস্ট পাকিস্তান রাইফ্‌ল্‌সের কোনো অংশকে সাথে পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকেও আমি সাথে নিয়ে নিতে বললাম। সীমান্তের এপার থেকে আমরা তাদেরকে কাভার করব। তারপরে আমরা একটি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন বর্ডার পোস্টে পাঠাই তাদেরকে কাভার করার জন্য এবং এভাবেই বিএসএফ-এর প্রত্যর্পণ শেষ হয়। প্রকাশিত পাকিস্তানি সূত্র অনুযায়ী, বিএসএফ-এর ছয়জন সদস্যকে বন্দি করা হয় এবং পাকিস্তানিরা পরবর্তীতে ঢাকায় তাদেরকে প্যারেড করায়। এটাই ছিল ঢাকায় বিএসএফ-এর বিজয়ী কুচকাওয়াজ!

১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যরা যখন যশোর–বনগাঁ সড়ক ধরে ভারতে ফিরে আসছিল, তখন পশ্চাদ্ধাবনরত পাকিস্তানিরা বেশ কিছু গোলাবর্ষণ করে এবং সেগুলো সীমান্তের এপারে এসে পড়ে। ক্যাপ্টেন সান্ধু (Sandhu)-কে সাথে নিয়ে আমি সেই এলাকায় যাই এবং বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে দেখা করি। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সীমান্তের ওপারের কাস্টম্‌স পোস্টে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে আমি পরামর্শ দিলাম যে, সেই এলাকা এবং সেখানে প্রোথিত বাংলাদেশের পতাকার নিরাপত্তার জন্য তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদেরকে নিয়োগ করতে পারেন। সংগ্রামের পুরোটা সময় জুড়ে পতাকাটি ওখানেই ছিল।

২৯ এপ্রিল ইস্টার্ন কম্যান্ড সরকারিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করার দায়িত্ব লাভ করে। একই সাথে সীমান্তবর্তী বিএসএফ-কেও ইস্টার্ন আর্মির অধীনে আনা হয়।

কে রুস্তমজীকে আমি একজন দক্ষ ও বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন অফিসার হিসেবে জানতাম। আমি জানি না, কেন তিনি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া এরকম একটা অভিযানে তাঁর সৈন্যদেরকে নিয়োজিত করলেন। হয়ত প্রচণ্ড চাপের মুখে তিনি এটা করেছেন অথবা তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর পরিশ্রমে গড়ে তোলা বিএসএফ-এর জন্য এই সাফল্য বাড়তি প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে কিংবা এটাও হতে পারে যে, পাকিস্তানিদেরকে প্রতিরোধের অতিরঞ্জিত বর্ণনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, বিএসএফ-এর ওপরে অর্পিত দায়িত্বসমূহ তারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী পালন করার ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিএসএফ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং অপরিসীম অবদান রেখেছে। প্রাথমিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও রুস্তমজী ও তাঁর বাহিনী পরবর্তীতে যে সাফল্য লাভ করেছেন, সেই কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁদের প্রাপ্য।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তন

পাকিস্তান সরকার তার কূটনৈতিক তৎপরতা দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বারে বারে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনাবলি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলে। ফ্রান্সও পরে তাদের সাথে যোগ দেয়। ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও তুরস্কের মতো মুসলিম দেশসমূহ খুব দ্রুত পাকিস্তানের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গ্যানাইজেশন (Central Treaty Organization)-ও এ ব্যাপারে অন্য কাউকে হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান জানায়। আরব রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষত সৌদি আরব পাকিস্তানের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। সেই তুলনায় মিশরের ভূমিকা ছিল বেশ নিস্পৃহ। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানায় (পরিশিষ্ট ১৪ দ্রষ্টব্য)। ইয়াহিয়া খান জবাবে ভারতের সমালোচনা করে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অন্যদিকে চীনও অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে তার সমর্থন ব্যক্ত করে (পরিশিষ্ট ১৫ দ্রষ্টব্য)। অধিকাংশ লোকই এই সমর্থনকে সামরিক না ভেবে বরং রাজনৈতিক সমর্থন হিসেবে ধরে নেয়, যদিও পাকিস্তানের প্রতি চীন সামরিক ও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রাথমিক পর্যায়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে ছিল। পরবর্তীতে এই অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পাকিস্তানপ্রীতির কারণে নিক্সন (Nixon) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেন।

ইতোমধ্যে মার্চ ১৯৭১-এর শেষের দিকে প্রতিরোধকারী বেশ কিছু বাঙালি নেতা কলকাতায় পৌঁছান। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাজউদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, কর্নেল এম এ জি ওসমানী ও উইং কম্যান্ডার খন্দকার। অল্পদিনের মধ্যেই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয় এবং এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয় থিয়েটার রোড (শেক্‌স্‌পীয়ার সরণি)-এর একটি বাংলোয়। প্রথমদিকের কয়েকটি আলোচনায় তাজউদ্দিন ও নজরুল ইসলামের সাথে আমিও উপস্থিত ছিলাম। নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে যাঁরা ভারতে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদেরকে নিয়ে সীমান্তের ওপারে বৈদ্যনাথতলা তথা মুজিবনগরে তাঁরা পার্লামেন্ট

অধিবেশন অনুষ্ঠানের ইচ্ছে পোষণ করেন। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুক্ত অঞ্চল তাঁদের হাতে না থাকায় পালিয়ে আসা পার্লামেন্ট সদস্যদের সংখ্যার স্বল্পতা ও মুজিবের অনুপস্থিতির কারণে আমি তাঁদেরকে অধিবেশন অনুষ্ঠানের পরিবর্তে অস্থায়ী সরকার গঠনের পরামর্শ দিই। উদাহরণ হিসেবে আমি তাঁদেরকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার স্বাধীন ফরাসি সরকার ও জেনারেল দ্য গল (de Gaulle)-এর উদাহরণ দিই। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া তৈরি করে দিতে তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেন। কয়েকদিন পর আমি সেটা তাজউদ্দিনকে দিলে কলকাতার বিশিষ্ট কয়েকজন আইনজ্ঞকে দিয়ে তিনি সেটা আইনগত দিক থেকে নিখুঁত, বিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত করিয়ে নেন। ঘোষণাটি ১৭ এপ্রিল চূড়ান্তভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী বৈদ্যনাথতলায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে পেছনের দিকে কিছু বিদেশী সাংবাদিক থাকায় দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা বিএসএফ সদস্যদেরকে চেয়ার সরাতে দেখে ফেলেন।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ইস্টার্ন কম্যান্ডের কর্নেল ইন্টেলিজেন্স কর্নেল খারা (Khara)-কে কলকাতাস্থ পাকিস্তানি হাই কমিশনে যোগাযোগ করে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি কর্মচারীদের মনোভাব জানতে আমি নির্দেশ দিই — প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে তাঁরা একাত্মতা ঘোষণা করতে রাজি কি না। একজন মধ্যস্থতাকারীর সাহায্যে কর্নেল খারা তাঁদের সাথে যোগাযোগ করতে সমর্থ হন। তাঁরা জানান, তাঁদের চাকরি, বেতন, ভাতা ও পেনশনের নিশ্চয়তা দেয়া হলে তাঁরা অবশ্যই এই পক্ষে যোগ দেবেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি রুস্তমজীর উপস্থিতিতে তাজউদ্দিন ও নজরুল ইসলামের সাথে দেখা করে তিনজনকেই আমি বিষয়টি বুঝিয়ে বলি। তাজউদ্দিন প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা প্রদান করতে সম্মত হন। এর পরবর্তী পর্যায় থেকে বিএসএফ আরো ভালভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে বলে রুস্তমজীর কাছে আমি জানতে চাই, এই দায়িত্ব বহন করতে তিনি রাজি কি না। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ১৮ এপ্রিল হাই কমিশনের প্রধান কর্মকর্তারা এপক্ষে যোগ দেন। এর একটি ভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া আমরা আশা করেছিলাম। কাজটির স্পর্শকাতরতার কথা ভেবে আমাদের উদ্যোগের বিষয়টি আমরা সেনাবাহিনীর চেইন অভ্ কম্যান্ডকে অবহিত করিনি। কয়েকদিন পরে ঘটনা জানতে পেরে এই কৃতিত্বের জন্য প্রধানমন্ত্রী জেনারেল মানেকশ'র কাছে সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেন। মানেকশ' এই ব্যাপারটির পূর্বাপর কিছুই জানতেন না। তিনি ব্যাখ্যা দাবি করলেন, কেন এই বিষয়টি তাঁর কাছে চেপে রাখা হয়েছে। অরোরা মাঝরাতে ফোন করে জানতে চাইলেন, তাঁকেই বা কেন অন্ধকারে রাখা হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম যে, বিষয়টি অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর বলে সঙ্গত কারণেই এটা আমরা কাউকে জানাইনি।

মার্চের শেষভাগে গৃহীত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহায়তা দানের ব্যাপারে সিদ্ধান্তটি পররাষ্ট্র-বিষয়ক মন্ত্রী অনেক পরে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ২৯ জুলাই পার্লামেন্টে প্রদত্ত এক প্রতিবেদনে তিনি বলেন,

সমবেদনা ও সহযোগিতার অঙ্গীকারের একটি সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে এই পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে এবং সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে আমরা এটা বাস্তবায়িত করছি এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সমর্থন দানের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু আমরা করছি (This Parliament had unanimously adopted a resolution pledging sympathy and support, and we are pursuing that resolution in the best possible manner and we are doing everything possible to lend support to the freedom fighters.)।

মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কী ধরনের কী মানসম্পন্ন সহায়তা আমরা দিয়েছিলাম, বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থে সেটা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। জেনারেল নিয়াজি (Niazi)-র পিআরও সিদ্দিক সালিক (Siddiq Salik) তাঁর *উইটনেস টু সারেন্ডার (Witness to Surrender)* গ্রন্থে বলেছেন যে, ১০০,০০০ গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণশিবির স্থাপন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে ৩০,০০০ জন সাধারণ প্রথাসিদ্ধ কায়দায় যুদ্ধ করবে এবং বাকি ৭০,০০০ যুদ্ধ করবে গেরিলা কায়দায়। রবার্ট জ্যাকসন (Robert Jackson) তাঁর *সাউথ এশিয়ান ক্রাইসিস (South Asian Crisis)* বইতে লিখেছেন যে, মে মাসের শুরু থেকে বাংলাদেশী বাহিনীর দল গঠন, প্রশিক্ষণ ও সশস্ত্রীকরণ আরম্ভ হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলাযুদ্ধ চালাবার জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে প্রচ্ছন্নভাবে সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়। মুক্তিবাহিনীর অভিযানকে সালিক সংক্ষেপে তিনটি পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। জুন ও জুলাই মাসে মুক্তিবাহিনী লড়াই করেছে মূলত সীমান্ত অঞ্চলে, যেখানে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য ভারতীয় বাহিনী আশেপাশেই ছিল। সেই পর্যায়ে তাদের মূল সাফল্যের মধ্যে ছিল ছোটখাট ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া, পাকিস্তানিদের কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করা, ইত্যাদি। এর পরের দুই মাসে তারা ঢাকা পর্যন্ত পাকিস্তানি সাঁজোয়া বহরের ওপরে অ্যামবুশ করা থেকে শুরু করে পুলিশ স্টেশন ঘেরাও করা, গুরুত্বপূর্ণ ফরমেশনসমূহ উড়িয়ে দেয়া, নৌযান ডুবিয়ে দেয়া, ইত্যাদি কাজ করে। অক্টোবর ও নভেম্বরে ভারতীয় সৈন্য ও আর্টিলারির সহায়তায় সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে তারা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে শহরগুলোতে পাকিস্তানিদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তিনি বলেছেন যে, এই সময়েই ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানি অবস্থানের কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থানে ব্রিজহেড তৈরি করে, যা পরবর্তীতে যুদ্ধের সময়ে সুবিধাজনকভাবে তারা ব্যবহার করে।

বাংলাদেশ সরকার, পাকিস্তানি প্রচারমাধ্যম ও হাজার হাজার মুক্তিসেনার মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীকে দেয়া আমাদের সহায়তার কথা ভারতের সর্বস্তরের মানুষ জানতে পারে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীকে যে পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সেটা শুরু থেকেই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এই পদ্ধতিতে দক্ষতার চেয়ে সংখ্যাধিক্যের ওপরে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। তিন-চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণে শুধু মৌলিক বিষয়গুলোই হয়ত মোটামুটিভাবে শেখানো সম্ভব। এছাড়াও নিম্ন ও মধ্যম পর্যায়ের অধিনায়ক তৈরির ওপরেও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা

১. জ্যাক জেকব, ১৯৪২ স্নালে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে

৩. ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানিকশ'

৪. লেফটন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

৫. লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল জ্যাক জেকব

হয়নি। প্রশিক্ষণের মেয়াদ আরো কিছুটা বেশি হলে এবং নিম্ন ও মধ্যম পর্যায়ের অধিনায়ক তৈরিতে আরো মনোযোগ দিলে মুক্তিবাহিনী আরো বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হত।

সামরিক উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে ১৪ এপ্রিল কর্নেল এম এ জি ওসমানীর নিয়োগের সাথে সাথে বাহিনী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এই অফিসার ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সাথে আত্মিকভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। নিজেকে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিয়মতান্ত্রিক। পাকিস্তানি বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো ও কৌশল অনুযায়ী তিনি নিজের বাহিনীর বিন্যাস চেয়েছিলেন। গেরিলা যোদ্ধার ও নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে তাঁর দ্বিমত ছিল। মুক্তিবাহিনীর চেয়ে নিয়মিত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তৈরিতে তাঁর আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল বেশি। ওসমানীর আচরণ ছিল পুরোপুরি সৈনিকসুলভ। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন এই মানুষটি ছিলেন চূড়ান্ত কষ্টসহিষ্ণু। সাধারণ ক্যাম্পখাটে তিনি ঘুমোতেন, এমনকি কলকাতায় তাঁর বাংলোতেও তিনি ক্যাম্প-ফার্নিচার ব্যবহার করতেন। কিন্তু ভোজনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় খুঁতখুঁতে ও রীতিমতো বিলাসী। এমনকি যুদ্ধ চলাকালীনও তিনি স্বাভাবিক পরিস্থিতির মতোই নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আহার করতে পছন্দ করতেন। বিভিন্ন উপলক্ষে আমার সাথে তিনি যখনই আহারে বসেছেন, সব সময়ই তাঁকে আমি পাক্কা সাহেবি খানা সার্ভ করেছি: স্যুপ, মাছের একটা কোর্স, সবজিসহ রোস্ট, ডিজ্যার্ট, স্যাভৌরি এবং সবশেষে কফি।

ওসমানী বিভিন্নভাবে তাঁর পছন্দমতো কাজ করতে সক্ষম হন। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ফিরে আসা ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নগুলোকে পুনঃসংগঠিত করা হয়। ১, ৩ ও ৮ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নকে উত্তর মেঘালয় সীমান্ত অঞ্চলে এবং ২ ও ৪ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নকে পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও প্রায়-গঠিত একটি আর্টিলারি ব্যাটারি দিয়ে আরো তিনটি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন তৈরির ইচ্ছে ওসমানীর ছিল। প্রথমে অনুমান করা হয়েছিল যে, মুক্তিবাহিনী ও ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন সম্মিলিতভাবে ময়মনসিংহ জেলার বেশ বড় একটি অংশ শত্রুমুক্ত করবে। কিন্তু ওসমানী এতে বাধা দেন। তাঁর যুক্তি, পূর্বাঞ্চলে তিনি স্থানীয় পর্যায়ে আরো বেশি সহযোগিতা পাবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর ব্যাটালিয়নগুলোকে উত্তর থেকে তাঁর পরিচিত পূর্বাঞ্চলে পরিচালনা করেন।

ওসমানীর সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড ছিলেন উইং কম্যান্ডার খন্দকার। তিনি ছিলেন মার্জিত স্বভাবের দক্ষ অফিসার। যে কোনো সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবানুগ। জরুরি কাজ সময়মতো আদায় করে নেবার ক্ষমতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন খোলামনের অধিকারী, যে কারণে তাঁর সাথে কাজ করা সহজ ছিল।

ইস্টার্ন কম্যান্ডে আমাদের মত ছিল, পাকিস্তানের সাথে লড়াই শুরু হবে নভেম্বর অথবা ডিসেম্বরে। শরণার্থীদের চাপ বেড়ে যাওয়ায় তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করে বানানো শিবিরগুলো ভরে যায় এবং নতুন শিবির তৈরি করার দরকার পড়ে। এই

পর্যায়ে শরণার্থীদের সংখ্যা নব্বই লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং দ্বিমত-পোষণকারী মুসলমানদের ওপরে পাকিস্তানিদের অত্যাচার ভয়াবহ পর্যায়ে চলে যায়। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানিদের সংঘটিত হত্যা, ধ্বংস, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতার প্রামাণিক চিত্র ও সংবাদ ব্যাপকভাবে ধারণ করছিল। আমরাও তাদের হত্যাযজ্ঞের প্রামাণিক প্রতিবেদন অব্যাহত ধারায় পেতে থাকি। কিন্তু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমসমূহ এই নিষ্ঠুরতার প্রকৃত রূপ অনুধাবন করতে অনেক সময় নিচ্ছিল। আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের দুর্দশার এই চিত্র আমাদেরকেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরতে হবে।

প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কার্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত হলেও অধিকাংশ বিদেশী সাংবাদিক, আন্তর্জাতিক বেতার ও টেলিভিশন নেটওয়ার্কের প্রতিবেদকরা কলকাতায় থেকে কাজ করছিলেন। দিল্লীর প্রেস রিলিজ তাঁদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার সেথনা (Sethna) ছিলেন ভারতীয় সাংবাদিকদের দেখাশোনার দায়িত্বে আর আমি বিদেশী সাংবাদিকদের। *লন্ডন সানডে টাইম্‌স (London Sunday Times)*-এর ঝানু ওয়ার করেস্‌পন্ডেন্ট নিকোলাস টোমালিন (Nicholas Tomalin) আমাদের ব্রিফিংয়ে তৃপ্ত হননি। বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে তিনি স্বচক্ষে ঘটনাবলি দেখে আসার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ সাহসী রিপোর্ট পাকিস্তানিদের নৃশংসতার দিকে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সত্যিকারের পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন ওয়ার করেস্‌পন্ডেন্ট টোমালিন গোলান হাইট্‌স্ (Golan Heights)-এ পেশাদারি দায়িত্ব পালনের সময় নিহত হন — যথারীতি সামনে থেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে। *নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স (New York Times)*-এর প্রতিনিধি ও পরবর্তীতে *কিলিং ফিল্ডস্ (Killing Fields)*-খ্যাত সিডনি শ্যানবার্গ (Sidney Schanberg) এবং সেই সাথে *নিউজউইক (Newsweek)*-এর টনি ক্লিফটন (Tony Clifton)-ও এসবের প্রামাণিক প্রতিবেদন তৈরি করেন। অ্যালান হার্ট (Allan Hart)-এর নেতৃত্বে বিবিসি-র একটি টেলিভিশন প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে আমরা সাহায্য করি। যেসব ছবি তাঁরা তোলেন, তার মধ্যে নির্বিচারে গণহত্যাই বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে। বন্যা কেউলি (Vanya Kewley) নামে এক মহিলার নেতৃত্বে গ্রানাডা টেলিভিশনের একটি দল আগরতলা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়ে এবং বিস্ময়কর কিছু ছবি তোলে। এই দলের সাথে আমরা বিজু পটনায়েক (Biju Patnaik)-এর অনুরোধে তাঁর কন্যা গীতা মেহ্‌তা (Gita Mehta)-কে পাঠিয়ে দিই। দ্য ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং করপোরেশন অভ্ আমেরিকা এবং সিবিএস (CBS)-ও তাদের টিম পাঠায়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের পাকিস্তানপ্রীতি সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতার প্রতিবাদে সারা বিশ্ব বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বিশ্ব জুড়ে, এমন-কি খোদ আমেরিকাতেও, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত দানা বাঁধতে শুরু করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপরে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিং করার জন্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোকে বাংলাদেশ ও ভারতের ধন্যবাদ জানানো উচিত।

বড় যে অসুবিধাগুলোর মুখোমুখি আমাদেরকে হতে হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল সামরিক ও সংস্থানিক (topographical) গোয়েন্দা বিভাগের অভাব। যে ম্যাপটি আমাদের কাছে ছিল, সেটা পঞ্চাশ বছরের পুরনো ও সেকেলে। সাম্প্রতিককালের ম্যাপ আমাদেরকে সংগ্রহ করতে হয়। এই কাজের জন্য আমরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করি এবং তাদের কাছ থেকে আমরা একটি বাদে বাকি সমস্ত প্রয়োজনীয় এলাকার হালনাগাদকৃত ম্যাপ পেয়ে যাই। কলকাতাস্থ সার্ভে অভ্ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা সহতায়তা চেয়েছিলাম। সহযোগিতার ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতারও কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু ভারতে যে গ্রিড আমরা ব্যবহার করি, সেটার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ম্যাপ তৈরি করতে তারা ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানি ম্যাপগুলোর স্কেল মেট্রিক হলেও সেগুলো ভিন্ন ধরনের গ্রিড অরিজিনের ভিত্তিতে তৈরি এবং সেখানে গ্রিডের মাপ আছে গজের হিসেবে; অথচ আমাদেরগুলোতে আছে মিটারের হিসেব। আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, বাংলাদেশের অপারেশনে আমরা পাকিস্তানি ম্যাপেরই প্রতিলিপি ব্যবহার করব, যদিও আমাদের আর্টিলারিতে সেসব কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করবে। সার্ভে অভ্ ইন্ডিয়া আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি তৈরি করে দেয় এবং সেগুলো আমরা বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে বিতরণ করি। পরে লড়াই শুরু হলে আমাদেরকে ম্যাপের সমস্যায় পড়তে হয়নি। এখান থেকে যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি, দেখা গেছে, সেটা কোনো কাজেই লাগেনি। কারণ পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপের সময়েও হালনাগাদকৃত ম্যাপের অভাবে আমাদের অপারেশন খুবই বাধাগ্রস্ত হয়।

ম্যাপ থেকে পাওয়া টপোগ্রাফিক্যাল তথ্যাদি ছাড়াও নদী, জোয়ার-ভাটা, নদীর মোহনা, খেয়াঘাট, ব্রিজ ও ব্রিজ তৈরির উপযোগী জায়গা, সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগব্যবস্থা সম্পর্কিত যাবতীয় বিস্তারিত তথ্য আমাদেরকে সংগ্রহ করতে হয়। নিখুঁত একটা সংস্থানিক মানচিত্র তৈরির জন্য আমাদের এঞ্জিনিয়ররা বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে। আমার এক জাহাজ ব্যবসায়ী বন্ধু, যিনি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন, খুলনা, মংলা, চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরের নোঙর-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন। নৌ গোয়েন্দা (Naval Intelligence) বিভাগের ডিরেক্টরও যাতে সব ধরনের আলোচনায় উপস্থিত থাকতে পারেন, তার ব্যবস্থা করেছিলাম।

সিগন্যাল ইন্টারসেপশন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক সামরিক গোয়েন্দা অধিদপ্তর (Military Intelligence Directorate)-ও আমাদেরকে সামান্যই তথ্য সরবরাহ করেছে। মুক্তিবাহিনীর কাছ থেকে যে সামান্য তথ্য পাওয়া গেছে, সেটাও নানাভাবে যাচাই করে তারপরে গ্রহণ করতে হয়। রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং —র' (Research & Analysis Wing—RAW)-এর কাছ থেকে আমরা কিছু পাইনি বললেই চলে। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিন্যাস সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে না পারার ফলে আমরা তাদের যুদ্ধের পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারছিলাম না। কলম্বো হয়ে আরো সৈন্য আসছিল, কিন্তু আমরা তার ধরন বা পরিমাণ সম্পর্কে কোনো ধারণাই করতে পারছিলাম না। ১৯৭১-এর এপ্রিল/মে মাস নাগাদ আর্মি

হেডকোয়ার্টার্সের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টরকে এটা আমি জানাই এবং সেই সাথে পূর্বাঞ্চলের সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসমূহের নিয়ন্ত্রণভার আমাদের ওপরে ন্যস্ত করার দাবি জানাই। উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁদের সংগৃহীত খবরের 'কাঁচামাল' প্রক্রিয়াজাত করার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সের নেই বলে সংগৃহীত তথ্যাদি তাঁর দিল্লীস্থ হেডকোয়ার্টার্সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে তা থেকে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকুই শুধু আমাদেরকে পাঠাবেন। এ এক অসম্ভব অবস্থা! এর ফলশ্রুতিতে ধরা-পড়া সিগন্যালগুলো নিয়ে আমাদের কিছু করার না থাকলে অথবা আমাদের নজরে না এলে শুধু যুদ্ধের প্রস্তুতির সময়েই নয়, বরং যুদ্ধ চলাকালীনও — যখন প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত দ্রুত, তখনও — আমরা কার্যকরভাবে কাজ করতে পারিনি। এর পর আমি কথা বলি জেনারেল মানেকশ'র সাথে এবং তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিই যে, সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্সের নিয়ন্ত্রণভার আমাদের ওপরে ন্যস্ত হলে প্রতিটি ইন্টারসেপ্টের কপি তাঁর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা অন্য বাহিনীগুলোতেও পাঠাতে পারি। মানেকশ' এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে প্রয়োজনীয় অর্ডার ইস্যু করেন। এর ফলে ইস্টার্ন কম্যান্ড-ই একমাত্র কম্যান্ডে রূপান্তরিত হয়, সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্সকে সরাসরি যার অধীনে রাখা হয়। এতে করে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানিদের অবস্থান ও হাল-হকিকত এবং তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছিলাম। পরবর্তীতে অপারেশনের সময়েও এই ব্যবস্থা আমাদেরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করে। আমরা এমনকি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত বেতার যোগাযোগও ইন্টারসেপ্ট করতে সক্ষম হই।

আমাদের মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি দিয়েও আমরা শত্রুপক্ষের হাই ফ্রিকোয়েন্সি (HF) ও ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি (VHF) সিগন্যাল নেটওয়র্ক ইন্টারসেপ্ট করেছি। আমাদের দিক-নির্দেশনার যন্ত্রপাতি সেকেলে হওয়াতে অবশ্য এলাকার সঠিক অবস্থান সব সময় বুঝতে পারিনি।

ইন্টারসেপ্টিং স্টেশনগুলো আমরা পুনর্বিন্যস্ত করি এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে একটি যোগাযোগ নেটওয়র্ক তৈরি করি। সিগন্যাল হেডকোয়ার্টার্স থেকে আমার অফিস পর্যন্ত সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সংস্থার কম্যান্ডিং অফিসার লেফ্‌টন্যান্ট কর্নেল পি সি ভল্ল (P C Bhalla)-কে প্রয়োজনে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করার অধিকার দেয়া হয়। কোড ব্রেকিংয়ে আমাদের সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। জটিল আর্মি কোডের ব্যাপারে তাদের সাফল্যের হার খুব কম হলেও ন্যাভাল কোড ব্রেকিংয়ে অবশ্য তারা যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখায়। বিমান মোতায়েন অথবা গানবোট চলাচল-সংক্রান্ত কোনো সিগন্যাল ইন্টারসেপ্ট করতে পারলে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফোর্ট উইলিয়ামের অ্যাডভান্সড এয়ার হেডকোয়ার্টার্সে জানিয়ে দিতাম। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ের একটা ইন্টারসেপ্টের কথা আমার মনে পড়ছে। মেঘনা নদীর গুপ্ত মোহনা (Gupta Crossing)-তে নৌযান একত্র করার একটা ইঙ্গিত এতে ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এটা দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। জেনারেল

মানেকশ' এটার অর্থ করেন, পাকিস্তানিরা সমুদ্রপথে বার্মা যাবার চিন্তা করছে। শুধু তাই নয়, তাদের পরিকল্পনা যে তিনি ধরতে পেরেছেন, সেটা তাদেরকে জানিয়ে দেবার জন্যও আমাদেরকে নির্দেশ দেন। ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্স মেজর জেনারেল ইন্দর গিল (Inder Gill)-এর সাথে আমি কথা বলি এবং তাঁকে জানাই যে, পাকিস্তানিদের সমুদ্রপথে বার্মা যাবার ব্যাপারটির মধ্যে না আছে কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা, না আছে কোনো গোয়েন্দা-সমর্থন। তাছাড়া এগুলো ছিল নদীপথের উপযোগী নৌযান, সমুদ্রযান নয়। ইন্দরকে আমি আরো জানাই যে, এই বক্তব্য সম্প্রচার করা হলে পাকিস্তানিরা কোড বদলে ফেলবে এবং আমাদের কোড ব্রেকারদের সমস্ত পরিশ্রম বৃথা যাবে; তখন আর কিছুই করার থাকবে না। ইন্দর আমার সাথে একমত হন এবং কথা দেন যে, জেনারেল মানেকশ'র সাথে এ ব্যাপারে তিনি কথা বলবেন। পরে আবার আমাকে ফোন করে তিনি জানান যে, স্যাম কোনো যুক্তি মানতে নারাজ এবং তাঁর বক্তব্য যাতে সম্প্রচার করা হয়, সেটার ওপরে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শেষ পর্যন্ত স্যামের বক্তব্য প্রচার করা হয় এবং ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানিরা তাদের ন্যাভাল কোড বদলে ফেলে। বলা বাহুল্য, পরবর্তীতে আমরা তাদের আর কোনো ন্যাভাল ট্রাফিকের মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ হইনি।

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বেতার যোগাযোগও আমরা ইন্টারসেপ্ট করতে পারতাম। ১৯৭১-এর ১ ডিসেম্বর আমরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো একটি মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করি। বঙ্গোপসাগরে কোনো পাকিস্তানি বাণিজ্য-জাহাজ যাতে প্রবেশ না করে, সে ব্যাপারে তাদেরকে এতে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্সসমূহে এটা এবং সেই সাথে ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি কোনো বেসামরিক বিমান না আসার জন্য আরেকটি হুঁশিয়ারি-সম্বলিত ইন্টারসেপ্ট আমরা পাঠিয়ে দিই। এসব ইন্টারসেপ্টের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করে আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে, ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা আমাদের বিমানঘাঁটিগুলোতে বোমাবর্ষণ করবে। শ্রীলঙ্কার নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত গাজী (Ghazi) সাবমেরিন থেকে পাঠানো তার বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ-সংক্রান্ত সিগন্যালও আমরা ইন্টারসেপ্ট করি। দিল্লী ও বিশাখাপত্তনমে নৌবাহিনীর কাছে এসব আমরা যথারীতি পাঠিয়ে দিই।

ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি

ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তুলনামূলকভাবে শিথিল ও বিকেন্দ্রীকৃত। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর চিফ অভ্ স্টাফ পালাক্রমে স্টাফ কমিটির সভাপতিত্ব করেন। এই নিয়োগের মেয়াদ নির্ভর করে পদ লাভকারী চিফের চাকরির মেয়াদের ওপরে। স্বায়ত্ত্বশাসিত অন্য দুই বাহিনীর ওপরে তাঁর কর্তৃত্ব থাকে সামান্যই। চেয়ারম্যানের ভূমিকা সামান্য কিছু সমন্বয় সাধনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সেটাও আবার বহুলাংশে নির্ভর করে বাহিনীপ্রধানের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর—কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর — সাথে তাঁর সম্পর্কের ওপরে। ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস-থেকে-আসা প্রতিরক্ষা সচিবের ওপরে যুদ্ধ-সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব নেই এবং কোনো যুদ্ধ-পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনো কিছু তাঁকে জানানোও হয় না।

চীনের সাথে যুদ্ধের আগে সেনাবাহিনীর মূল অপারেশনাল কম্যান্ড ছিল দুটি— ওয়েস্টার্ন ও ইস্টার্ন। সাদার্ন কম্যান্ড প্রথমে শুধু একটা ট্রেনিং কম্যান্ড ছিল। পরে সাদার্ন কম্যান্ডকে রাজস্থান ও গুজরাটের অপারেশনাল দায়িত্ব দেয়া হয়। সেনাবাহিনীর কম্যান্ডগুলোর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রণাঙ্গনে যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যানবাহন ও রসদের দিক থেকে তারা ব্যাপকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও তাদের ছিল। ইস্টার্ন কম্যান্ডের হেডকোয়ার্টার্স কলকাতায় হলেও বিমানবাহিনীর কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্স ছিল অন্য জায়গায়। প্রাথমিকভাবে ইস্টার্ন কম্যান্ডে আমাদেরকে বিমানবাহিনীর দুটি কম্যান্ডের সাথে যোগাযোগ রাখতে হত। এর একটি ছিল শিলংয়ে অবস্থিত ইস্টার্ন, যার দায়িত্বে ছিল উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এবং অন্যটি এলাহাবাদ (Allahabad)-এ অবস্থিত কেন্দ্রীয় অঞ্চল, যার দায়িত্বে ছিল গঙ্গার দক্ষিণের এলাকা। ব্যাপারটি ছিল আমাদের জন্য বেশ কঠিন, কারণ একটি কম্যান্ডের দূরত্ব ছিল কয়েক শ' মাইল; অন্যটিও খুব কাছে নয়। এই ধরনের অসুবিধাজনক অবকাঠামো নিয়ে একই সাথে স্থল ও বিমান আক্রমণ পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হবে বলে আমার ধারণা জন্মায়। এটা নিয়ে আমি জেনারেল মানেকশ'র সাথে কথা বলি। কিন্তু বিমানবাহিনী-প্রধানের সাথে তাঁর আন্তরিকতাশূন্য শীতল সম্পর্কের কারণে বিষয়টি তিনি বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানান। সৌভাগ্যক্রমে বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এয়ার চিফ মার্শাল পি সি লাল (P C Lal) ফোর্ট উইলিয়াম

পরিদর্শনে আসেন। সেই সময়ে তাঁকে আমি তাঁর বাহিনীর সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্য অনুরোধ করি, যাতে আমাদেরকে দুটির পরিবর্তে একটি মাত্র এয়ারফোর্স কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। কয়েক শ' মাইল দূরে অবস্থিত কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়টির ওপরেও আমি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি এবং ফোর্ট উইলিয়ামে একটি অ্যাড্ভান্সড এয়ার ফোর্স হেডকোয়ার্টার্স স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করি। পি সি লাল ছিলেন অসাধারণ যোগ্য ও বাস্তববাদী অফিসার। আমাদের অসুবিধাগুলো তিনি বুঝলেন এবং আমাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এর অব্যবহিত পরেই আমাদের অনুরোধ অনুযায়ী তিনি সীমানা নির্ধারণ করে দেন এবং ফোর্ট উইলিয়ামে অবস্থানের জন্য একটি অ্যাড্ভান্সড এয়ার ফোর্স হেডকোয়ার্টার্স গঠন করার নির্দেশ দেন। এসব প্রস্তাব আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পাঠালে সেনা ও বিমানবাহিনীর প্রধানের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত থাকায় এই পরিবর্তনগুলো বাস্তবায়িত না হবার আশঙ্কাই ছিল বেশি। নৌবাহিনীর ক্ষেত্রে ইস্টার্ন নৌবহরের হেডকোয়ার্টার্স ছিল বিশাখাপত্তনমে থাকলেও ইস্টার্ন কম্যান্ডে একজন লিয়াজোঁ অফিসার ছিলেন।

মানেকশ'র ছিল চমৎকার ব্যবহার ও নেতৃত্ব দানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব এবং সেই সাথে ছিল ইংরেজিতে অসাধারণ দখল। ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টে তাঁর কমিশন হয়। বার্মা থেকে হটে আসার সময় সিতাং (Sittang) ব্রিজের দখল নিয়ে লড়াইয়ের সময় তিনি আহত হন। সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য তিনি মিলিটারি ক্রস (Military Cross) লাভ করেন।

স্টাফ কলেজে স্যাম মানেকশ' তাঁর সামরিক জীবনের সবচেয়ে কঠিন সমস্যায় পড়েন। সেই সময়ে শুধু ভারতেই নয়, বরং সারা পৃথিবী জুড়ে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী আর বিমানবাহিনীগুলোর মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পারস্পরিক ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এর অজস্র উদাহরণ আছে। স্বঘোষিত জাতীয়তাবাদী লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল বি এম কাউল (B M Kaul) মানেকশ'কে সম্ভাব্য শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপপ্রচারে মেতে ওঠেন। পরবর্তীতে তিনি মানেকশ'র বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী কাজের অভিযোগ এনে কর্তৃপক্ষকে তার তদন্ত করতে প্ররোচিত করেন। এসব অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে তুচ্ছ নগণ্য ঘটনাবলি এবং নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক খাপছাড়া মন্তব্যও হাজির করা হয়। অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন। একদিন ডিনারের সময় স্টাফ কলেজের আরেকজন ইন্‌স্ট্রাক্‌টর লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল সিন্দে (Shinde)-র কোয়ার্টারে আমার টেলিফোন এল। টেলিফোনকারী আমাকে জানায় যে, সে কাউলের পক্ষ থেকে কথা বলছে। সে আমাকে মানেকশ'র বিরুদ্ধে প্রমাণাদি সরবরাহ করতে নির্দেশ দেয়। এর আগে লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল (পরবর্তীতে লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল) 'জরু' বকশী ('Zoru' Bakshi)-র উপস্থিতিতে

মানেকশ'র করা বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মন্তব্যের মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে মানেকশ'কে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। জরু বকশী কঙ্গোতে শান্তিরক্ষার কাজে জাতিসংঘ বাহিনীতে যোগদানের জন্য তখন আমেরিকায় বলে তাঁকে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে বলা হল যে, মানেকশ'র বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দিলে সামরিক বাহিনীতে আমার চাকরিজীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না এবং আমি যে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যেতে পারব। আমি এতে স্পষ্টতই অস্বীকৃতি জানাই। সেই অফিসার (তার পরিচয় আমি জানতাম) তখন বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করার পরামর্শ আমাকে দেয় এবং সেই সাথে আমাকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দেয় যে, আমি রাজি না হলে সেনাবাহিনীতে আমার জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হবে। উত্তরে আমি জানিয়ে দিলাম যে, এটাই আমার শেষ কথা। মানেকশ'র সৌভাগ্য বলতে হবে যে, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল দৌলত সিং (Daulat Singh) ছিলেন তদন্ত কমিটির প্রধান। দৌলত সিং ছিলেন সৎ ও উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন অফিসার। কাউল প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেননের প্রিয়পাত্র জেনেও তিনি কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করেননি। ফলে স্যাম অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ভারতের জন্য এটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, আর্মি সার্ভিস কোরের ভূতপূর্ব অফিসার কাউল ১৯৬২ সালে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালের মে মাসে মানেকশ' সেনাবাহিনীর চিফ অভ্ স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দিল্লীতে রওয়ানা দেবার দুই সপ্তাহ আগে ইস্টার্ন কম্যান্ডের চিফ অভ্ স্টাফ হিসেবে আমি কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছাই। মানেকশ'র স্থলাভিষিক্ত হন লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা (Jagjit Singh Aurora)। কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সে চিফ অভ্ স্টাফের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। পরিকল্পনা প্রণয়ন, সামরিক অভিযান পরিচালনা, যানবাহন ও রসদের ব্যবস্থা করা, হেডকোয়ার্টার্সের সৈনিক, অস্ত্রশস্ত্র ও বাহিনীর বিভিন্ন অংশের সমন্বয় সাধন, ইত্যাদি সবই চিফ অভ্ স্টাফের দায়িত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই পুরো হেডকোয়ার্টার্সের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। হেডকোয়ার্টাসকে অবশ্যই একটা টিম হিসেবে কাজ করতে হয়। আমি সেখানে পৌঁছাবার পর লক্ষ করে দেখলাম যে, বিভিন্ন শাখার মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। যেখানে করিডর ধরে কয়েক পা হেঁটে গেলেই একটা বিষয় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয় অথবা কোনো সমস্যার সমাধানে পৌঁছানো যায়, সেখানে চিঠি অথবা কার্যবিবরণী বিতরণ করা হয়। এই সেনা-আমলাতন্ত্র বেসামরিক আমলাতন্ত্রের মতোই হতাশাব্যঞ্জক। অল্পদিন পরেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ হিসেবে ব্রিগেডিয়ার আদি সেথনা (Adi Sethna) এসে যোগ দেন। আদি ছিলেন অমায়িক ও মিশুক এবং হেডকোয়ার্টার্সের এক বিশেষ সম্পদ—সকলের সাথে আন্তরিকভাবে মিশতে পারতেন।

আমাদের আরো সৌভাগ্য যে, চজ্জু রাম (Chajju Ram) ছিলেন প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার। চজ্জু ছিলেন পরিশ্রমী, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন — এই পদের জন্য যা অপরিহার্য। কর্নেল ইন্টেলিজেন্স হিসেবে আমাদের ছিলেন কর্নেল খারা — সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন আন্তরিক একজন অফিসার। তাঁর দায়িত্ব ছিল নিয়মতান্ত্রিকভাবে ও কার্যকরভাবে গোয়েন্দা কার্যক্রম সংগঠিত করা।

আমি সেখানে থাকাকালীন সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন চিফ এঞ্জিনিয়র। ব্রিগেডিয়ার 'বাবা' ভিদে ('Baba' Bhide)-কে আমরা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। আমাদের ভাগ্য ভাল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় এঞ্জিনিয়ারিং কর্মকাণ্ড সংগঠিত করতে সময়মতোই তিনি এসে পৌঁছান। ভিদেকে আমি পরিষ্কারভাবে আমার পরিকল্পনা জানিয়ে দিই যে, তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব ব্রিজ তৈরি করা। এই কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ, ত্রুটিপূর্ণ ব্রিজগুলোকে মেরামতের পর ব্যবহারোপযোগী করে তোলা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হল সময়মতো সেগুলোকে যথাস্থানে সঠিকভাবে স্থাপন করা। লড়াই শুরু হবার পর যোগাযোগের-জন্য-অতি-প্রয়োজনীয় এই ব্রিজগুলো প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই দরকারি সমস্ত জায়গায় সময়মতো স্থাপন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের অভিযানের সাফল্যের কৃতিত্বের অনেকখানিরই দাবিদার বাবা ভিদে।

আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে আমি ভাইস চিফ লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল হর প্রসাদ (Har Prasad) এবং ডিরেক্‌টর অভ্‌ মিলিটারি অপারেশন্‌স প্রথম মেজর জেনারেল কে কে সিং (K K Singh)-এর (১৯৭১ সালে ইনি পদোন্নতি পেয়ে একটি কোরের কম্যান্ডের দায়িত্ব লাভ করেন) সাথে এবং পরবর্তীতে দক্ষ, স্পষ্টবাক, সাহসী ও অভিজ্ঞ মেজর জেনারেল ইন্দর গিলের সাথে কাজ করেছি, যাঁর সমর্থন ও বিবেচনা ছাড়া আমার পক্ষে সাফল্যের সাথে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হত।

পরিকল্পনার বিবর্তন

পূর্ববঙ্গের ভূমি নিচু, সমতল, জলাভূমিতে পূর্ণ এবং অজস্র নদী ও খাল দিয়ে বহুধাবিভক্ত। সাধারণভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবহমান প্রশস্ত নদীগুলো নিম্নাঞ্চলে জোয়ার-ভাটা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এই ভূখণ্ডের বড় একটি অংশ প্লাবিত থাকে। চাষযোগ্য জমি অসংখ্য আল দিয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত। এসব জমিতে মূলত ধান আর পাটের আবাদ হয়। পূর্বদিকে পাহাড়ি এলাকায় কিছু চা উৎপন্ন হয়। সাধারণত মে মাসের শেষের দিকে বর্ষাকাল শুরু হয়ে সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ থাকে। উত্তরের তুলনামূলকভাবে উঁচু এলাকায় প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা হয় এবং এর ফলে কোনো কোনো নদী কয়েক মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। এখানকার প্রধান নদীগুলো হল গঙ্গা যা এখানে পদ্মা নামে পরিচিত, যমুনা স্থানীয়ভাবে যা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা। প্রতি বছর বর্ষায় পুরো ভূখণ্ডের বিশাল একটি অংশ ব্যাপকভাবে ডুবে যায় এবং বর্ষার পানি নেমে যাবার পর মাটি শুকোতে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত লেগে যায়। বাঁধানো রাস্তা ছাড়া যানবাহন চলাচল তখন খুবই দুরূহ আর মাঠের মধ্যে দিয়ে চলাচল তো প্রায় অসম্ভব।

সহজবোধ্য কারণেই প্রশস্ত নদী, খাল-বিল, বন-জঙ্গল ও ধানক্ষেত এবং অপ্রচুর রাস্তাঘাট ও রেলপথের কারণে এই ভূখণ্ডে নিজেদের দখল বজায় রাখা খুবই সহজ। নদীগুলোর ওপরে ব্রিজের সংখ্যাল্পতা আক্রমণের কাজ আরো কঠিন করে তোলে। ফেরিই নদী পারাপারের একমাত্র যথাযথ উপায়। এসব অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ শুধু সৈন্য নয়, তাদের সাথে পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, ইত্যাদিও একাধিক নদী পার করতে হয়। আমাদের সৌভাগ্য, পাকিস্তানিরা মূলত শহরগুলোতেই আস্তানা গেড়েছিল। নদী পারাপারের প্রবেশমুখে পাহারা বসালে আমরা হয়ত নদীও পার হতে পারতাম না, ঢাকাতেও পৌঁছাতে পারতাম না।

নদীগুলোর গতিপথ সম্পূর্ণ ভূখণ্ডটিকে চারটি সেক্টরে বিভক্ত করেছে। গঙ্গা বা পদ্মার উত্তরাঞ্চল এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সেক্টর। এর অন্তর্ভুক্ত প্রধান শহর দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী। পদ্মার ওপরের হার্ডিঞ্জ (Hardinge) রেলওয়ে ব্রিজ দিয়ে পশ্চিম সেক্টরের সাথে এই সেক্টর সংযুক্ত। উত্তরে এর শেষ প্রান্তে শিলিগুড়ি (Siliguri)-র সরু করিডর। সারা উত্তর-পূর্ব ভারতের সাথে সড়ক ও রেল যোগাযোগে এই করিডরের গুরুত্ব অপরিসীম।

পদ্মার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে পশ্চিম সেক্টর। এতে অন্তর্ভুক্ত প্রধান শহর যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও নদীবন্দর খুলনা। মেঘনা নদীর পূর্বাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর। এই সেক্টরভুক্ত প্রধান শহর সিলেট, কুমিল্লা ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাঞ্চল ও মেঘনার পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে গঠিত উত্তর-পূর্ব সেক্টর। এর অন্তর্ভুক্ত প্রধান শহর রাজধানী ঢাকা ও ময়মনসিংহ।

আমার ধারণা ছিল, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের অধিকৃত সমগ্র এলাকা রক্ষা করার চেষ্টা করবে। ভারতীয় লক্ষ্য যেহেতু উল্লেখযোগ্য একটি অংশ দখল করে সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত করা, পাকিস্তানিরা সেই হিসেব অনুযায়ী নিশ্চিতভাবেই অন্তত প্রধান শহরগুলো রক্ষার চেষ্টা করবে। পরবর্তীতে আমার এই অনুমান সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, যখন পাকিস্তানিরা প্রাথমিকভাবে সেই শহরগুলোর প্রবেশপথে ও পরে খোদ শহরগুলোতেই প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা জোরদার করে।

এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের ভূ-কৌশলগত (geostrategic) ও ভূ-রাজনৈতিক (geopolitical) প্রাণকেন্দ্র ঢাকা। ফলে, যে কোনো অপারেশনের লক্ষ্য হওয়া উচিত ঢাকা দখল করা। অন্য সেক্টরগুলো সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ'রকম যে, অন্যান্য শহর দখল করতে গেলে অনেক সময়ের দরকার এবং এতে প্রচুর প্রাণহানিও ঘটবে। অথচ এর পরিবর্তে আমরা যদি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের প্রাণকেন্দ্রগুলো দখল করতে পারি, তাহলেই পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এবং তাদেরকে আমরা হটে যেতে বাধ্য করতে পারব। উত্তর-পশ্চিম সেক্টরে ভৌগলিক অবস্থানের কারণে পাকিস্তানের সমস্ত যোগাযোগের প্রাণকেন্দ্র ছিল বগুড়া এবং সেই একই কারণে আমাদেরও অপারেশনের মূল লক্ষ্য ছিল বগুড়া। হিলি-গাইবান্ধা প্রধান সড়কই ছিল বগুড়াতে পৌঁছার সহজ পথ এবং এই কারণেই এখানে শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হবার আশঙ্কা। আরো কয়েকটি পথ অবশ্য ছিল, কিন্তু সেগুলোতেও প্রতিরোধ ছিল অনিবার্য। সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তীতে আমরা আপ-টু-ডেট ম্যাপ পাবার পর ফুলবাড়ির কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে বগুড়ার উত্তরে পীরগঞ্জ পর্যন্ত শুকনো মৌসুমে যানবাহন চলাচলের উপযোগী একটা রাস্তা চিহ্নিত করি। এই পথ ব্যবহার করে পাকিস্তানি প্রতিরোধকে পাশ কাটিয়ে উত্তরদিক থেকে বগুড়াতে প্রবেশ করা সম্ভব।

পশ্চিমে যাবতীয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল যশোর। এখান থেকে রাস্তা চলে গেছে ফরিদপুরের সেই জায়গা পর্যন্ত, যেখানে ঢাকার দিকে যাবার জন্য পদ্মার ওপরে একটি ফেরিঘাট আছে। মাঝে অবশ্য ঝিনাইদহ্ এবং মাগুরাতেও দুটি যোগাযোগকেন্দ্র ছিল। যশোরকে উত্তরদিক থেকে পাশ কাটিয়ে আসা সম্ভব ছিল এবং ফরিদপুরে নদীর অপর পারে ঢাকায় আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য ঘাঁটি স্থাপন সম্ভব ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টরে চাঁদপুর থেকে আশুগঞ্জ পর্যন্ত মেঘনা নদীর নিয়ন্ত্রণ লাভ ছিল অত্যন্ত জরুরি। এর ফলে কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এছাড়াও

এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকলে ঢাকায় অপারেশন পরিচালনা করা সহজ হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি জায়গা ছিল চাঁদপুর, দাউদকান্দি ও আশুগঞ্জ। এই সেক্টরের উত্তরে যোগাযোগ-কেন্দ্র ছিল মৌলভিবাজার ও শমশেরনগর এয়ারফিল্ড। সিলেটকে এমনিতেই সহজে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সম্ভব ছিল। ফলে জরুরি ভিত্তিতে এই শহর দখলের তেমন প্রয়োজন ছিল না। চট্টগ্রাম দখলও ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ বন্দরটিকে কার্যকরভাবে অবরুদ্ধ করার সামর্থ্য আমাদের শক্তিশালী নৌবাহিনীর ছিল। এছাড়াও এর অবস্থান পূর্বদিকে শেষ প্রান্তে হওয়ায় এর সামরিক গুরুত্ব ছিল খুবই নগণ্য।

ভূ-রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় প্রবেশ ছিল কঠিন ব্যাপার। ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা — সবগুলো নদীই কয়েক মাইল করে চওড়া। পাকিস্তানি ম্যাপে চিহ্নিত উত্তরে যে ব্রহ্মপুত্র ভারতীয় ম্যাপে চিহ্নিত যে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়েছে, সেটাও অনেক প্রশস্ত। উত্তর-পশ্চিমের বগুড়া~ফুলছড়িঘাট অক্ষরেখা ধরে এসে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করেও ঢাকায় প্রবেশ সম্ভব। আর উত্তরদিক থেকে হলে ঢাকায় আসতে হবে জামালপুর~টাঙ্গাইল হয়ে। এছাড়াও পশ্চিম সেক্টরের ঝিনাইদহ্~মাগুরা~ফরিদপুর~গোয়ালন্দঘাট হয়ে ঢাকায় পৌঁছানোর আরেকটি পথ আছে। এক্ষেত্রে প্রধান বাধা প্রথমে মধুমতি ও পরে পদ্মা নদী। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আসার অর্থ মেঘনা ও লক্ষ্যা নদী অতিক্রম করা দুটোই খুব প্রশস্ত।

স্ট্র্যাটেজি

বাংলাদেশে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না যেখানে স্ট্র্যাটেজি (সামগ্রিক রণকৌশল) নিয়ে পড়াশোনা হয় বা স্ট্র্যাটেজি শেখানো হয়। আমাদের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইউনিট, রেজিমেন্ট, ব্রিগেড এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডিভিশন পর্যায়ে ট্যাকটিক্স (মাঠ পর্যায়ের রণকৌশল) শেখাত। এর ফলশ্রুতিতে আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের পক্ষে যুদ্ধাবস্থার বাস্তবানুগ কোনো সামগ্রিক ধারণা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, কর্মপন্থার নির্ধারিত কোনো কৌশলগত বা রাজনৈতিক নীতিমালা ছিল না —এমনকি যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন বা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ঊর্ধ্বতন কোনো সংস্থাও ছিল না। আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহ কদাচিৎ পরিষ্কারভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এর ফলে বাহিনী হেডকোয়ার্টার্সসমূহের পরিকল্পনায় গভীরতার অভাব ছিল।

আন্তর্জাতিক মতামতের দিকে লক্ষ রেখে এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক যুদ্ধবিরতি আরোপের সম্ভাবনা থাকায় যে কোনো যুদ্ধাভিযান কার্যকর ও অর্থবহ করতে হলে তা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। ব্রিগেড কম্যান্ডার ও পরবর্তীতে ডিভিশনাল কম্যান্ডার হিসেবে আমি আমার সৈন্যদেরকে বিকল্প পথ ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। ১৯৬৯ সালে রাজস্থান মরুভূমিতে ১২ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জন্য আমার তৈরি ডেজার্ট ওয়ারফেয়ার ম্যানুয়্যালে যে দুটি বিষয়ের ওপরে আমি গুরুত্ব আরোপ করেছি, তা হল: আক্রমণের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত যোগাযোগ ও কম্যান্ডের প্রাণকেন্দ্রসমূহ, এবং এসব লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য বিকল্প পথ ব্যবহার করা উচিত, যাতে শত্রুপক্ষের মূল প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। লক্ষ্যস্থলের ওপরে একবার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তখন সড়কের ব্যবস্থা করা কোনো কঠিন কাজ নয়।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের কম্যান্ডারদের মাথায় নতুন কোনো মত বা ধারণা ঢোকানো ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। সারা জীবন তাঁরা পাকা রাস্তা দিয়ে তাঁদের পেছনে মেইন্টেন্যান্স নিয়ে চলাফেরা করেছেন। এই সাধারণ কথাটি তাঁদেরকে বোঝাতে বিস্তর ঘাম ঝরাতে হয়েছে যে, অগ্রবর্তী মূল দল ও মেইন্টেন্যান্স বাহিনীকে যে একই পথ ধরে এগোতে হবে, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম থাকা সমীচীন নয়। মূল বাহিনী স্বল্প সময়ের জন্য লক্ষ্যস্থলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলেও পরবর্তীতে মেইন্টেন্যান্সের

জন্য প্রধান সড়ক খুলে দেয়া যেতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, প্রথমদিকে আমাদের বেশির ভাগ কম্যান্ডার এভাবে অপারেশন পরিচালনা করতে অভ্যস্ত ও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন, এতে করে বাহিনীর পার্শ্বদেশ (flank) আক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে এবং এই কারণে হিসেব করা ঝুঁকিও তাঁরা নিতে রাজি হননি। এই পার্শ্বদেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা আর সাপ্লাই লাইন খোলা রাখার চিরাচরিত ধারার প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকায় আক্রমণের পন্থা হিসেবে সেই পাকা রাস্তা ধরেই আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, শত্রুপক্ষ ঠিক যেমনটি আশা করছিল।

১৯৭১-এর মে মাসের শেষনাগাদ একটি খসড়া আক্রমণ-পরিকল্পনা আমি প্রণয়ন করি। নিচে বর্ণিত কৌশলগত দিকসমূহ এতে বিবেচনা করা হয়:

ক. চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল হবে পূর্ব পাকিস্তানের ভূ-কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র ঢাকা।

খ. আক্রমণ রচনার পথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে এড়িয়ে যাওয়া ও তাদের মধ্যেকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

গ. অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু নির্বাচনের পূর্বশর্ত হবে শত্রুপক্ষের যোগাযোগ-কেন্দ্রসমূহ দখল করা এবং শত্রুর কম্যান্ড ও নিয়ন্ত্রণ-কাঠামো ধ্বংস করা। শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটিগুলো এড়িয়ে যেতে হবে এবং এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

ঘ. প্রাথমিক অপারেশনগুলোর উদ্দেশ্য হবে পাকিস্তানি বাহিনীকে সীমান্তের কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসা, যাতে ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত থাকে।

ঢাকায় পাকিস্তানি ক্র্যাকডাউনের আগে পর্যন্ত ইস্টার্ন কম্যান্ডের দায়িত্ব ছিল সম্ভাব্য চীনা আক্রমণ থেকে ভারতীয় সীমান্তের অখণ্ডতা রক্ষা করা। এছাড়াও নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজো পাহাড়ের দুষ্কৃতিকারীদের সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা ইস্টার্ন কম্যান্ডকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ভুটানকে সম্ভাব্য চীনা আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। নক্‌শাল আন্দোলন দমনের কাজেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমাদের সহায়তা করতে হয়। কাজেই, পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সম্ভাব্য আক্রমণ পরিচালনা করতে হলে প্রয়োজনীয় লোকবল কতটা পাওয়া যাবে, তা নির্ভর করবে ওপরে বর্ণিত অপারেশনসমূহে কত লোক জড়িত থাকবে, তার ওপর। চীনের সাথে যুদ্ধে ন্যূনতম শক্তির প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করে সেটা রেখে রিজার্ভ ও দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইউনিটসমূহকে পূর্ব পাকিস্তানের অপারেশনে নিয়োজিত করা যেতে পারে। চীনাদের ভাবভঙ্গি বেশ আক্রমণাত্মক ও পাকিস্তানপন্থী হলেও আমাদের ধারণা ছিল, উত্তরসীমান্ত রক্ষার জন্য নিয়োজিত সৈন্য-সংখ্যা কমানো যেতে পারে, বিশেষত অপারেশন যদি হয় শীতকালে, যখন হিমালয় পর্বতমালার অধিকাংশ গিরিপথই বন্ধ

হয়ে যায়। সিকিম (Sikkim)-এর জন্য ৩৩শ কোরের কম পক্ষে দুই ডিভিশন — ১৭ ও ২৭ মাউন্টেন ডিভিশন এবং ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেড শিলিগুড়ি করিডরের জন্য এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের জন্য ৪র্থ কোরের দুই ডিভিশন — ২ ও ৫ ডিভিশন প্রয়োজন পড়ে। পরিস্থিতি খুব খারাপ হলে অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ভুটানে আমরা কিছু সৈন্য পাঠাতে পারতাম। পরবর্তীতে হেডকোয়ার্টার্স পাঁচ ব্যাটালিয়নবিশিষ্ট ৬ মাউন্টেন ডিভিশন পশ্চিম ভুটানের জন্য এবং ১৬৭ মাউন্টেন ব্রিগেড পূর্ব ভুটানের জন্য আলাদা করে রাখে। আমাদের তরফ থেকে নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের বিদ্রোহ দমনের জন্য ৮ মাউন্টেন ডিভিশনের একটি ব্রিগেড বরাদ্দ করার প্রয়োজন পড়ে এবং মিজোরামের অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সেখানে অবস্থানের জন্য দুটি ব্যাটালিয়ন সংগঠিত করা হয়।

আমাদের নিজস্ব সংস্থান থেকে আমরা নিচের বিবরণ অনুযায়ী সৈন্যদল সংগঠিত করতে সমর্থ হই: নাগাল্যান্ড থেকে দুই ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডসম্বলিত ৮ মাউন্টেন ডিভিশন, যদিও তাদের কোনো আর্টিলারি ছিল না; ৪র্থ কোর আসাম থেকে তার রিজার্ভ ২৩ মাউন্টেন ডিভিশন পাঠাতে প্রস্তুত এবং ৩৩শ কোর প্রয়োজনে তার ২০ মাউন্টেন ডিভিশন উত্তরবঙ্গে আনতে সক্ষম; মিজো পাহাড় থেকে ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনকেও প্রয়োজনে আমরা আনিয়ে নিতে পারতাম। এই ডিভিশনটিরও অবশ্য পরিপূর্ণ আর্টিলারি ছিল না। প্রয়োজনে ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডও পাওয়া যেত। আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে খোঁজ নিয়ে আমরা জানতে পারি যে, আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের রিজার্ভ ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন, ৪ মাউন্টেন ডিভিশন, ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড গ্রুপ এবং ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেডের একটি ব্যাটালিয়ন গ্রুপ আমরা পেতে পারি। সেনা-বণ্টনের যে পরামর্শ আমরা দিই, তা নিচে বর্ণনা করা হল:

উত্তর-পশ্চিম সেক্টর

বগুড়া দখলের জন্য মেজর জেনারেল লছমন সিং (Lachhman Singh)-এর অধীনে ২০ মাউন্টেন ডিভিশন এবং সেইসাথে ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড গ্রুপ। পরিস্থিতি অনুযায়ী ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর কর্মপরিধির বিস্তৃতি হবে ব্রহ্মপুত্র নদী পর্যন্ত।

পশ্চিম সেক্টর

৯ ইনফ্যান্ট্রি ও ৪ মাউন্টেন ডিভিশনের দায়িত্ব হবে প্রথমে যশোর, মাগুরা ও পরে ফরিদপুর দখল করা এবং, যদি সুযোগ পাওয়া যায়, তাহলে অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন বহর (Inland Waterways Flotilla) ব্যবহার করে ঢাকার দিকে যাওয়া। এই বাহিনীকে পরিচালনার জন্য একটি কোর হেডকোয়ার্টার্স প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর

আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টরের জন্য ২৩ মাউন্টেন ডিভিশন, একটি ব্রিগেড বাদ দিয়ে ৮ মাউন্টেন ডিভিশন এবং ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন বরাদ্দ করা হবে। এই বাহিনী পরিচালনার জন্য হেডকোয়ার্টার্স ৪র্থ কোরকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোর হেডকোয়ার্টার্স আসামে তার চিফ অভ্ স্টাফের অধীনে তাদের অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য ছোট একটা অংশ রেখে যেতে পারে। এই কোরের দায়িত্ব হবে চাঁদপুর ও দাউদকান্দিসহ মেঘনা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করা। এর আগে আমি ইস্টার্ন কম্যান্ডের এফওসি-ইন-সি (FOC-in-C) ভাইস অ্যাডমিরাল কৃষ্ণণ (Krishnan)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মেঘনা নদী অতিক্রম করে সৈন্য পারাপার করার কাজে আমরা তাঁদের ল্যান্ডিং বোটগুলো ব্যবহার করতে পারব কি না। কৃষ্ণণ ও কমোডর দবির (Dabir) জানান যে, স্বল্প গভীরতার কারণে রাশিয়ান ল্যান্ডিং ক্র্যাফ্টগুলো এখানে ব্যবহারের অনুপযোগী। ফলে মেঘনা পার হবার প্রশ্ন আপাতত স্থগিত রেখে বাড়তি হেলিকপ্টার সংগ্রহের দিকে আমরা মনোনিবেশ করি।

উত্তর-পূর্ব সেক্টর

জামালপুর~টাঙ্গাইল~ঢাকা অক্ষরেখা ধরে অগ্রসর হবার জন্য একটি ডিভিশন এবং অতিরিক্ত একটি ব্রিগেড আমরা চেয়েছিলাম। টাঙ্গাইলে নামার কাজে প্যারাশ্যুট ব্যাটালিয়নকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কাজের জন্য যেহেতু আমাদের পৃথক কোনো ডিভিশন নেই, ৬ মাউন্টেন ডিভিশনকে পর্যাপ্ত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাড়তি একটি ব্রিগেড এটার সাথে যোগ করে দেয়ার পরামর্শ আমরা দিয়েছিলাম। প্রতিটি অপারেশনের পরিকল্পনায় মুক্তিবাহিনীর সাহায্য ও সহায়তা ক্রমশ প্রয়োজনীয় অংশ বলে বিবেচিত হচ্ছিল। নিরাপত্তার কারণে হাতে-লেখা এই খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্সের চাহিদা অনুযায়ী আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের অপারেশন নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে তাঁর সাথে আলোচনা হয়।

ফোর্ট উইলিয়ামে ইতোমধ্যে আমি একটি স্টাফ কনফারেন্সের আয়োজন করি এবং আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের অপারেশন নির্দেশিকার অপেক্ষা না করে আমাদের প্রণীত খসড়া পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং রসদ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করতে অর্ডার ইস্যু করি। বিশেষত ত্রিপুরার সড়ক ও রেল যোগাযোগ-ব্যবস্থার দুরবস্থা ও উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাবের কারণে আমাদেরকে আগে কাজ শুরু করতে হয়। আসাম থেকে ত্রিপুরার ধরমনগর (Dharamnagar) পর্যন্ত একটি মিটার গ্যেজ লাইন ছিল, যার দৈনিক ক্ষমতা ছিল ৩০টি ওয়াগন। এই ক্ষমতা আমাদেরকে বাড়াতে হয়। ধরমনগর রেলস্টেশন থেকে আগরতলা পর্যন্ত এবং তা ছাড়িয়ে যে রাস্তা ছিল, সেটার অবস্থাও ছিল খুব করুণ এবং একনাগাড়ে ভারি যানবাহনের ভার বহনের অনুপযোগী। আমরা বর্ডার রোড্স অর্গ্যানাইজেশনকে রাস্তার ধারণক্ষমতা বাড়ানোর ও এই অঞ্চলের অন্যান্য এলাকাও চলাচলের উপযোগী করার জন্য অনুরোধ করি।

প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাব-এরিয়া হেডকোয়ার্টার্স আমরা আসাম থেকে ত্রিপুরায় নিয়ে যাই। তেলিয়ামুরা (Teliamura)-য় দুই ডিভিশন, ধরমনগরে এক ডিভিশন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর (Krishnanagar)-এ দুই ডিভিশন, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে অবস্থিত রায়গঞ্জ (Raiganj)-এ এক ডিভিশন ও মেঘালয়ের তুরা (Tura)-য় এক ডিভিশনের কিছু বেশি সৈন্যের জন্য এক মাসের উপযোগী প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ও রসদ সরবরাহের অর্ডার ইস্যু করা হয়।

স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের এই আগাম কার্যক্রম আমরা শুরু করি আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে অপারেশন অর্ডার ইস্যু এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাত শুরু হবার অল্পদিন আগে। আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের অর্ডার আসা অথবা বর্ষা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকলে যথাসময়ে আমরা আক্রমণ শুরু করতে পারতাম না। প্রশাসনিক অবকাঠামো একবার স্থাপন করার পর তা সরানো হত খুবই কঠিন কাজ। এই ঝুঁকিটা ছিল হিসেব করা। আমি জানতাম, আমাদের পরিকল্পিত অবকাঠামো হেডকোয়ার্টার্সের নির্দেশনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে আমার কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে। ব্রিগেডিয়ার ইন-চার্জ অভ্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্রিগেডিয়ার চজ্জু রাম প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণে আন্তরিকভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। চিফ সিগন্যাল অফিসার কাজ করেছেন টেলিফোন লাইন ও মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগকেন্দ্র স্থাপনের জন্য; আর চিফ এঞ্জিনিয়র সড়ক ও রেল যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য এবং ব্রিজ তৈরির সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা ও এঞ্জিনিয়র স্টোরের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। বাহিনীগুলো, যেমন: অর্ডন্যান্স কোর, আর্মি সার্ভিস কোর ও আর্মি মেডিক্যাল কোর নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও স্থানান্তর শুরু করে দেয়। তেলিয়ামুরায় একটি এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণের কাজও শুরু হয়।

চজ্জু রাম একদিন আমার কাছে কয়েকটি কাগজ নিয়ে হাজির — আর্মি কম্যান্ডারের সই প্রয়োজন। ব্যস্ত থাকায় আমি তাঁকে সরাসরি আর্মি কম্যান্ডারের কাছে যেতে বলি। প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণের অগ্রগতির কথা শুনে অরোরা অপারেশনের যথাযথ নির্দেশ না আসা পর্যন্ত চজ্জু রামকে কাজ স্থগিত রাখতে বলেন। অরোরা যেহেতু ঠিক করেছিলেন যে, আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে অপারেশনের অর্ডার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত, নির্মাণকাজ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁকে রাজি করতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়। মুক্তিবাহিনীকে পরামর্শ দেয়ার কাজে তিনি ব্যস্ত থাকায় এবং ক্রমাগত ট্যুরে থাকায় আমাদের প্রশাসনিক পদক্ষেপ সম্পর্কে তাঁকে এর আগে আমি অবহিত করতে পারিনি। স্যাম মানেকশ' মুক্তিবাহিনীর সংগঠন ও প্রশিক্ষণের ওপরে দৈনিক রিপোর্ট চাইতেন বলে নিয়মিত বাহিনীর জন্য অপারেশনাল এবং রসদ ও সরবরাহের পরিকল্পনার কাজগুলো আমাকেই করতে হত।

৮ মাউন্টেন ডিভিশনের মেজর জেনারেল কৃষ্ণ রাও (Krishna Rao) কলকাতা অতিক্রমের সময় আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা — সৈন্য

সমাবেশের এলাকা ও সময়সীমা — সম্পর্কে তাঁকে আমি ব্রিফ করি। এতে তিনি খুবই আশ্চর্য হন, কারণ অরোরা, যাঁর সাথে তিনি এইমাত্র দেখা করে এলেন, এ সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। সব শুনে তিনি আমার কাছে তাঁর ডিভিশনের ট্রেনিংয়ের জন্য অন্তত দু'মাস সময় চান। কারণ তাঁর ডিভিশন নাগাল্যান্ডে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অপারেশনে তখন আটকে ছিল। আমি সম্মতি দিই। পরবর্তীতে ৮ মাউন্টেন ডিভিশনকে যথাযথভাবে নাগাল্যান্ড থেকে সরিয়ে নেয়া হয় এবং তাদেরকে আসন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ দেয়া হয়। নিজেদের দায়িত্ব পালনে পরবর্তীতে তারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

ইস্টার্ন কম্যান্ডের অধীনে কলকাতায় এবং আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীতে ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ফ্লোটিলা ছিল। কলকাতা ফ্লোটিলার রিভার ল্যান্ডিং ক্র্যাফ্‌ট ছিল। এর মধ্যে কয়েকটা ছিল মাঝারি আকারের ট্যাঙ্ক বহনের উপযোগী। ভাইস অ্যাডমিরাল কৃষ্ণণ তাঁর ল্যান্ডিং ক্র্যাফ্‌ট মেঘনায় ব্যবহার করতে অপারগতা প্রকাশ করায় আমি ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ফ্লোটিলার অফিসার কম্যান্ডিংকে তাঁর বহর নিয়ে মেঘনায় যাবার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখতে বলি। প্রথমে তিনি সমুদ্রপথে সুন্দরবনের পাশ দিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্র্যাফ্‌টের যথেষ্ট বড় ফ্রি বোর্ড না থাকায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপরে আমি তাঁকে ফারাক্কা থেকে গঙ্গা ধরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ হয়ে ফরিদপুরে যাবার প্রস্তুতি নিতে বলি, যাতে ঢাকা আক্রমণের জন্য সৈন্যদল পারাপারে এই বহর কাজে লাগে। প্রতিবারে একটি করে ব্রিগেড পারাপারের প্রয়োজন আমাদের ছিল। আরো ক্র্যাফ্‌ট ভাড়া করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিই। কলকাতা আর পাটনা থেকে বাড়তি ক্র্যাফ্‌টগুলো ভাড়া করা হয়। ফারাক্কা যাবার জন্য হুগলি (Hoogly) নদীর গভীরতার উল্লেখ করে তিনি জুন-জুলাই মাসে রওয়ানা দেবার পরামর্শ দেন; কারণ বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলে হয়ত নদী তার পর্যাপ্ত গভীরতা হারাবে। আমি তাঁকে জুন মাসে রওয়ানা দেবার পরিকল্পনা করতে বলি এবং যথারীতি তিনি তা পালন করেন। ব্রহ্মপুত্রের ফ্লোটিলাকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সীমান্তবর্তী ধুবড়ি (Dubri)-তে নিয়ে যাবার অর্ডার দেয়া হয়।

অগাস্টের শুরুর দিকে জেনারেল মানেকশ' ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্‌স মেজর জেনারেল কে কে সিং (K K Singh)-কে সাথে নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামে আসেন আমাদের কাছে কয়েকদিন আগে পাঠানো খসড়া অপারেশন নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করতে। আমাদের পাঠানো পরামর্শের অনেককিছু — যেমন: সেক্টরগুলো কেমন হবে, ক্ষেত্রবিশেষে সেনাবিন্যাস, ইত্যাদি—এই খসড়ায় সন্নিবেশিত হলেও মৌলিক কলাকৌশল ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা এতে নেই। আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের অপারেশন নির্দেশিকায় খুলনা ও চট্টগ্রামকে প্রধান লক্ষ্যস্থল হিসেবে রেখে যত বেশি সম্ভব এলাকা দখলের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঢাকার উল্লেখ পর্যন্ত সেখানে নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে, এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করা।

অপারেশন রুমে অনুষ্ঠিত সভায় মানেকশ', কে কে সিং, অরোরা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। স্যাম মানেকশ' তাঁর ডিএমও-কে কথা বলতে দেন। কে কে সিং তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী খুলনা ও চট্টগ্রাম হল এন্ট্রি পোর্ট এবং এগুলো দখল করতে পারলেই যুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটবে। শুধু তাই নয়, খুলনাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের আক্রমণের মূল ধাক্কা (weight) খুলনার দিকেই চালিত হওয়া উচিত বলে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেন। হার্ডিঞ্জ ব্রিজও দখল করতে হবে। মানেকশ' ও অরোরা সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। আমি প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করলাম যে, যুদ্ধে আমাদের উচিত আমাদের নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বকে কাজে লাগানো এবং বঙ্গোপসাগরে কার্যকর অবরোধ সৃষ্টি করা। এছাড়া খুলনা নিতান্তই ছোট একটি বন্দর; এর আসল পোতাশ্রয় কয়েক মাইল ভাটিতে মংলা/চালনায় অবস্থিত। ওখান থেকে ছোট ছোট জলযানে করে মালের খালাস খুলনায় পৌঁছায়। আমাদের সীমান্ত ও খুলনার মধ্যে জোয়ারভাটা খেলে এমন বেশ কয়েকটি নদী আছে, যেগুলোতে ব্রিজ নেই। এই ধরনের এলাকায় গতিবিধি বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। কারণ এগুলো আবার বেশ কয়েকটি খাল দিয়ে বিভক্ত, খালগুলোও ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। আর চট্টগ্রাম তো বাংলাদেশের মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক পূর্বদিকে অবস্থিত। এর অবস্থান প্রায় বিচ্ছিন্নই বলা চলে।

পূর্ব পাকিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র যে ঢাকা, সে ব্যাপারে আমি আমার বক্তব্যে অটল থাকলাম। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ঢাকা দখলের বিকল্প নেই। এই পর্যায়ে জেনারেল মানেকশ' বাধা দিলেন। বললেন, "সুইটি (এই শব্দটি তিনি ব্যবহার করতেন কাউকে তিরস্কারের আগে), আমরা খুলনা ও চট্টগ্রামের দখল নিলে এমনিতেই যে ঢাকার পতন ঘটবে, এই সহজ বিষয়টি কি আপনার নজরে আসছে না?" আমি বললাম, "না, সেরকম কিছু আমার নজরে আসছে না।" আরো বললাম, "আমাদের সমস্ত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হওয়া উচিত ঢাকা।" ডিএমও-র সাথে আমার আরো কিছু বাদানুবাদ হল। মানেকশ' ও সিং — দুজনেই বলে চললেন যে, ঢাকার তেমন গুরুত্ব নেই এবং ঢাকা দখলের জন্য কোনো বাহিনী বরাদ্দ করা হবে না। মানেকশ' এরপরে অরোরার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, "জগজিৎ, আপনার কী ধারণা? আমরা খুলনা ও চট্টগ্রাম দখল করলেই যে ঢাকার পতন হবে, আপনার কি এটা মনে হয় না?" অরোরা উত্তর দিলেন, "জি স্যার, আমি আপনার সাথে একমত।" ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এটাই ছিল অরোরার দৃষ্টিভঙ্গি। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ আমি কী শুনছি! পরে অবশ্য স্যাম মানেকশ' একটিমাত্র ছাড় দিতে সম্মত হলেন। সেটি হল এই যে, 'খুলনা আমাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হবে' এই কথাটি থেকে 'প্রধান' শব্দটি তিনি বাদ দেবেন। এরপরে মিটিং শেষ হল।

পরিকল্পনার সময় ও অপারেশন চলাকালীন মুক্তিবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে অরোরাকে পাশ কাটিয়ে মানেকশ' সরাসরি চিফ অভ্ স্টাফের সাথে আলোচনা করতেন।

আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের অপারেশন নির্দেশিকার ভিত্তিতে তৈরি খসড়া পরিকল্পনা বিভিন্ন স্থাপনায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং তারা এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখে। এরপরে শুরু হয় বিস্তারিত পরিকল্পনা। এই পর্যায়ে আমরা ওয়ার গেম (war game) অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিই। আর্মি কম্যান্ডার ও আমি ৩৩শ কোরের অনুষ্ঠানে এবং তৈরি হবার পর ২য় কোরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি। ৪র্থ কোরের ওয়ার গেমে দুর্ভাগ্যবশত আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। কারণ এটা করতে গেলে কম পক্ষে দুই-তিনদিন কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্স থেকে আমাকে অনুপস্থিত থাকতে হত। ৪র্থ কোরের হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছানোর জন্য প্রায় পুরো পূর্ব পাকিস্তান ঘুরে যেতে হত।

৩৩শ কোরের ওয়ার গেমে হিলি~গাইবান্ধা পথে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা বাতিলের কারণে রংপুর ও দিনাজপুর দখলের মূল পরিকল্পনাও বাতিল করা হয়। আমাদের স্ট্র্যাটেজি ছিল শত্রুসেনাকে পাশ কাটিয়ে চূড়ান্ত লক্ষ্য বগুড়ায় আঘাত হানা। সার্ভে অভ্ ইন্ডিয়ার করা পাকিস্তানি ম্যাপের প্রতিলিপি আমার কাছে ছিল। এই ম্যাপে বগুড়ার দক্ষিণে যাওয়ার জন্য ফুলবাড়ি~নবাবগঞ্জ~পীরগঞ্জ অক্ষরেখায় কাঁচা রাস্তার নিশানা ছিল। এই অক্ষরেখা ধরে গেলে হিলি~গাইবান্ধা প্রবেশপথের শক্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা এড়ানো সম্ভব। এটা নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়। কোর কম্যান্ডার লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল এম এল থাপান (M L Thapan) সাগ্রহে আমার মত গ্রহণ করলেও অরোরা তখন পর্যন্ত রংপুর দখলের পক্ষে ছিলেন। ইস্টার্ন কম্যান্ডে আসার আগে তিনি ছিলেন ৩৩শ কোরের নেতৃত্বে এবং তাঁর মতে রংপুরই ছিল প্রধান লক্ষ্যস্থল। থাপান হিলি দখলেরও বিরোধিতা করেন, কারণ এর প্রবেশপথে মজবুত কংক্রিট বাংকার নির্মাণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রাথমিক অপারেশন শুরু হলে তিনি আমাদের ও মুক্তিবাহিনীর হিলি আক্রমণের বিরোধিতা করেন। কিন্তু অরোরা তাঁর কথা উড়িয়ে দেন, কারণ মানেকশ' এই এলাকা দখলের ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন।

২য় কোরের ওয়ার গেমে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। দর্শনা~কোটচাঁদপুর~ঝিনাইদহ্ আক্রমণরেখার সাথে যাতে মিলিত হতে পারে, সেই লক্ষ্যে ৪ মাউন্টেন ডিভিশনের আক্রমণরেখা হিসেবে আমরা নির্বাচন করেছিলাম শিকারপুর~কুষ্টিয়া~ ঝিনাইদহ্। এর ফলে হেডকোয়ার্টার-নির্দেশিত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দখল করার সুযোগ পাওয়া যেত। ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জন্য আক্রমণরেখা হিসেবে আমরা নির্বাচন করি বয়রা~যশোর অক্ষরেখা। এই ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল দলবীর সিং (Dalbir Singh) বনগাঁ~যশোর প্রধান সড়ক ধরে অগ্রসর হবার পক্ষপাতী। কোর কম্যান্ডার লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল 'ট্যাপি' রায়না ('Tappy' Raina) উত্তরদিক থেকে আক্রমণের বিরোধিতা করেন, কারণ অস্থায়ী দুর্গ নিয়ে তাঁর আশঙ্কা ছিল। তিনি চাইছিলেন, ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের কাছাকাছি কোনো রুট ধরে ৪ মাউন্টেন ডিভিশন অগ্রসর হোক। আমার কাছে বিষয়টি সবসময়ই অবাক লেগেছে যে, কোরগুলো যেসব প্রাথমিক অপারেশন মুক্তিবাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে করেছে, তাতে তারা আশ্চর্যজনকভাবে প্রস্তাবিত শিকারপুর~ঝিনাইদহ্ অঞ্চলে ছাড় দিয়ে তারা সীমান্ত-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। নাগা

রেজিমেন্টের নায়েক যোশী (Naik Joshi) ও আরো তিনজন শিকারপুরে ধরা পড়ে এবং বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে ঢাকায় তাদেরকে প্যারেড করানো হয়। বয়রাতে ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনও এরকম একটি অপারেশন করেছিল, যেটার বিস্তর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এটা নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, রায়নার মত অনুযায়ী ২য় কোরের ৪ ও ৯ ডিভিশন যাতে পরস্পরের কাছাকাছি থেকে অগ্রসর হতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতেই অপারেশনগুলো পরিচালনা করা হয়েছে।

৪র্থ কোরের ওয়ার গেমে আমি উপস্থিত থাকতে না পারলেও কুমিল্লা, ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট ও গুরুত্বপূর্ণ লালমাই পাহাড় দখলের লক্ষ্যে লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল সগত সিং (Sagat Singh)-এর পরিকল্পনা নিয়ে আর্মি কম্যান্ডারের সাথে আমি আলোচনা করেছি। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা যে জোরদার করার আয়োজন চলছে, সেটা বোঝা গেছে বিমান থেকে তোলা ছবি দেখে। বেলোনিয়া এলাকায় ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের অপারেশন ও সড়ক যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আমাদের ধারণা হয় যে, ২৩ মাউন্টেন ডিভিশন এখন চৌদ্দগ্রাম~লাকসাম~চাঁদপুর রুট ধরে অগ্রসর হবার মতো সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এর পরে সর্বসম্মতভাবে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তা হল, ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের একটি ব্রিগেড অধিকৃত কুমিল্লার দখল বজায় রাখবে এবং তারপর একটি ব্রিগেড কম নিয়ে ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন দক্ষিণে দাউদকান্দির দিকে অগ্রসর হবে।

মেজর জেনারেল কৃষ্ণ রাও (Krishna Rao)-এর অধীনস্থ দুই ব্রিগেডসম্পন্ন ৮ মাউন্টেন ডিভিশন শমশেরনগর ও মৌলভিবাজার দখল করবে এবং তারপর সিলেটের দখল বজায় রাখবে এর একটি ব্রিগেড। এই ডিভিশনের অন্য ব্রিগেডটি কোরের রিজার্ভ হিসেবে সংগঠিত করা হবে।

১০১ কমিউনিকেশন জোনে তখন পর্যন্ত ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড ছাড়া অন্য কোনো সেনাদল বরাদ্দ না করায় কোনো ওয়ার গেম অনুষ্ঠিত হয়নি। এর জিওসি-কে অবশ্য আমি বিস্তারিত ব্রিফিং দিয়েছি। পরিকল্পনার অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো ইতোমধ্যেই নির্দেশিত হয়েছে। জিওসি খুবই উদ্যমী লোক এবং তাঁর ধারণা, তিনি দশ দিনেরও কম সময়ে ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে যেতে পারবেন।

ইতিহাসে এখন পর্যন্ত যত সামরিক অভিযান সংঘটিত হয়েছে, তার সবগুলোই সংশ্লিষ্ট কম্যান্ডারদের ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক অনুযায়ী রূপ পরিগ্রহ করেছে। সিনিয়র অফিসারদের সাথে মানেকশ'র আচরণ তাঁদের আস্থা উৎপাদনে সহায়ক নয়। এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে ইস্টার্ন কম্যান্ডের অপারেশন্‌স রুমে সেনাস্থাপনাসমূহের মেজর জেনারেল অথবা তার ওপরের র‍্যাঙ্কের কম্যান্ডারদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি সমস্ত স্থাপনাকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাঁদের কাজের ব্যাপারে অসন্তোষ চেপে রাখার কোনো চেষ্টাও তিনি করেননি। তাঁর আচরণে মনে হচ্ছিল, যেন কোনো হেডমাস্টার তাঁর বয়স্ক ছাত্রদের বকাঝকা করছেন। তাঁর সমালোচনার সিংহভাগই ছিল অন্যায্য ও

অযৌক্তিক। কারণ দিল্লী থেকে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে মানেকশ' সামান্যই ধারণা লাভ করতে পেরেছিলেন। উপস্থিত কম্যান্ডাররা মানেকশ'র সাথে ডি পি ধর (D P Dhar)-এর উপস্থিতি ভাল চোখে দেখেননি। কারণ ধর ছিলেন বাংলাদেশ-বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও তাঁর ঘনিষ্ঠ। কম্যান্ডাররা চাইছিলেন, অরোরা তাঁদের পক্ষে কথা বলবেন। কিন্তু অরোরা তখন মানেকশ'র অভিযোগের উত্তরে ক্ষমা চাইতে ব্যস্ত। আমি কথা বলার চেষ্টা করতেই মানেকশ' আমাকে থামিয়ে দিয়ে অরোরাকে কথা বলতে বললেন। যাঁর সম্পর্কে মানেকশ'র এত উঁচু ধারণা, সেই অরোরা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ রইলেন। ভর্ৎসনা অব্যাহত রইল। এই 'তেজস্বী' বক্তৃতার ফল হল বিপরীত। কম্যান্ডাররা এটা একেবারেই পছন্দ করেননি। কারণ, সাফল্য লাভের সর্বোত্তম চেষ্টাটাই তাঁরা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রত্যাশা অনুযায়ী সমর্থন না পাওয়ায় কয়েকজন কম্যান্ডারের সাথে আর্মি কম্যান্ডারের সম্পর্ক পুরোপুরি আন্তরিকতাশূন্য হয়ে পড়ে। আনুগত্য আসলে একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া।

থাপান ও অরোরার মধ্যেও বিরোধ তৈরি হয় এবং তাঁদের সম্পর্ক প্রায় বিস্ফোরণের কাছাকাছি চলে যায়। শুধু ব্যক্তি হিসেবেই থাপান দৃঢ়চিত্ত ছিলেন না, তিনি ছিলেন দক্ষ একজন কম্যান্ডার, যিনি তাঁর পেশাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে, যখন একটি কোরে অরোরার নামে একটি সিনেমা হাউসের নামকরণ করা হয়। সে যুগে কর্মরত কোনো অফিসারের নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের নামকরণের রেওয়াজ ছিল না। থাপানের এই পদক্ষেপকে অরোরা ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে গ্রহণ করেন। সগত সিংয়ের সাথে অরোরার সম্পর্ক প্রথম দিকে খুব ঘনিষ্ঠ থাকলেও যখন থেকে সগত লক্ষ করলেন যে, মানেকশ'র আক্রমণাত্মক সমালোচনা থেকে অরোরা তাঁকে রক্ষা করছেন না বা তাঁকে সমর্থন করছেন না, তখন থেকেই তাঁদের সম্পর্কও শীতল হয়ে যায়। রায়নার সাথে অরোরার সম্পর্ক ভালই ছিল। কিন্তু জি এস গিল (G S Gill)-এর ঘটনায় অরোরা মানেকশ'র পক্ষ অবলম্বন করলে এই দক্ষ অফিসারের সাথেও তাঁর সম্পর্ক একেবারে শীতল হয়ে যায়।

কোর কম্যান্ডারদের সাথে তাঁদের ডিভিশনাল কম্যান্ডারদের সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক ছিল। ২য় কোরে অবশ্য মেজর জেনারেল দলবীর সিং (Dalbir Singh)-এর ওপরে লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল রায়নার সামান্যই নিয়ন্ত্রণ ছিল। রায়নাকে দলবীর থোড়াই পরোয়া করতেন। ২য় কোরের অপারেশনে এর বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের মেজর জেনারেল বি এফ গনজালভেস (B F Gonsalves) ও ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের আর ডি হিরা (R D Hira)-র সাথেও সগত সিংয়ের সমস্যা ছিল।

পুরোদস্তুর যুদ্ধের প্রস্তুতি

আমাদের সীমান্তবর্তী এলাকার ঘাঁটিগুলোতে পাকিস্তানি গোলাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য নভেম্বরে আমাদের সৈন্যদেরকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের দশ মাইল ভিতর পর্যন্ত নিয়ে

যাবার অনুমতি পাই। এই নির্দেশপ্রাপ্তির সুযোগ কাজে লাগিয়ে সুবিধামতো আক্রমণ রচনার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকা আমরা দখল করি। প্রাথমিকভাবে আমাদের সৈন্যদলগুলোকে পরিস্থিতি অনুযায়ী ছড়িয়ে পড়ে নিচের কাজগুলো করার নির্দেশ আমরা দিই।

২য় কোর: আফরায় শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে অবরুদ্ধ করা এবং মোহাম্মদপুর দখল করা। খালিশপুর ব্রিজ ও উথলী দখল করা। বয়রা ও শিকারপুরের জন্য কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্স থেকে কোনো নির্দিষ্ট কাজের ভার আরোপ করা হয়নি।

৩৩শ কোর: পঞ্চগড় শত্রুমুক্ত করে, যতটা পারা যায়, দক্ষিণে ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া। হিলি দখল করা।

১০১ কমিউনিকেশন জোন এরিয়া: জৈন্তিয়াপুর দখল করা। কমলপুর দখল করা এবং বক্‌শীগঞ্জের দিকে অগ্রসর হওয়া। টাঙ্গাইলে মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ডকে সহায়তা দান করে ময়মনসিংহ, হালুয়াঘাট, শ্যামগঞ্জ ও দুর্গাপুরের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা।

৪র্থ কোর: গঙ্গাসাগর দখল করা এবং সৈয়দপুর পর্যন্ত শত্রুমুক্ত করা। দেবীগ্রামে একটি ব্যাটালিয়ন ব্লক স্থাপন করা। আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা। নারায়ণপুর এলাকায় পাকিস্তানি সীমান্তরক্ষা-ঘাঁটিগুলো নিশ্চিহ্ন করা। রাজপুর দখল করা এবং আখাউড়ায় আঘাত হানার উপক্রম করা। শমশেরনগর ও কুলাউড়া দখল করা। ফেনী বিচ্ছিন্ন করা।

যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন আমাদের যে অবস্থা ছিল, নিচে তা বর্ণনা করা হল।

পশ্চিম সেকটর

২৯ নভেম্বরের আগেই চুয়াডাঙ্গা আমাদের নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এজন্য মুক্তিবাহিনীকে ধন্যবাদ। ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন চুয়াডাঙ্গা~যশোর অক্ষরেখায় যশোর ও সীমান্তের মধ্যবর্তী আড়পাড়ায় পৌঁছে যায়। বয়রাতে ভৈরব নদীর ওপরে একটি ব্রিজ তৈরি করা হয় এবং বয়রা থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত রাস্তার সংযোগ দেয়া হয়। ২৪ নভেম্বর মিসেস গান্ধী বয়রা সেক্‌টরে তিনটি পাকিস্তানি স্যাব্‌র জেট গুলি করে ভূপাতিত করার কথা পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন। এই ইন্টারসেপশন ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আমাদের স্থাপনার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪ মাউন্টেন ডিভিশন জীবননগর, উথলী ও দর্শনা দখল করে জীবননগর~কোটচাঁদপুর অক্ষরেখা ধরে খালিশপুরের দিকে অগ্রসর হয় এবং দর্শনা~কোটচাঁদপুর অক্ষরেখার সিলিন্দা পর্যন্ত পৌঁছায়।

উত্তর-পশ্চিম সেক্‌টর

হিলির অংশবিশেষ, যেমন: নাওয়ারা, মোনাপাড়া ও বাসুদেবপুর অধিকৃত হলেও হিলিতে পাকিস্তানিরা তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। দিনাজপুর এলাকার খানপুর ও

মুকুনালপুর দখল করা হয়। সমজা~ফুলবাড়ি অক্ষরেখায় ইছামতি নদীর দুইকূলই শত্রুমুক্ত করা হয়।

মোরগড়~দিনাজপুর অক্ষরেখা ধরে অগ্রসরমান ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেড ঠাকুরগাঁও দখল করে।

বড়খাতা দখল করা হয়। নাগেশ্বর অঞ্চলে ধরলা নদীর উত্তরপারের সম্পূর্ণ এলাকা শত্রুমুক্ত করা হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর

করিমগঞ্জ এলাকায় চারগাম~করিমগঞ্জ অক্ষরেখার গুরুত্বপূর্ণ পূর্ব অংশ মুক্ত করা হয়।

কুলাউড়া এলাকার গাজীপুর দখল এবং কুলাউড়া অবরোধ করা হয়।

আখাউড়া এলাকায় গঙ্গাসাগর দখল করা হয়। আখাউড়ার পশ্চিমে একটি ব্লক স্থাপন করা হয়। আরো দক্ষিণে সম্পূর্ণ বেলোনিয়া অঞ্চল মুক্ত করা হয়।

প্রাথমিক অপারেশনগুলোর সময়ে যখনই আমরা আক্রমণ করেছি, পাকিস্তানিরা তাদের পরিকল্পিতভাবে তৈরি প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে অত্যন্ত সাহসের সাথে নাছোড়বান্দার মতো লড়াই করেছে। ২৩ নভেম্বরে অরোরার মাধ্যমে দেয়া মানেকশ'র নির্দেশ অনুযায়ী হিলি আক্রমণে আমাদের পক্ষের ৬৭ জন সৈন্য নিহত ও ৯০ জন আহত হয়। শেষ পর্যন্ত ১১ ডিসেম্বর হিলি মুক্ত হয়। উত্তর-পূর্ব সেক্টরে ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড দুই বার আক্রমণ করেও কমলাপুর দখল করতে পারেনি। রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পণ করে। তেলিয়াখালি ফাঁড়ি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে ২৩ জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হওয়ার বিনিময়ে। দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টরে খালাই পোস্টে, যেখানে প্রথমে মাত্র এক প্লাটুন পাকিস্তানি ছিল (পরে শক্তি আরো বাড়িয়ে এটাকে দুই কোম্পানিতে পরিণত করা হয়), সেখানে আমাদের আক্রমণ দুইবার প্রতিহত করা হয়। শেষ পর্যন্ত পুরো একটি ব্রিগেড দিয়ে এটা দখল করা হয়। ২০ নভেম্বর ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন বয়রাতে একটি প্রাথমিক অপারেশন চালায়। পাকিস্তান এয়ার ফোর্স অবিলম্বে প্রতিরোধে যোগ দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটি বিমান তারা হারায়। ট্যাঙ্ক আমাদের ইনফ্যান্ট্রিকে সহযোগিতা করে। আমি বাহিনী পরিদর্শনে যাই এবং বিনোকিউলার দিয়ে দেখতে পাই যে, একজন অফিসার, সম্ভবত নিয়াজি, তার জিপে বসে এক স্কোয়াড্রন শ্যাফী ট্যাঙ্ক লাইন-আপ করছে। এরপর আর্ল অভ্ কার্ডিগান'স লাইট ব্রিগেড (Earl of Cardigan's Light Brigade)-এর অনুকরণে স্কোয়াড্রনটি খোলা মাঠে আমাদের সমবেত করা ট্যাঙ্ক ও রিকয়েললেস গানফায়ারের ওপরে চার্জ করে। বয়রার এই লড়াইয়ে পাকিস্তানিরা ১৪টি ট্যাঙ্ক, ৩টি এয়ারক্র্যাফ্ট ও প্রচুর পরিমাণ সৈন্য হারায়।

প্রাথমিক এই অপরেশনগুলো পাকিস্তানিদের শক্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যাবার লক্ষ্যে ইস্টার্ন কম্যান্ডের প্রস্তাবিত কৌশলগত ধারণাকেই সমর্থন করে। কারণ এটা ছাড়া সময় ও অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন পড়ে অনেক বেশি।

পাকিস্তানিরা তাদের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং তাদেরকে সীমান্ত অঞ্চলের দিকে টেনে আনার লক্ষ্যে আমাদের কৌশল কাজ করতে শুরু করে। আমরা নিরাপদ কয়েকটি জাম্পিং অফ্ পয়েন্টে, বিশেষত যেসব জায়গায় কোনো না কোনো বাধা অতিক্রম করতে হয়, সেসব জায়গায় আমাদের অবস্থান নিশ্চিত করি। এই অপারেশনগুলো আমাদের সৈন্যদলগুলোকে প্রকৃত যুদ্ধের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

পাকিস্তানি সেনাবিন্যাসের উদ্দেশ্য ছিল অধিকৃত অঞ্চল রক্ষা করা এবং সেই সাথে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ প্রতিহত করা। যশোর, ঝিনাইদহ্, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ভৈরব বাজার, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের প্রতিরক্ষায় নিয়াজি অধিকতর মনোনিবেশ করেন এবং এই শহরগুলোকে তিনি নগরদুর্গ বানানোর নির্দেশ দেন। গুরুত্বপূর্ণ অন্য শহরগুলোতেও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আমরা এই কৌশল অনুমান করি এবং সেই সাথে এটাও বুঝতে পারি যে, এই শহরগুলোর মূল প্রবেশপথে কড়া পাহারা থাকবে। নিয়াজির যে স্ট্র্যাটেজিটি আমরা সঠিকভাবে অনুমান করেছি, সেটা হল, সীমান্ত অঞ্চলে নিয়োজিত সৈন্যরা তাদেরকে প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত লড়াই করবে এবং আমাদের অগ্রগমন বিলম্বিত করবে। তারপরে তারা নগরদুর্গে ঢুকে পড়ার পর শেষ পর্যন্ত সেটাকে রক্ষা করবে। এই স্ট্র্যাটেজিতে আমাদেরই বরং সুবিধা হয়। এর ফলে বিকল্প পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ থাকে।

ফোর্ট উইলিয়ামে আলোচনার ভিত্তিতে প্রণীত আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের অপারেশন নির্দেশিকা ১৬ অগাস্ট ইস্যু করা হয়। এই নির্দেশিকার ভিত্তিতে সাময়িক উদ্দেশ্যে ও আক্রমণের লক্ষ্যে বাড়তি সেনা পরিচালনা ও বিন্যাস করা হয়। ওয়ার গেমের ভিত্তিতে গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে জানানো হয়।

উত্তর-পশ্চিম সেক্টর

মেজর জেনারেল লছমন সিংয়ের অধীনে ২০ মাউন্টেন ডিভিশন ও ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড গ্রুপের কম্যান্ডের মূল দায়িত্ব ছিল হিলি~গাইবান্ধা অক্ষরেখা নিরাপদ রাখা এবং পরবর্তীতে বগুড়া দখল করা। এই অভিযানের সীমা ছিল ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত। অক্টোবর/নভেম্বরে একটি পাকিস্তানি ম্যাপ আমেরা হাতে পাবার পর আমাদের প্রধান আক্রমণরেখা পরিবর্তিত হয়। তাতে আমরা দেখতে পাই যে, পীরগঞ্জে যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তা আছে। পরে যে আক্রমণরেখা নির্দিষ্ট করা হয়, সেটা আরো পূর্বদিকে ফুলবাড়ি, নবাবগঞ্জ ও পীরগঞ্জ হয়ে পরে দক্ষিণে গোবিন্দগঞ্জ ও বগুড়ার দিকে চলে গেছে। এভাবে হিলি~গাইবান্ধা অক্ষরেখার মূল প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে পাশ কাটানো হবে। পরে মেইন্টেন্যান্সের জন্য পথ খুলে দেয়া হবে। ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডের ওপরে দায়িত্ব ছিল উত্তরদিক থেকে ঠাকুরগাঁও দখল করা এবং দিনাজপুর ও সৈয়দপুরের ওপরে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া। দিনাজপুরের দখল বজায় রাখবে আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। ভুটানের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মেজর জেনারেল রেড্ডি

(Reddy)-র অধীনে ৬ মাউন্টেন ডিভিশনের অংশগুলোর দায়িত্ব ছিল তিস্তার উত্তরের এলাকা দখল করে রংপুরের ওপরে আক্রমণের ভান করা এবং আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সময়ে ভুটান যাবার জন্য তৈরি থাকা। আসামের ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ফ্লোটিলা ২০ ডিভিশনকে এবং প্রয়োজনে জামালপুর~টাঙ্গাইল অক্ষরেখা ধরে ঢাকাগামী সৈন্যদেরকে সাহায্য করার জন্য সীমান্তবর্তী ধুবড়িতে নিয়ে আসা হয়।

পশ্চিম সেক্টর

১৯৭১-এর ৩১ অক্টোবর আর্মি হেডকোয়ার্টার্স তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ২য় কোর হেডকোয়ার্টার্স গঠন অনুমোদন করে। এর অর্থ, এই কোরের স্বল্প সংখ্যক যানবাহন থাকায় একবার কোথাও ফরমেশন তৈরি করলে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হওয়া তাদের জন্য কঠিন ছিল। নভেম্বরে লোকজন এসে পৌঁছাতে শুরু করে। হেডকোয়ার্টার্স পরিপূর্ণভাবে স্থাপিত হবার আগে পর্যন্ত এর যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও অবকাঠামো স্থাপনের ব্যবস্থা করে ইস্টার্ন কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্স। লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল টি এন রায়নার কম্যান্ডের অধীনে ২য় কোরকে মেজর জেনারেল দলবীর সিংয়ের অধীনস্থ ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল বারার (Barar)-এর অধীনস্থ ৪ মাউন্টেন ডিভিশন বরাদ্দ করা হয়। যশোর দখল করে মাগুরা দখল করার ব্যাপারে ৪ মাউন্টেন ডিভিশনকে ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সাহায্য করার কথা। এর একটি ব্রিগেড পরে খুলনা দখল করবে বলে স্থির করা হয়। ৪ মাউন্টেন ডিভিশনের ওপরে ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর ও গোয়ালন্দঘাট দখল করার দায়িত্ব ছিল। এর একটি ক্ষুদ্র বাহিনী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ মুক্ত করবে বলে পরিকল্পনা করা হয়। ২য় কোরের অংশগুলো যাতে গোয়ালন্দঘাট দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করতে পারে, সেজন্য আকস্মিক পরিকল্পনা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে জুন-জুলাই মাসে আমাদের ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ফ্লোটিলা কলকাতা থেকে ফারাক্কায় আনা হয়, যাতে প্রয়োজনমতো ফরিদপুর ও পরবর্তীতে ঢাকায় এগুলো ব্যবহার করা যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর

লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল সগত সিংয়ের অধীনস্থ ৪র্থ কোরের অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনটি ডিভিশন। এর মধ্যে ছিল মেজর জেনারেল কৃষ্ণ রাওয়ের অধীনস্থ এক-ব্রিগেড-কম ৮ মাউন্টেন ডিভিশন, মেজর জেনারেল আর ডি হিরার অধীনে ২৩ মাউন্টেন ডিভিশন এবং মেজর জেনারেল বি এফ গনজালভেসের অধীনস্থ ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন। ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের দায়িত্ব ছিল, তাদের একটি অংশ কুমিল্লার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে এবং বাকি অংশ দাউদকান্দির দিকে অগ্রসর হবে। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত সংবাদ থেকে জানা গেল যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জের দিকের রাস্তাঘাট তেমন সুবিধাজনক নয়। এছাড়াও মেঘনা নদীর ওপরের করোনেশন ব্রিজের পাহারায় নিয়োজিত ছিল পুরো একটি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৩ মাউন্টেন ডিভিশন কুমিল্লাকে পাশ কাটিয়ে চাঁদপুরের দিকে অগ্রসর হবে। দুই ব্রিগেডবিশিষ্ট ৮ মাউন্টেন ডিভিশনের একটি ডিভিশন শমশেরনগর-মৌলভিবাজার শত্রুমুক্ত করবে এবং সিলেটকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে — সম্ভব হলে দখল করবে। অন্য ব্রিগেডটি কোর রিজার্ভ হিসেবে শুধু কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সের অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করা যাবে। শিলংয়ের ১০১ কমিউনিকেশন জোন এরিয়াতে একটি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন ছিল। ৮ মাউন্টেন ডিভিশনের সিলেট অভিযানের সময় পাকিস্তানদের জন্য বাড়তি এক হুমকি হিসেবে এই ব্যাটালিয়ন উত্তরের দাউকি (Dauki) থেকে সহায়তা করবে। ৪র্থ কোরও ঢাকার ওপরে একটি প্রচ্ছন্ন হুমকি সৃষ্টি করে রাখবে। এই কারণে ১৪টি এমআই৪ (Mi4) হেলিকপ্টারের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বহর তাদেরকে দেয়া হয়। অপারেশনের আগেই প্রশিক্ষণের জন্য এই হেলিকপ্টারগুলো তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমাদেরকেও দুই স্কোয়াড্রন এমআই৮ (Mi8) হেলিকপ্টার বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এগুলো মেঘনা নদী পেরিয়ে ৪র্থ কোরের আক্রমণের জন্য বরাদ্দ করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত এই হেলিকপ্টারগুলো আদৌ আমাদের হাতে আসেনি। এগুলো হাতে থাকলে ৪র্থ কোর অনেক কার্যকরভাবে মেঘনা অতিক্রম করতে পারত।

উত্তর-পূর্ব সেক্টর

ঢাকা দখলের বিষয়টিকে আর্মি হেডকোয়ার্টার্স কখনোই তেমন গুরুত্ব দেয়নি বলে ঢাকার জন্য কোনো সৈন্য বরাদ্দ করেনি বা সেটাকে কোনো ধরনের লক্ষ্য হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়নি। ঢাকা দখলের জন্য ৬ মাউন্টেন ডিভিশন বরাদ্দ করার জন্য মানেকশ'র কাছে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও কোনো কাজ হয়নি। সৈন্যদলসমূহ ও সেগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী হেডকোয়ার্টার্সের সংস্থান আমাদেরকেই করে নিতে হয়। হেডকোয়ার্টার্স ২ মাউন্টেন ডিভিশনকে পূর্ব আসাম থেকে এনে আমরা ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করি। এখানেও আমাদেরকে নিরস্ত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে মেধাবী অফিসার মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং গিল (Gurbax Singh Gill)-এর অধীনস্থ ১০১ কমিউনিকেশন্স জোনের দ্বারস্থ হতে হয়। আমরা ঢাকা দখল নিয়ে আলোচনা করি এবং গুরবক্স গিল এই কাজের জন্য কমপক্ষে একটি ডিভিশন প্রয়োজন বলে জানান। ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডকে আমরা পর্যাপ্ত আর্টিলারি সাপোর্ট দিয়ে চার ব্যাটালিয়নের একটি ব্রিগেড গ্রুপে পরিণত করি। ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেডের একটি ব্যাটালিয়ন গ্রুপকে আমরা টাঙ্গাইলে বিমান থেকে নামানোর সিদ্ধান্ত নিই। ঢাকাগামী রাস্তার ওপরের এই এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ করছিল বাঘা সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ২০,০০০ মুক্তিযোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী। ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং (Sant Singh)-এর নেতৃত্বে বিহার রেজিমেন্টের একটি ব্যাটালিয়নও আমাদের হাতে ছিল। আরো দুই ব্রিগেড সৈন্য আমাদের প্রয়োজন ছিল। লড়াই শুরুর অব্যবহিত আগে হিমালয় অঞ্চল থেকে এই ব্রিগেড দুটিকে আমরা নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। শেষ পর্যন্ত আমাদের যে পরিকল্পনা দাঁড়ায়, তা হল,

তিনটি অথবা চারটি ব্রিগেড জামালপুর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে টাঙ্গাইলে প্যারাশ্যুট ব্যাটালিয়নের সাথে মিলিত হবে। এই সম্মিলিত বাহিনী কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর সাথে একত্রে ঢাকার দিকে অগ্রসর হবে। অক্টোবরে ইস্টার্ন কম্যান্ডের সিনিয়র এয়ার স্টাফ অফিসার এয়ার ভাইস মার্শাল দেবাশর (Devashar), ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেডের কম্যান্ডার ব্রিগেডিয়ার ম্যাথু থমাস (Mathew Thomas) ও আমি বিমান থেকে সৈন্য অবতরণের অপারেশন নির্দেশিকা তৈরি করি। স্রেফ বলার জন্যই বলছি, সেই অত আগেও আমরা বলেছিলাম যে, ছত্রীসেনা নামানো হবে ডি প্লাস ৭ (D plus 7 — অর্থাৎ যুদ্ধ শুরুর সাত দিনের দিন)-এ এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লিঙ্কআপ করে ফেলতে হবে। পরবর্তী ঘটনাবলি প্রমাণ করে এই সময়সূচি কতটা নির্ভুল ছিল।

ছত্রীসেনা নামাবার আগে ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন পি কে ঘোষ (P K Ghosh)-এর নেতৃত্বে সিগন্যাল ডিটাচমেন্টসহ একটি অ্যাডভান্স পার্টি টাঙ্গাইলে সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ করে ২ প্যারা ব্যাটালিয়ন গ্রুপের ছত্রীসেনা অবতরণের জন্য সুবিধাজনক ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য আমরা পাঠিয়ে দিই। সিদ্দিকীর সাথে ঘোষ যোগাযোগ করেন এবং বিমান থেকে ফেলা সড়ক অবরোধের উপকরণাদি সংগ্রহ করার কাজে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। সিদ্দিকীকে আরো বলা হয় যে, যুদ্ধ শুরু হলে তাঁর বাহিনী আমাদের সৈন্যদের সাথে ঢাকার দিকে অগ্রসর হবে। যুদ্ধ শুরু হবার পর ছত্রীসেনা অবতরণে উপযুক্ত সহায়তা করলেও পাকিস্তানি বাহিনীর অপসারণে তাঁর বাহিনী কোনো আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করেনি। যুদ্ধ থেমে যাবার পর অবশ্য তাঁর বাহিনীর কিছু অংশ ঢাকায় আসে।

রসদ ও সরবরাহ

শুরু থেকেই যে সমস্যাটি আমাদের প্রকট ছিল, তা হল সৈন্যদের যাতায়াত ও রসদ সরবরাহ-ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। সৈন্যদলগুলোকে পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা, নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাদেরকে সমবেত করা এবং সেখানে তাদের অবস্থান ও ভরণপোষণের উপযোগী প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলার সামর্থ্যের ওপরে আসন্ন অভিযানের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। নির্দিষ্ট সেই এলাকাগুলোতে পর্যাপ্ত সড়ক ও রেল যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং কোনোরকম সহযোগী অবকাঠামো একেবারেই ছিল না। নতুন করে রাস্তা তৈরি, গুদাম ও সেনাছাউনি নির্মাণ, গোলাবারুদ স্থানান্তর এবং বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম, রেশন সংগ্রহ ও পরিবহন সবই নতুন করে তৈরি করে নিতে হয়েছিল। লজিস্টিক্‌সের ব্যাপারটি আগাগোড়াই এই যুদ্ধে একটা জটিল সমস্যা ছিল।

বড় যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি আমরা হই, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ব্রিজ তৈরি। খসড়া পরিকল্পনার রূপরেখার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্রিজের সংখ্যা নিরূপণ করে জুন মাসেই আমরা আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিলেও মধ্য-অগাস্টের আগে পর্যন্ত ব্রিজ নির্মাণের কোনো উপকরণ আসতে শুরু করেনি। ব্রিজ তৈরির যেসব উপকরণ আমরা পাই, তা প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের। সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ডিপো থেকে বেইলি পন্টুন ও ফোল্ডিং বোটের চালান আসে। ব্যবহারযোগ্য আধুনিক যন্ত্রপাতি যত ছিল, সবই মজুত রাখা হয় পশ্চিম রণাঙ্গনের জন্য, যেখানে শেষ পর্যন্ত সবই অব্যবহৃত থেকে যায়। অপারেশন শুরুর সময় মাত্র অর্ধেকের মতো ফোল্ডিং বোট এসে পৌঁছেছিল। অ্যাসল্ট বোট এসে পৌঁছায় অনেক দেরিতে, লড়াই শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগে। বেশির ভাগ যন্ত্রপাতিরই বড় ধরনের মেরামতি প্রয়োজন ছিল এবং সেই মেরামতির কাজগুলোও আমাদেরকেই করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিজ তৈরির প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম আমরা সময়মতোই মেরামত করে ফেলতে সমর্থ হই। চিফ এঞ্জিনিয়র ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এসব কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় এবং প্রয়োজনের সময় এসব আমরা তৈরি অবস্থাতেই পাই।

সৈন্য-সমাবেশের এলাকাগুলোতে রসদ সরবরাহ করতে আমরা সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হই। সরবরাহের কাজ শুরু হয় জুলাই মাসে এবং আমাদের

সৌভাগ্য যে, অপারেশন শুরুর আগেই তা আমরা শেষ করতে সমর্থ হই। তিনটি কোরের জাম্পিং-অফ (jumping off) পয়েন্টগুলো যেসব জায়গায় অবস্থিত ছিল, সেখানে আগে কখনো সেনা-সমাবেশ হয়নি। এর মধ্যে ত্রিপুরা ছিল সবচেয়ে দুর্গম। কোরগুলোর জন্য রসদঘাঁটি স্থাপন করা হয় তেলিয়ামুরা, উদয়পুর ও ধরমনগরে। ত্রিপুরাতে ৪র্থ কোরের জন্য ৩০,০০০ টন, কৃষ্ণনগরে ২য় কোরের জন্য ১৮,০০০ টন, রায়গড়ে ৩৩শ কোরের জন্য ৭,০০০ টন এবং ঢাকা আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে তুরায় ৪,০০০ টন সরবরাহ মজুত করা হয়।

ধরমনগর, তেলিয়ামুরা ও শিলচর (Silchar)-এ ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। রসদঘাঁটি ও জাম্পিং-অফ পয়েন্টগুলোর সাথে সংযোগরক্ষার জন্য ত্রিপুরাতে নতুন একটি সড়ক যোগাযোগ-ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। এই কাজে জেনারেল রিজার্ভ অভ্ এঞ্জিনিয়র ফোর্সেস — জিআরইএফ-এর দুটি টাস্ক ফোর্স কাজ করে। ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের অপারেশনের জন্য ৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন রাস্তা তৈরি করতে হয় এবং মিটার গ্যেজ রেলপথের দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয় দ্বিগুণেরও বেশি।

আমাদের রণাঙ্গনে — বিশেষত ত্রিপুরা ও মেঘালয় অঞ্চলে — বেতার যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। বিদ্যমান ডাক ও টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থা দিয়ে বেসামরিক কাজগুলো কোনোরকমে সমাধা হলেও আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল খুবই অপ্রতুল। ৪র্থ কোর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ডিভিশনসমূহের জন্য আমাদেরকে আনকোরা নতুন বেতার যোগাযোগব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি করতে হয় এবং তা ডিভিশনগুলো ত্রিপুরাতে পৌঁছানোর আগেই। একইভাবে কৃষ্ণনগরে তখন-পর্যন্ত-না-আসা ২য় কোর ও তার দুই ডিভিশনের জন্য বেতার যোগাযোগের ব্যবস্থাও আমাদেরকেই করতে হয়। মেঘালয় রাজ্যের তুরা ও কুচ বিহারেও একটি ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্সের জন্য আমরা বেতার যোগাযোগের ব্যবস্থা করি। ফোর্ট উইলিয়াম, শিলং, কৃষ্ণনগর, তুরা, তেলিয়ামুরা ও ধরমনগরের জন্য নতুন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেনা ও বসানো হয়। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স ও তার সেনাবিন্যাসের সাথে সংযুক্ত ইলেকট্রনিক টেলিপ্রিন্টার সার্কিটগুলোর ওপরে আমাদেরকে ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হয় এবং পরবর্তীকালে এগুলো নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

আমাদের যানবাহনের ঘাটতিও ছিল প্রকট। মাউন্টেন ডিভিশনগুলো গঠন করা হয়েছিল খুবই স্বল্প সংখ্যক যানবাহন দিয়ে। সমতলভূমিতে মাউন্টেন ডিভিশনের যানবাহনের ঘাটতি পূরণ ছাড়াও বিভিন্ন রসদঘাঁটিতে হাজার হাজার টন রসদসামগ্রী পরিবহনের জন্যও আমাদের যানবাহনের প্রয়োজন ছিল। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স আমাদেরকে পর্যাপ্ত যানবাহন দিতে না পারলেও ১০০টি গাড়ির শ্যাসি' দেয়। এই শ্যাসি'গুলোতে বডি লাগাবার ব্যবস্থা তারা করতে পারেনি বলেই মনে হয়। শ্যাসি'গুলো চালিয়ে আমরা পানাগড় (Panagarh) ভেইক্‌ল ডিপোতে নিয়ে যাই। বাতিল করে দেয়া পুরনো যানবাহনের বিশাল এক সংগ্রহ সেখানে ছিল। ১৯৭১-এর

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যেই পুরনো গাড়ির বডি নতুন শ্যাসি'র ওপরে বসানোর কাজ আমরা শেষ করে ফেলি। দেখতে তেমন সুন্দর না হলেও এগুলো কাজ চালাবার অবস্থায় চলে আসে। এছাড়াও আমরা দুই হাজারেরও বেশি বেসামরিক পরিবহন-যান ভাড়া করার জন্য মধ্যভারত পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে দল পাঠাই।

অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির — বিশেষত মিডিয়াম মেশিনগান, লাইট মেশিনগান ও রিকয়েললেস অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক গানের সঙ্কট আমাদের সবসময়ই ছিল। এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিপোতে নাছোড়বান্দার মতো ক্রমাগত আমরা রিক্যুইজিশন পাঠাতে থাকি। হালকা অস্ত্রের খুচরো যন্ত্রাংশের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। ফলে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কারখানাগুলোতে আমরা ফায়ারিং পিন ও লাইট মেশিনগানের ব্রিচব্লক বানানোর প্রস্তাব দিই। ট্যাঙ্কের ট্র্যাক এবং আমাদের উভচরযান পিটি ৭৬-এর লিঙ্ক যোগাড় করাও আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এগুলো বোম্বেতে এসে পৌঁছায় এবং তারপরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সৌজন্যে বিমানে করে কলকাতায় আনা হয়। রেডিও সেটের জন্য ড্রাইসেল ব্যাটারিরও মারাত্মক ঘাটতি ছিল। আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের মাস্টার জেনারেল অভ্ অর্ডন্যান্স পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, অব্যবহৃত অবস্থায় বেশি দিন পড়ে থাকলে এসব ব্যাটারি যেহেতু দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে যদি এগুলোর আর প্রয়োজন না পড়ে, সেই কারণে তিনি এসব সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারবেন না। ব্রিগেডিয়ার সেথনা তাঁর ব্যবসায়ী বন্ধুদেরকে অনুরোধ করলে তাঁরা অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে এসব ব্যাটারি উৎপাদন করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে মাস্টার জেনারেল অভ্ অর্ডন্যান্সের বিশেষ অনুরোধে এখান থেকে কিছু ব্যাটারি তাঁর কাছেও পাঠানো হয় অন্য রণাঙ্গনে ব্যবহারের জন্য।

ইস্টার্ন কম্যান্ডের ডিভিশনাল আর্টিলারির প্রায় পুরোটাই সজ্জিত ছিল মাউন্টেন গান দিয়ে। ৪ ও ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের ছিল ৭৬ মিমি. যুগোস্লাভ কামান। আর এদের ১২০ মিমি. মর্টারসজ্জিত একটি করে প্যাক লাইট (pack light) রেজিমেন্ট ছিল। ৪ ডিভিশনের ১২০ মিমি. মর্টারগুলো ছিল ইসরাইলি ট্যাম্পেলা (Tampella) আর ২৩ ডিভিশনের ছিল ব্র্যান্ড্ট্ (Brandt)। এই দু'ধরনের ১২০ মিমি. মর্টারের একটির গোলা আবার অন্যটিতে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের ছিল তিন রেজিমেন্ট ৭৫/২৪ কামান এবং এক ডিভিশন ১২০ মিমি. ব্র্যান্ড্ট্ মর্টার। ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছিল এক রেজিমেন্ট ৭৫/২৪ কামান এবং অন্য এক রেজিমেন্ট ৩.৭ ইঞ্চি হাউইৎজার। ৮ মাউন্টেন ডিভিশনের কোনো ধরনের আর্টিলারিই ছিল না। এই কম্যান্ডে মাত্র দুই রেজিমেন্ট ৫.৫ ইঞ্চি কামান ছিল এবং সেগুলো নিয়োজিত ছিল আমাদের উত্তর-সীমান্তে। আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা বলতে ছিল দুটি অ্যালুয়েট (Allouette) হেলিকপ্টার এবং দুটি কৃষক (Krishak) এয়ারক্র্যাফ্ট। এই দলের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্লাইং ক্লাব থেকে ছ'টি পুষ্পক (Pushpak) এয়ারক্র্যাফ্ট ভাড়া করা হয়। এগুলো দিয়ে ভারি গোলাবর্ষণ সম্ভব ছিল না — একটিমাত্র ৭৫ মিমি.

কামান থেকে ১৩ পাউন্ডের গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব ছিল, যার বিধ্বংসী ক্ষমতাও ছিল সীমিত।

এত অসংখ্য ধরনের গোলাবারুদের প্রয়োজন মেটানো আমাদের জন্য ছিল এক মহাসমস্যা। জুলাই মাসে আমরা আর্টিলারি হেডকোয়ার্টার্স ও রেজিমেন্টসমূহ পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব গ্রহণ করি। উত্তর সীমান্ত থেকে হেডকোয়ার্টার্স ২ আর্টিলারি ব্রিগেড সরিয়ে সেটাকে নবগঠিত ২য় কোরের আর্টিলারি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স হিসেবে আমরা নিয়ে আসি। কারণ এই কোরে কোনো আর্টিলারি হেডকোয়ার্টার্স ছিল না। প্রতিটি ডিভিশনে যাতে একই ধরনের কামান থাকে, সেই লক্ষ্যেও আমরা কাজ করেছি। প্যাক ইউনিটগুলোকে আমরা টৌড (towed) ইউনিটে রূপান্তরিত করি এবং উত্তর সীমান্ত থেকে আর্টিলারি ইউনিট আনিয়ে এদিকের কাঠামোগত ঘাটতি যথাসম্ভব পূরণ করার চেষ্টা করি। উত্তরসীমান্ত থেকে দুটি মিডিয়াম আর্টিলারি রেজিমেন্ট সরিয়ে সেখানে নামমাত্র শক্তি রেখে আমরা একটি পরিকল্পিত ঝুঁকি নিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আর্মি হেডকোয়ার্টার্স আমাদেরকে ৫.৫ ইঞ্চি কামান ও ১৩০ মিমি. কামানের একটি করে রেজিমেন্ট বরাদ্দ করে। মর্টার খুঁজে বের করার জন্য দুটি লোকেটিং ব্যাটারির বরাদ্দও আমরা পাই। কামান অনুসন্ধানের জন্য স্কুল অভ্ আর্টিলারি কিছু লোকজন ও যন্ত্রপাতি পাঠায়। নভেম্বরে ১২টি সিঙ্গল ব্যারেল রকেট লঞ্চার (গ্রাদ পি — Grad P) আমরা পাই, এবং তা দিয়ে দুটি রকেট ব্যাটারি তৈরি করে ফেলি। এর একটি বরাদ্দ করি ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনকে এবং অন্যটি ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনকে। ২৩ মাউন্টেন ডিভিশন সাফল্যের সাথে এগুলো ব্যবহার করলেও রকেটের সরবরাহ না থাকায় ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের কোনো কাজে এসব লাগেনি।

উত্তরসীমান্ত থেকে আর্টিলারি সরিয়ে এনে এবং বিভিন্ন ধরনের আর্টিলারির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে গোলাবারুদ, যন্ত্রাংশ ও ওয়র্কশপব্যবস্থার সহজীকরণ করে যে পরিকল্পিত ঝুঁকি আমরা নিয়েছিলাম, সেটা আমরা একান্তভাবে আমাদের উদ্যোগেই করেছিলাম — আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের কোনো অনুমোদন ছাড়াই। ফলে লড়াই শুরু হলে ৭৫ মিমি. কামানের হালকা শেলের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও আর্টিলারি সাপোর্ট পর্যাপ্তই ছিল।

৩১ অক্টোবর হেডকোয়ার্টার্স থেকে ২য় কোরকে অগ্রসর হওয়ার অর্ডার ইস্যু করা হয় এবং নভেম্বরে এই কোরের লোকজন এসে পৌঁছাতে শুরু করে। লোকজন এসে পড়ার অব্যবহিত পরেই যাতে কোর হেডকোয়ার্টার্স কাজ শুরু করে দিতে পারে, সেই লক্ষ্যে হেডকোয়ার্টার্স ইস্টার্ন কম্যান্ড আগে থেকেই অবকাঠামো, যোগাযোগ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রাখে।

ছ'টি নিয়মিত হালকা বিমানবিধ্বংসী রেজিমেন্ট ও তিনটি টেরিটোরিয়াল রেজিমেন্টের সমন্বয়ে গঠিত ছিল আকাশ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা। বিমান-আক্রমণের ক্ষীণ আশঙ্কা ও আকাশে আমাদের শক্তির তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনায় আনলে এই ব্যবস্থা ছিল পর্যাপ্তের চেয়েও বেশি।

১৯৭১-এর যুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল সম্ভবত অপারেশনগুলোর জন্য একটি কার্যকর অবকাঠামো তৈরি এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থা স্থাপনের দূরদর্শিতার মধ্যে। অর্ডার ইস্যুর আগেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কম্যান্ড, কোর, অঞ্চল, উপ-অঞ্চল ও বিভিন্ন ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্সের দাপ্তরিক কর্মীদের দিক থেকে এটা ছিল এক বিশাল সাফল্য। এই কম্যান্ডের আর্মি সার্ভিস কোর, অর্ডন্যান্স, মেডিক্যাল ও পোস্টাল সার্ভিসের এঞ্জিনিয়র, সিগন্যাল্স, ইলেকট্রিক্যাল ও মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনিয়র, ওয়র্কশপ ও সাপ্লাই অর্গ্যানাইজেশনের এঞ্জিনিয়ররা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে। লড়াই শুরু হলে আমাদের সৈন্যদেরকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রায় সব কিছুই ছিল মজুত অবস্থায়। এ এক অসাধারণ সাফল্য! যাঁদের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে — বিশেষ করে ব্রিগেডিয়ার আদি সেথনা, ব্রিগেডিয়ার ইন-চার্জ অভ্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চজ্জু রাম ও চিফ এঞ্জিনিয়র বাবা ভিদে — তাঁরা সকলেই এই কৃতিত্বের দাবিদার।

পাকিস্তানি সেনাবিন্যাস

এখন দেখা যাক যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানিদের সেনাবিন্যাস কেমন ছিল। (যুদ্ধ ও সেনাবিন্যাস সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ৭ ও সংযুক্ত ম্যাপ দ্রষ্টব্য।)

উত্তর-পশ্চিম সেক্টর

নাটোরে স্থাপিত হেডকোয়ার্টার্সের অধীনে মেজর জেনারেল নজর হুসাইন শাকের (Nazar Hussain Shaker)-এর নেতৃত্বে ১৬ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ছিল একটি রিকনিসন্স (লুকিয়ে নজর রাখা) ও সাপোর্ট ব্যাটালিয়ন, এক স্কোয়াড্রন কম একটি আর্মার রেজিমেন্ট, দুইটি ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট এবং একটি ভারি মর্টার ব্যাটারি। এই ডিভিশন চার ব্যাটালিয়নসম্বলিত ২৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডকে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে, ২০৫ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডকে হিলি-ঘোড়াঘাট অঞ্চলে এবং ৩৪ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডকে রাজশাহী-নওগাঁ অঞ্চলে নিয়োজিত করে। এই অঞ্চলে পাকিস্তানি প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে মজবুত। শিলিগুড়ি করিডরকে বিচ্ছিন্ন করাও আমাদের এই সেক্টরের দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল।

পশ্চিম সেক্টর

মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারী (M H Ansari)-র অধীনে ছিল ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনে একটি আর্মার স্কোয়াড্রন, দুইটি ফিল্ড রেজিমেন্ট ও একটি মর্টার ব্যাটারি। ১০৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের সাথে ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্স স্থাপিত ছিল যশোরে এবং ৫৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড ছিল ঝিনাইদহ্-মেহেরপুর-জীবননগর এলাকায়। সাতক্ষীরাতেও ছিল এর কিছু অংশ। পাকিস্তানিদের এসব কৌশল অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিল তাদের শক্তিকে তাদের প্রকৃত শক্তির চেয়ে বেশি করে দেখানো। তাদের এই কৌশল আংশিক কাজে লেগেছিল। কারণ তাদের বেশি বেশি করে দেখানো বেতার যোগাযোগের জট ভেদ করতে প্রাথমিকভাবে আমরা ব্যর্থ হয়েছি এবং এই সেকটরে তাদের সেনাবিন্যাস সম্পর্কে আমার ধারণা হয়েছিল তাদের প্রকৃত শক্তির চেয়ে বেশি।

দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর

এক স্কোয়াড্রন আর্মার, দুইটি ফিল্ড রেজিমেন্ট ও একটি হেভি মর্টার ব্যাটারিসহ ১৪ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজি (Abdul Majid Quazi)র

নেতৃত্বে এই সেক্টরের উত্তরাঞ্চলে নিয়োজিত ছিল। এর হেডকোয়ার্টার্স প্রথমে ঢাকায় থাকলেও পরবর্তীতে ভৈরববাজারে স্থানান্তরিত হয়। ১৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড আখাউড়া-কসবা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায়, মৌলভিবাজার এলাকায় ৩১৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড এবং সিলেটে ২০২ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড নিয়োজিত ছিল। মেজর জেনারেল রুহুল রহিম খান (Ruhul Rahim Khan)-এর নেতৃত্বাধীন ৩৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন ছিল এই সেক্টরের দক্ষিণাঞ্চলে। এর হেডকোয়ার্টার্স ছিল চাঁদপুরে। ১১৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড ছিল ময়নামতিতে এবং দুই ব্যাটালিয়নবিশিষ্ট ৫৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড ছিল ফেনী অঞ্চলে। ৯১ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের একটি নিয়মিত ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন ও সেই সাথে আধা-সামরিক বাহিনীর কিছু অংশ নিয়োজিত ছিল ফৌজদারহাট-রামগড় এলাকায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অংশবিশেষ থাকলেও ৯১ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড মূলত নিয়োজিত ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে।

উত্তর-পূর্ব সেক্টর

ডিরেক্টর জেনারেল অভ্ ইস্ট পাকিস্তান'স সিভিল আর্মড ফোর্সেস থেকে হেডকোয়ার্টার্স ৩৬ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন গঠিত হয়। এর অধীনে জামালপুর-ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিয়োজিত একটি ব্যাটারিসহ ৯৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড ছিল। এক ব্রিগেডের সমপরিমাণ সৈন্য নিয়োজিত ছিল ঢাকায়।

এসব নিয়মিত বাহিনী ছাড়াও প্রতিটি ডিভিশনকে প্রচুর সংখ্যক ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড পুলিশ --- এপক্যাপ (EPCAP), মুজাহিদ ও রাজাকার দেয়া হয়েছিল, যারা নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের সাথে কাজ করেছে।

প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ

অক্টোবরের প্রথমদিকে দেয়া খসড়া কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সেনাস্থাপনাগুলো প্রস্তুতিমূলক উদ্যোগ নিতে শুরু করে। নতুন করে দল ও উপদল গঠন করা হয় এবং প্রচুর নতুন ফরমেশন (বিভিন্ন সেনা-ইউনিটের সমাবেশ) ও ইউনিট গড়ে তোলা হয়। শুধু উত্তরবঙ্গে অবস্থানরত ৩৩শ কোর হেডকোয়ার্টার্স তাদের অবস্থান থেকে আক্রমণ-অভিযান পরিচালনার মতো অবস্থায় ছিল। তুলনামূলকভাবে ছোট পরিসরে স্থাপিত ২য় কোর হেডকোয়ার্টার্স তখন পর্যন্ত কৃষ্ণনগরের দিকে অগ্রসর হয়নি। ৪র্থ কোর হেডকোয়ার্টার্স ছিল বিচ্ছিন্ন। এই কোর তার চিফ অভ্ স্টাফ মেজর জেনারেল ও পি মালহোত্রা (O P Malhotra)-র নেতৃত্বে এর একটি অংশ উত্তরসীমান্ত রক্ষা করার জন্য পেছনে রেখে যায়।

যে এলাকায় আমাদের সৈন্যরা লড়াই করবে, সেই এলাকার ধরন অনুযায়ী সৈন্যদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবার ব্যাপারটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিটগুলোর ব্যাপক পুনর্বিন্যাসের কারণে এসব ইউনিটকে প্রশিক্ষণ দেয়াও ছিল সমান জরুরি। এছাড়াও ততদিনে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা পাকিস্তানি কৌশল আমরা ভালভাবে বুঝতে পেরেছি। প্রধান শহরগুলো ও সেগুলোর প্রবেশপথে তাদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কেও আমরা সম্যক ধারণা লাভ করতে পেরেছি। প্রতিরোধের কেন্দ্রবিন্দুগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া ও বিকল্প পথ ব্যবহারের ওপরে আমরা আমাদের ইউনিটগুলোকে প্রশিক্ষণ দিই। কারণ গতি ও সাবলীলতাই হবে এসব অপারেশনে সাফল্যের চাবিকাঠি।

নতুন সরঞ্জামও সন্নিবেশিত হয়, যেমন: চাকাযুক্ত আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার। দুটি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নকে আমরা মেকানাইজ্ড ইনফ্যান্ট্রি হিসেবে পুনর্গঠনের জন্য নির্বাচিত করি। প্রশিক্ষণের একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়। মেকানাইজ্ড ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন-দুটোর জন্য আমি এস্টাবলিশমেন্ট টেব্‌ল ও কৌশলগত নির্দেশাবলি তৈরি করি এবং অপারেটিং প্রসিডিওর প্রণয়ন করি। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কোনো মেকানাইজ্ড ইনফ্যান্ট্রি অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাস কেটে যায় একটানা প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে। এর মধ্যে আকাশ ও স্থলপথে একসাথে আক্রমণের প্রশিক্ষণও ছিল। আসন্ন অপারেশনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের জন্য ৪র্থ কোরের কাছে হেলিকপ্টারগুলোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৯৭১-এর ১৪ নভেম্বর ইস্টার্ন কম্যান্ডের এলাকাভুক্ত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়া হয়। এর আগে শুধু সীমান্তে রক্ষিত ব্যাটালিয়নগুলোই আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

সেপ্টেম্বরের মধ্যেই মুক্তিবাহিনীর অপারেশন পাকিস্তানিদের সাহসের ভিত নড়িয়ে দিতে শুরু করে। ছোটখাট আক্রমণ ও অ্যামবুশ চলতে থাকে। উড়িয়ে দেয়া হয় কালভার্ট ও ব্রিজ। পাকিস্তানিদের, বিশেষত সাধারণ সৈন্যদের যুদ্ধের ইচ্ছা উবে যায়। এসবের ফলে পাকিস্তানি আর্টিলারি প্রতিহিংসাবশত মুক্তিবাহিনীর ওপরে গোলাবর্ষণ শুরু করে। আমাদের কিছু সীমান্তফাঁড়ি পাকিস্তানি গোলাবর্ষণের আওতায় পড়ে যায়। ফলে পাকিস্তানি গোলাবর্ষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে কিছু সীমান্তবর্তী এলাকার দখল নেয়া আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে।

সমস্ত সেনা-ফরমেশনের কাছে আমাদের কর্ম-পরিকল্পনা বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং তা প্রণয়ন করা হয় যেসব কৌশলের ভিত্তিতে, তা হল: *(ক)* শত্রুসেনাকে সীমান্তের যতটা কাছাকাছি সম্ভব নিয়ে এসে তাদের রিজার্ভ কমিয়ে ফেলতে হবে; *(খ)* শত্রুদের শক্তিশালী প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে তাদের যোগাযোগ-ব্যবস্থার কেন্দ্রগুলোতে আঘাত হানতে হবে; *(গ)* শত্রুবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে তাদের কম্যান্ড ও নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে; এবং *(ঘ)* সুযোগমতো পদ্মা ও মেঘনা পার হয়ে উত্তরদিক থেকে ঢাকাগামী মূল আক্রমণকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে যে অপারেশন নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী তিনটি কোর ও অন্যান্য স্থানে বাহিনীর শক্তির তারতম্য ঘটানোর ব্যাপারে আমাদের প্রায় কিছুই করণীয় ছিল না। তা সত্ত্বেও আমরা অবশ্য আমাদের নিজ দায়িত্বে উত্তরসীমান্তে নিয়োজিত আমাদের বাহিনীর শক্তি কমিয়ে ফেলেছিলাম। কয়েকটি আর্টিলারি ইউনিট ও একটি আর্টিলারি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স সরানোর মাধ্যমে আমরা এর বাস্তবায়ন শুরু করেছিলাম। বেশ কয়েকটি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নও আমরা ব্যবহার করেছি। যেহেতু আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের কাছে লক্ষ্যস্থল হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব বোঝাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি এবং ভুটানের জন্য রিজার্ভ রাখার কারণে মানেক্‌শ' যেহেতু ৬ মাউন্টেন ডিভিশন ব্যবহার করতে দেবেন না, ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্‌স ইন্দর গিলকে আমি জানাই যে; আমরা উত্তর সীমান্ত থেকে পূর্ব ভুটানের জন্য আলাদা করে রাখা ১২৩ মাউন্টেন ব্রিগেড, ১৬৭ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং ৫ মাউন্টেন ব্রিগেডকে আনাবার পরিকল্পনা করেছি। বরাবরের মতোই প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী ইন্দর এতে সায় দেন। এই সৈন্যদেরকে কম্যান্ড করার জন্য আমাদের একটি হেডকোয়ার্টার্সের প্রয়োজন পড়ে। ফিল্ড হেডকোয়ার্টার্সের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে আমরা যথাযথ কলেবর বৃদ্ধির পর হেডকোয়ার্টার্স ১০১ কমিউনিকেশন জোনকে এই কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এর জিওসি অপরিসীম প্রাণশক্তিতে ভরপুর বাস্তববাদী অসাধারণ এক সৈনিক মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং গিল-এর সাথে অপারেশনের ধরন নিয়ে আমি আলোচনা করি। আরো সৈন্য চাইলে আমি তাঁকে জানাই যে, ডি প্লাস ৭

অর্থাৎ যুদ্ধ শুরুর সপ্তম দিনে প্যারাশ্যুট ব্যাটালিয়ন গ্রুপকে টাঙ্গাইলে নামিয়ে দেয়া হবে এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে ফেলতে পারবেন। চারটি ব্যাটালিয়ন ও প্রয়োজনীয় আর্টিলারিসহ ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড গ্রুপকে তাঁর কম্যান্ডে দিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও পরে আমরা ১৬৭ মাউন্টেন ব্রিগেড ও ৫ মাউন্টেন ব্রিগেড বরাদ্দ করি। ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপরে অবস্থিত ধুবড়িতে ইতোমধ্যেই পৌঁছে যাওয়া ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ফ্লোটিলা সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হয়, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি সৈন্য পারাপারের কাজে ব্যবহার করতে পারেন এবং প্রয়োজনে পরবর্তীতে জামালপুরে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর অনুরোধে ফ্লোটিলার কম্যান্ড তাঁকে দিয়ে দেয়া হয়। নদী পারাপারের সরঞ্জামাদি, এমনকি একটি বড় ব্রিজ, যা তুরায় স্থানান্তর করা হবে, সম্পর্কে তাঁকে ব্রিফ করা হয়। সন্ত সিংকে বরাদ্দ করা বিহার ব্যাটালিয়ন ব্যবহারের পরামর্শও তাঁকে আমি দিই। টাঙ্গাইলে 'বাঘা' সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ২০,০০০ মুক্তিযোদ্ধার এক বাহিনী আছে। প্যারাশ্যুট ব্যাটালিয়নের অবতরণ-এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই বাহিনীকে ব্যবহার করতে হবে এবং পরে তাদেরকে সাথে নিয়েই ঢাকার দিকে অগ্রসর করতে হবে। ঢাকায় যোগাযোগের সময়সীমা আমরা নির্ধারণ করে নিই। গুরবক্স গিল তাঁর অধীনে অবিলম্বে ১৬৭ ও ৫ মাউন্টেন ব্রিগেড চাইলেন। আমি বললাম যে, এটা সম্ভব নয়; কারণ আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের শুধু ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্স আমাদের এই পরিকল্পনা জানেন। আর্মি চিফকে এটা এখনও বোঝানো যায়নি যে, আমরা যখন পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকব, তখন চীনারা আক্রমণ করবে না। আমাদের আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ অফিসিয়াল চিঠি দিয়ে তাঁকে জানানো হয়। দুর্ভাগ্যবশত, যুদ্ধ চলাকালীন ৫ ডিসেম্বর গুরবক্সের গাড়ি পুঁতে-রাখা একটি স্থলমাইনের ওপর দিয়ে চলে গেলে তিনি আহত হন। আমাদের সৌভাগ্য, হাসপাতাল থেকেই তিনি তাঁর-পরিবর্তে-দায়িত্ব-পালনকারী অফিসারকে ব্রিফ করতে সমর্থ হন। নভেম্বরের গোড়ার দিকে উপযুক্ত সমাবেশস্থলে চলে আসার জন্য ১২৩, ১৬৭ ও ৫ মাউন্টেন ব্রিগেডকে অর্ডার ইস্যু করা হয়। এই ব্যাপারটি টেলিফোনে আমি ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্সকে জানিয়ে দিই।

মুক্তিবাহিনী

অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে পূর্ব পাকিস্তানের ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য ভারত সরকার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন। পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনী-পরিচালিত গেরিলা অপারেশনের সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'অপারেশন জ্যাকপট (Operation Jackpot)'। মুক্তিবাহিনীর ভর্তি ও নিয়ন্ত্রণ-কার্যক্রম আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরিচালিত হত এবং এর কেন্দ্র ছিল কলকাতার থিয়েটার রোডের মুজিবনগরে। এর প্রধান ছিলেন কর্নেল এম এ জি ওসমানী ও তাঁর ডেপুটি ছিলেন উইং কম্যান্ডার খন্দকার। চট্টগ্রাম সেক্টরে মেজর জিয়া, কুমিল্লায় মেজর খালেদ মোশাররফ, ময়মনসিংহে মেজর শফিউল্লাহ, রংপুরে উইং কম্যান্ডার বাশার, রাজশাহীতে লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল জামান, কুষ্টিয়াতে মেজর উসমান এবং খুলনায় মেজর জলিল দায়িত্বে ছিলেন। 'বাঘা' সিদ্দিকী তাঁর নিজের এলাকা টাঙ্গাইলে থেকেই অপারেশন চালানো স্থির করেন। নূরুল কাদের এবং তোহা-ও তাই করেন। সীমান্ত এলাকায় আমরা মোটামুটি আট হাজার গেরিলা প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করি। রিক্রুটদেরকে তিন মাসের প্রশিক্ষণ দেবার কথা। দলনেতাদের কিছু বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন ছিল। প্রশিক্ষণের পরে এই গেরিলারা সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানের গভীরে ঢুকে গিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং সারা পৃথিবীর ইতিহাসে গেরিলারা যে নিয়মে যুদ্ধ করেছে, তারাও সেই একই আবর্তে চলবে — এটাই ঠিক হয়ে ছিল। বিদ্যমান ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নগুলোকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি ওসমানীর পরিকল্পনা অনুযায়ী অতিরিক্ত ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ও আর্টিলারি ব্যাটারি তৈরির জন্য প্রচুর নতুন লোকের প্রয়োজন ছিল। অস্থায়ী সরকার অবশ্য মোটামুটি ১০০,০০০ গেরিলা দিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠনের চিন্তা করে এবং তাদের মধ্যে এরকম একটি ধারণা জন্মায় যে, এদের জন্য তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে, সুশিক্ষিত বাহিনী তৈরির লক্ষ্যে ছয়-সাত মাস পরে ১০০,০০০ দক্ষ গেরিলা বের করা বেশ কঠিন হবে বলে ৮,০০০-ই আমাদের কাছে যথেষ্ট বাস্তবসম্মত সংখ্যা বলে মনে হয়। এছাড়াও ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ও আর্টিলারি ব্যাটারির জন্য বেশ কয়েক হাজার রিক্রুটের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। মেজর জেনারেল ওঙ্কার সিং কালকাট (Onkar Singh Kalkat)-কে মানেকশ' সরাসরি অরোরার সাথে

কাজ করার জন্য ডেপুটেশনে পাঠিয়ে দেন। অপারেশন জ্যাকপট-এ মুক্তিবাহিনীকে যাবতীয় সহায়তা করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল অরোরার ওপরে। এর ফলে আমি অপারেশনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রসদ সরবরাহ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা সংগঠনের সুযোগ পাই। প্রশিক্ষণের অগ্রগতি সম্পর্কে মানেকশ' দৈনন্দিন প্রতিবেদন চাইতেন। দক্ষ ও নিষ্ঠাবান একজন অফিসার হিসেবে কালকাটের পক্ষে এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁর অপরিচিত এই পরিবেশে তিনি যাতে কাজ করতে পারেন, সেজন্য আমরা তাঁকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করেছি। বড়জোর দু'মাস পরে অবশ্য মেজর জেনারেল বি এন (জিমি) সরকার [B N (Jimmy) Sarcar] ওঙ্কার কালকাটের স্থলাভিষিক্ত হন। মানেকশ'কে অগ্রগতির হালচাল জানানোর কাজে অরোরা তাঁর সময়ের অধিকাংশই সরকারের সাথে কাটান।

আনুমানিক ৪০০ নৌ কম্যান্ডো ও ডুবুরি (frogman)-কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বন্দরএলাকা আক্রমণের কাজে এরা খুব কার্যকর। বোফর্স (Bofors) ৪০ মিমি. গান-বসানো মুক্তিবাহিনীর একটি গানবোটের সাহায্যে তারা ১৫টি পাকিস্তানি জাহাজ, ১১টি কোস্টার, ৭টি গানবোট, ১১টি বার্জ, ২টি ট্যাঙ্কার ও ১৯টি নৌযান দখল করে, ধ্বংস করে অথবা ডুবিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল মুক্তিবাহিনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

পরবর্তীতে গানবোটে রূপান্তরিত করার জন্য মুক্তিবাহিনীর আরো নৌযানের প্রয়োজন পড়লে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ ব্যাপারে সহায়তা করার অনুরোধ জানাই। আমাদেরকে তাঁরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন এবং এমভি *পদ্মা* ও কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট থেকে এমভি *পলাশ* নামে দুটি নৌযান আমাদেরকে ধার হিসেবে দেন। আমাদের ওয়র্কশপে এগুলোর ডেক আরো মজবুত করে তার ওপরে বোফর্স এল/৬০ (L/60) বিমানবিধ্বংসী কামান স্থাপন করা হয়। পাকিস্তান নৌবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের মধ্যে থেকে এসবের জন্য ক্রু নির্বাচন করা হয়। এতে সহায়তা করার জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীর একজন অসাধারণ সাবমেরিনার কমোডর সামন্ত (Samant)-কে নিয়োজিত করা হয়। যুদ্ধের সময়ে ইস্টার্ন ন্যাভাল কম্যান্ড নয়, বরং ফোর্ট উইলিয়ামস্থ ইস্টার্ন কম্যান্ডের অর্ডারে এই টাস্ক ফোর্স পরিচালিত হবে বলে নির্ধারিত হয়। পরে যুদ্ধ শুরু হলে এই গানবোটগুলো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। টাস্কফোর্সকে চালনা ও মংলা বন্দরে অবস্থিত পাকিস্তানি নৌবহর আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। সামন্ত খুলনাও আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁকে বলা হয় যে, আমাদের স্থলবাহিনী খুলনার দিকে অগ্রসর হবে এবং খুলনায় প্রচুর পাকিস্তানি সৈন্য আছে। এয়ার ফোর্সকে দেয়া বোমাবর্ষণের নির্দেশনা সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হয়। যেসব এলাকায় বোমাবর্ষণ করা হবে, সেই তালিকায় খুলনাও ছিল। সামন্তকে তাঁর গানবোটের চিহ্ন হিসেবে হলুদ রং দিয়ে সুপারস্ট্রাকচার রং করতে বলার জন্য অ্যাডভান্স হেডকোয়ার্টার্স ইস্টার্ন এয়ার কম্যান্ড আমাকে অনুরোধ করে। রং করা সম্পন্ন হবার পরপরই সেই

৬. মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন সদস্য

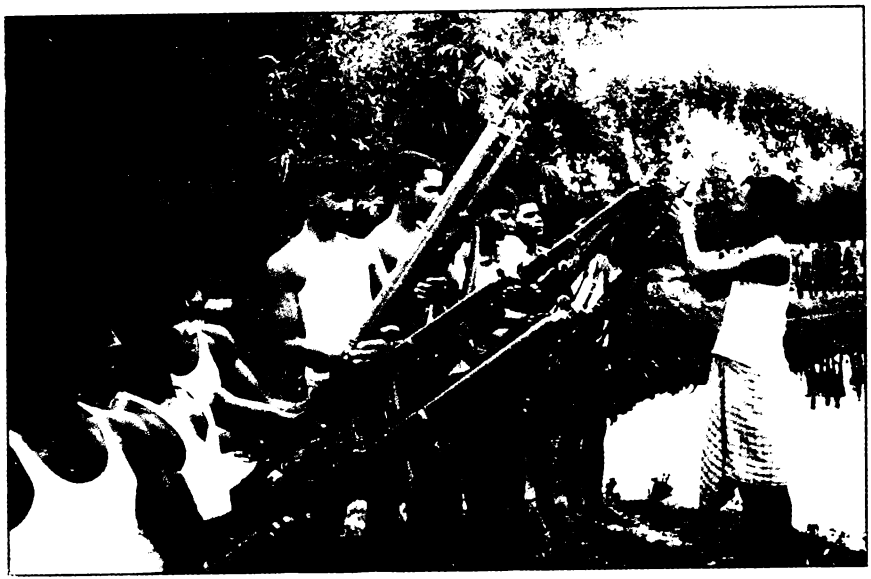

৭. প্রশিক্ষণরত বাঙালি তরুণ-যুবক

৮ সশস্ত্র সংগ্রামে মুক্তিবাহিনী

৯ বয়রাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত পাকিস্তানি ট্রাঙ্ক

এলাকায় কর্মরত স্কোয়াড্রনকে এটা অবহিত করা হয়। মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধা এবং *পদ্মা* ও *পলাশ* নিয়ে গঠিত টাস্কফোর্স তাদের অপারেশনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। ডিসেম্বরের ৯/১০ তারিখের রাতে এটা মংলার প্রবেশপথে এবং ১০ তারিখে বন্দরে পৌঁছে। অতি-উৎসাহী সামন্ত খুলনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। পরিষ্কার হলুদ রং করা থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এয়ার ফোর্স সেগুলোকে চিহ্নিত করতে পারেনি। ফলে ন্যাটো (NATO)-র পরিভাষা অনুযায়ী 'বন্ধুত্বপূর্ণ গুলিবর্ষণ (friendly fire)'-এর পরিণতিতে জাহাজগুলো ডুবে যায়। সামন্তসহ অন্যান্য ক্রু সাঁতরে পারে উঠতে সমর্থ হয়। সেই এলাকার নিয়ন্ত্রণ মুক্তিবাহিনীর হাতে ছিল বলে সৌভাগ্যবশত কেউ হতাহত হয়নি। তারপরেও ইস্টার্ন কম্যান্ডের আমরা সকলে সামন্তকে মহাবীর চক্র পুরস্কারে ভূষিত করার জন্য সুপারিশ করি।

গেরিলা অপারেশনের বিকাশ ও সাফল্যের জন্য গেরিলাদেরকে অবশ্যই জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে দৃঢ় ও গভীরভাবে আঘাত হানতে হবে। এই কাজে মোটিভেশনের পাশাপাশি সময় ও সমন্বয়ও একই রকমের গুরুত্বপূর্ণ। কোনো গেরিলা অপারেশন থেকেই রাতারাতি ফল লাভ হয় না। এটা যেহেতু পরিষ্কার ছিল যে, আমাদের হাতে অপরিসীম সময় নেই এবং অল্প দিনের মধ্যেই সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হবে, সে কারণে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সংখ্যক গেরিলা আমাদের হাতে থাকার কথা, তাদেরকে এই ছয়-সাত মাস সময়ের মধ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরকের সাথে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণহীন সদস্যদের কোনো পরিচয় ছিল না। গেরিলাযুদ্ধের প্রাথমিক কায়দা-কানুন আয়ত্ত করার জন্য কমপক্ষে তিন মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। নেতা বা অধিনায়ক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের জন্য আরো বেশি সময়ের প্রয়োজন। তারপরেও বিপুল সংখ্যক গেরিলা যোদ্ধাকে মাত্র তিন-চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর ফলে, যেমন ঘটবে বলে আশা করা গিয়েছিল, তাদের কার্যকারিতা ছিল সামান্যই, যদিও এর জন্য তাদেরকে আদৌ দায়ি করা সঙ্গত নয়।

সফল গেরিলা অপারেশনের জন্য প্রয়োজন বিশেষভাবে নির্বাচিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবেদিতপ্রাণ দলনেতা। দুর্ভাগ্যবশত নির্বাচন ছিল কিছুটা বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো এবং তাদের প্রশিক্ষণের পেছনে যথেষ্ট সময়ও দেয়া হয়নি। মুক্তিবাহিনীর অপারেশনের সময় নিম্ন পর্যায়ে দলনেতার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে।

একটি ব্রিগেড গঠনের লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকায় প্রাথমিক অপারেশনে নিয়োজিত পাঁচটির মধ্যে তিনটি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। পরবর্তীতে আরো তিনটি ব্যাটালিয়ন ও দুটি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স গঠন করা হয়। এতে অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। প্রকৃত মেধাসম্পন্ন যেসব দলনেতাকে গেরিলা যুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত ছিল, তাদেরকে এসব নিয়মিত বাহিনীতে আত্মীকরণ

করা হয়। সিলেটে ও চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসরমান বাহিনীর অংশ হিসেবে সীমান্ত এলাকায় বেশ কিছু অপারেশন তারা কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেছে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিয়মিত বাহিনী যে সাফল্য অর্জন করেছে, সেটাও উল্লেখযোগ্য। এই জনশক্তি ও উপযুক্ত অধিনায়কত্ব সুদক্ষ গেরিলাবাহিনী গঠনের কাজে লাগালে তা থেকে আরো ভাল ফল পাওয়া যেত। গেরিলাবাহিনী গঠনের চেয়ে ওসমানী নিয়মিত বাহিনী গঠনের ওপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন।

গেরিলা অপারেশনের জন্য প্রয়োজন সতর্ক পরিকল্পনা, ব্রিফিং, পরিচিতি ও নিয়ন্ত্রণ। সেক্টর হেডকোয়ার্টারগুলোতে এসব কাজের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষ জনশক্তি মুক্তিবাহিনী ছিল না। সংখ্যার প্রাচুর্য থেকেই বোঝা যায় যে, খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করা সম্ভব নয় এবং নিয়োগও যথাযথভাবে সংগঠিত ছিল না। লোক নিয়োগের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবানুগ ছিল না বলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিয়োগ ছিল বেশ বিক্ষিপ্ত। উপযুক্ত নেতৃত্ব ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে সিগন্যালিং ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভাবের কারণে সেসব এলাকায় অপারেশন চালানো মুক্তিবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্সের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। মুক্তিবাহিনীর কিছু অংশ পশ্চাদপসরণ করে সীমান্ত অঞ্চলের দিকে ফিরে আসে।

নিবেদিতপ্রাণ এবং প্রয়োজনে এককভাবে অপারেশন চালাবার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা ও দৃঢ়তা গেরিলাদের থাকতেই হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এসে তাদের কাজ সহজ করে দেবে এবং অপারেশনে পুরোপুরি নিয়োজিত হতে হবে না, এরকম একটা প্রবণতা গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে কখনো কখনো দেখা গেছে। এ ধরনের প্রবণতার একটি উদাহরণ হল, ময়মনসিংহ ও জামালপুরে পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে ইন্টারসেপ্ট করতে সিদ্দিকীর ব্যর্থতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাক্যিস (Maquis) টাইপে উত্থিত হতে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যর্থতা এর আরেকটি উদাহরণ।

তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশী বাহিনী ও গেরিলাদের সাফল্যের ভূমিকা অনেক। প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা এবং নিম্নপর্যায়ে দলনেতার অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তারা পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা দখল করা, বিভিন্ন ফরমেশন উড়িয়ে দেয়া এবং পাকিস্তানিদেরকে হেনস্থা করার ব্যাপারে তারা খুবই চমৎকারভাবে কাজ করেছে। পাকিস্তানিদের মনোবল মুক্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছিল। এমন এক প্রতিকূল পরিবেশ তারা সৃষ্টি করে যে, পাকিস্তানিদের চলাফেরা ও অন্যান্য কাজকর্ম করার ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের সুরক্ষিত আস্তানার মধ্যেই তারা নিজেদেরকে আটকে রাখে। মুক্তিবাহিনী ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোর সামগ্রিক ভূমিকা ছিল অসাধারণ। এরা বাঙালি জাতির গর্ব। পুরোদমে লড়াই শুরু হবার আগে এবং যুদ্ধের সময়ে তাদের অবদান অপরিসীম। স্বদেশভূমি স্বাধীন করার লক্ষ্যে যে মরণপণ লড়াই তারা করেছে, সেটার উপযুক্ত স্বীকৃতি অবশ্যই তাদের প্রাপ্য।

মার্কিন ও চীনা ভূমিকা

যুদ্ধ শুরুর আগে পুরোটা সময় ধরে চারপাশ জুড়ে সকলের মুখে মুখে সম্ভাব্য চীনা আক্রমণ নিয়ে কথাবার্তা শোনা গেছে। তিব্বতে অবশ্য কোনো ধরনের চীনা সেনাসমাবেশ দেখা যায়নি। ইস্টার্ন কম্যান্ডের ধারণা, চীনাদের ফরমেশন ও বিন্যাস তাৎক্ষণিক আক্রমণ রচনার উপযোগী নয়। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে হিমালয়ের অধিকাংশ গিরিপথই ব্যবহার করা অসম্ভব। অবশ্য সেনাপ্রধানের সোভিয়েত-পরামর্শপুষ্ট ধারণা ছিল এরকম যে, যুদ্ধ শুরু হলেই চীনারা হস্তক্ষেপ করবে। আর এসব সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি জেনারেল মানেকশ'র ওপরে অন্যায় রকমের প্রভাব ফেলত। এই বিভ্রান্তির মধ্যে মার্কিনীরাও নতুন মাত্রা যোগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা (L K Jha)-কে ডেকে নিয়ে হেনরি কিসিঞ্জার (Henry Kissinger) হুঁশিয়ার করে দেন যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করলে ওয়াশিংটন ভারতকে সাহায্য করবে না। ভারত সরকারের কাছে পাঠানো জরুরি এক টেলিগ্রামে ঝা জানান যে, কিসিঞ্জার যেহেতু 'জানেন না চীনারা কী করবে, তারা পাকিস্তানের পক্ষে যে আসবে না — এমন ধারণা নিয়ে বসে থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ নয় (...did not know what the Chinese would do, it would be unsafe for us to assume that they would not come to Pakistan's help)'।

সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, অথচ ঢাকা আক্রমণের জন্য তখন পর্যন্ত সৈন্যের সংস্থান করা হয়ে ওঠেনি। বিষয়টি নিয়ে — বিশেষত ১৬৭ ও ৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের জন্য যে কর্ম-পরিকল্পনা আমরা নির্ধারণ করে রেখেছিলাম, তা নিয়ে আমি ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্সের সাথে আলোচনা করি। ১২৩ মাউন্টেন ব্রিগেডও রিজার্ভ হিসেবে চলে এসেছে। নভেম্বরের শেষের দিকে আর্মি কম্যান্ডারের কাছে এসব ব্রিগেডের গতিপথ ও তাদের কর্ম-পরিকল্পনা আমি ব্যাখ্যা করি। তিনি আমাকে এসব বিধি মোতাবেক আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে জানাতে বলেন। আমি তাঁকে জানাই যে, ইন্দর গিল এসব জানেন, কিন্তু জেনারেল মানেকশ'কে তিনি কিছু জানাননি। লড়াই শুরু হলে চীনারা হস্তক্ষেপ করবেই, মানেকশ' এরকম ধারণা নিয়ে থাকায় তিনি কিছুতেই চীন-সীমান্ত থেকে সৈন্য সরাতে রাজি হবেন না। এরপরে তিনি বললেন যে, তিনি নিজেই মানেকশ'কে একটি বার্তা পাঠাবেন। এই কাজটি না করার জন্য আমি আবার তাঁকে

অনুরোধ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি মানেকশ'কে একটি ব্যক্তিগত সিগন্যাল পাঠান। দুই ঘণ্টার মধ্যে এর উত্তর এল:

> যে কোনো নারীর চেয়ে বেশি যত্নে আমি আপনাদেরকে লালনপালন করেছি। কে আপনাদেরকে এই ব্রিগেডগুলো সরাতে বলেছে? শিগ্‌গির এগুলোকে আগের জায়গায় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করুন (I have nursed you better than any woman. Who told you to move these brigades down? You will move them back at once.)।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার সেথনা ও লেফ্‌টন্যান্ট কর্নেল দাল সিং (Dal Singh) এই জবাব নিয়ে আমার অফিসে এলেন। আমি সেটা আর্মি কম্যান্ডারের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আর্মি কম্যান্ডার যখন আমার অফিসে ঢুকলেন, তাঁকে তখন কিছুটা বিধ্বস্ত দেখা যাচ্ছিল। আমি তাঁকে দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে বললাম, "বিষয়টি নিয়ে আমি ডিএমও ইন্দর গিলের সাথে কথা বলব।" ইন্দরকে আমি ফোন করে বললাম, "ব্রিগেড এই মুহূর্তে সরানো অসম্ভব, কারণ অপারেশনের জন্য তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে।" অন্যদিকে আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে, চীনারা যে এতে হস্তক্ষেপ করবে না, এই বিষয়টি আমরা ধীরে ধীরে মানেকশ'কে বোঝাতে সক্ষম হব। ইন্দর গিল রাজি হলেন, কিন্তু আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে আমি সৈন্যদেরকে পাঠাব না। পরবর্তীতে ডিসেম্বরের ৮ তারিখে বারংবার অনুরোধে মানেকশ' যখন বুঝলেন যে, চীনারা এতে হস্তক্ষেপ করবে না, তখন তিনি আমাদেরকে ১৬৭ ও ৫ মাউন্টেন ব্রিগেড ব্যবহারের অনুমতি দেন। এর আগে ইন্দরের অনুরোধে ডিসেম্বরের ৬ তারিখে ওয়েস্টার্ন কম্যান্ডকে আরো সুসংহত করার লক্ষ্যে ১২৩ মাউন্টেন ব্রিগেডকে বিমানযোগে সেখানে পাঠানো হয়। আমাদের বাহিনী সেখানকার অপারেশনে তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, যথাযথভাবে দায়িত্বপালন এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা যে ইন্দরের আছে, তা তিনি আরেকবার প্রমাণ করলেন।

এর মধ্যে বিশ্ব-জনমত ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আসতে শুরু করেছে। বিদেশী সাংবাদিকরা শরণার্থী শিবির ঘুরে দেখেছেন এবং বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে ঘুরে এসেছেন। পাকিস্তানিদের নৃশংসতা দেখে তাঁরা বেদনায় আপ্লুত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের পক্ষে নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। প্রায় সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র ও চীন অবশ্য পাকিস্তানকে সমর্থন করে।

জাতিসংঘের অবস্থানও ছিল পাকিস্তানঘেঁষা। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের সময় হিমালয় সীমান্ত অঞ্চলে চীন আমাদেরকে স্রেফ ভয় দেখাবার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে চীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবারেও আমরা বুঝতে পারছি না। ৬ জুলাই ইসলামাবাদ যাবার পথে ড. হেনরি কিসিঞ্জার দিল্লীতে অবতরণ করেন। ইয়াহিয়া খান

ড. কিসিঞ্জারের চীন সফরের ব্যবস্থা করেন। কিসিঞ্জার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফরের ব্যবস্থা করেন।

পাকিস্তানের প্রতি মার্কিনী সমর্থন বাড়াতে এবং জাতিসংঘে চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে পাকিস্তানি কূটনৈতিক উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক স্থাপনের জন্য উ থান্ট (U Thant) একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের এই প্রস্তাবনা আমাদের জন্য বেশ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ওপরে পশ্চিম পাকিস্তানি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানের পক্ষে চীন ও আমেরিকার সমর্থন বাড়ার সাথে সাথে পাকিস্তানের সাথে আমাদের সম্ভাব্য যুদ্ধে চীনা হস্তক্ষেপের আশঙ্কাও বেড়ে যায়। এই সঙ্কটের পুরোটা সময় জুড়ে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার স্বাক্ষর-রাখা শ্রীমতি গান্ধীর উদ্যোগে ডি পি ধরের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী চুক্তি প্রণয়নের ব্যাপারে মস্কোর মনোভাব জানার লক্ষ্যে কিছু বার্তা পাঠানো হয়। ডি পি ধর ১৯৬৯ সালে যখন মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, সেই তখন থেকেই তিনি এই চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। সোভিয়েত-পক্ষ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া যায়, এবং তা খুবই দ্রুত। মৈত্রী চুক্তির এমন একটি খসড়া তৈরি করা হয়, যা ভারতের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উপযুক্ত এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব বা জোটনিরপেক্ষ নীতি অক্ষুণ্ন রেখেই এর বাস্তবায়ন সম্ভব। এটি অবশ্যই একটি বড় কূটনৈতিক সাফল্য। ধারা ৯-এর মধ্যে এই চুক্তির মূল সুর নিহিত আছে, যেখানে বলা হয়েছে, "যে কোনো পক্ষ অন্য কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হলে বা তেমন কোনো হুমকির সম্মুখীন হলে এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষসমূহ এ ধরনের হুমকির কারণ অপসারণ করে শান্তি ও তাদের রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে পরস্পরের সাথে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।" এটা ভারতকে নিঃসন্দেহে চীন ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক হাবভাব ও হুমকির উপযুক্ত জবাব দেবার ব্যাপারে অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে (পরিশিষ্ট ১৭ দ্রষ্টব্য)।

ইতোমধ্যে দিল্লীস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কলকাতার মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব এ কে রায় (A K Ray)-কে এই দায়িত্ব দিয়ে কলকাতায় পাঠানো হয়। দক্ষ অফিসার রায় সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ ও পরিস্থিতির সাথে ভালভাবেই পরিচিত ছিলেন। কথাবার্তা ও আচরণে তিনি ছিলেন খুবই বাস্তববাদী এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশী নেতৃত্বের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হন।

ডি পি ধর ছিলেন পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান। পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে রীতিমতো উপেক্ষা করে ডি পি ধর, পররাষ্ট্র সচিব টি এন কাউল (T N Kaul), পি এন হাকসার (P N Haksar) ও পি এন ধর (P N Dhar)-এর সমন্বয়ে গঠিত অত্যন্ত দক্ষ ও প্রভাবশালী সোভিয়েতঘেঁষা এই গ্রুপটি যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। শক্তিশালী এই দলটিকে 'কাশ্মিরী মাফিয়া' নামে অভিহিত

করা হয়। মুজিবনগরের সোভিয়েতঘেঁষা অংশটির ব্যাপারে ডি পি কিঞ্চিৎ দুর্বল ছিলেন। অগাস্টের শেষভাগ থেকে শুরু করে ডি পি ধর যখনই কলকাতায় এসেছেন, গ্র্যান্ড হোটেলের স্বত্বাধিকারীর স্যুইটে থেকে কাজকর্ম করেছেন। এর আগে কাশ্মিরেই ডি পি ধরের সাথে আমার পরিচয় হয় এবং আলোচনার জন্য বেশ কয়েকবার তাঁর স্যুইটে তিনি আমাকে ডেকেছেন। আমাদের আলোচনা চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং অন্য অনেক ছোটখাট বিষয়ও আলোচনার মধ্যে ঢুকে যেত। কমিউনিস্টদের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ অদ্ভুত ধরনের। তাঁর মতে সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্টরা 'ভাল লোক' হলেও পূর্ব পাকিস্তানের মার্কসবাদীরা তেমন নয়। এই গ্রুপকে যে রাজনৈতিক বা সামরিকভাবে কোনো ধরনের সহায়তা করা উচিত নয়, সেটা আমি বারবার আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁর উত্তর ছিল, "জেক, আমি জানি আমি কী করছি।" সবসময় তিনি এ কে রায়কে এড়িয়ে চলতেন, যেটা নিঃসন্দেহে এক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। সারেন্ডারের অল্প কয়েকদিন পরে কলকাতা এয়ারপোর্টের ভিআইপি লাউঞ্জে ধরের সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাঁকে পরামর্শ দিই যে, এই সময়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি চুক্তি হওয়া প্রয়োজন, যাতে তিনটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে: সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, রাষ্ট্রসীমানার যৌক্তিকতা নির্ধারণ, এবং চট্টগ্রাম বন্দরসহ রেল ও অভ্যন্তরীণ জলপথে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ট্রানজিট ব্যবহারের অধিকার। ডি পি তাঁর ভুবনভোলানো হাসি নিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, "জেক, আপনি সৈনিক। আর এই সমস্যাগুলো রাজনৈতিক। পরে যথাসময়ে এসবের সমাধান করা যাবে।" আমি উত্তর দিলাম যে, এটাই উপযুক্ত সময় এবং এর পরে এ বিষয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো কঠিন হয়ে যাবে। তিনি আবার হাসলেন। এই আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কোনো কথা বলেননি।

সেপ্টেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনীর অপারেশনগুলো আগের তুলনায় অনেক সংগঠিত ও কার্যকর হতে শুরু করে এবং ক্রমশ তীব্রতা লাভ করে। তাদের কার্যকলাপ ঢাকাস্থ পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনীর সেইসব লোকদের মনোবল একেবারে ভেঙে দিতে শুরু করে, ইতোমধ্যেই যাদের মোহমুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

জাতিসংঘ ও চীনের সাথে পাকিস্তানের কূটনৈতিক তৎপরতা তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলপ্রসূ হয়নি। ভারত তাদেরকে আক্রমণ করলে চীনের তরফ থেকে ভারত আক্রমণের কোনো নিশ্চয়তা লাভ করতে তারা ব্যর্থ হয়। চীনের ভূমিকা ছিল দ্বিমুখী। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সহজাত প্রজ্ঞা দিয়ে চীনারা বাংলাদেশের আসন্ন স্বাধীনতার বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছিল এবং তারা এই নতুন দেশের সাথে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়নি। মার্কিন ভূমিকা ছিল আরো জটিল। ড. কিসিঞ্জার দাবি করেন যে, পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন যে অবধারিত, এটা তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভারতকে জানিয়েছেন, যদিও দিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিং (Keating) ৬ জানুয়ারি ১৯৭২-এ

*নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন*কে যে সাক্ষাৎকার দেন, তাতে এধরনের কোনোকিছুর ব্যাপারে তাঁর অবগতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আমি ওয়াশিংটনস্থ তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল কে ঝাকেও এই প্রশ্ন করলে তিনিও এব্যাপারে তাঁর অজ্ঞতা ব্যক্ত করেন (পরিশিষ্ট ১৯ দ্রষ্টব্য)।

রাষ্ট্রদূত কিটিং এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম পরিদর্শন করেন। আর্মি কম্যান্ডার ট্যুরে থাকায় আমি তাঁকে বর্তমান পরিস্থিতি — বিশেষত শরণার্থী সমস্যা ও পাকিস্তানিদের ব্যাপক নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করি। তাঁকে আমি বলি যে, আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশের সরকার কেন একটি নিষ্ঠুর উৎপীড়নকারী সামরিকতন্ত্রকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, যারা পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের ফলাফলকে সম্পূর্ণ অসম্মান করেছে। কূটনীতিক হিসেবে কিটিং ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত। তাঁর সংবেদনশীল মুখ একটু লাল হয়ে উঠলেও তিনি আমার কথায় বিরক্তি প্রকাশ করলেন না বা তাঁর সরকারের অবস্থানের পক্ষেও কোনো কথা বললেন না। সম্ভবত স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা ড. কিসিঞ্জারের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিক্সনের পাকিস্তানপ্রীতির বিরোধিতা করার মতো ঘনিষ্ঠ ছিল না।

লড়াই

৩ ডিসেম্বর বিকেল আনুমানিক পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে পশ্চিম ভারতে অবস্থিত আমাদের এয়ারফিল্ডের ওপরে পাকিস্তানি এয়ার ফোর্স বোমাবর্ষণ করে। এই আক্রমণ কয়েকটি এয়ারফিল্ড পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও আমাদের ক্ষয়ক্ষতি খুব সামান্যই হয়েছিল। আজ পর্যন্ত আমি এই আক্রমণের পদ্ধতি ও টাইমিংয়ের কোনো যৌক্তিকতা বুঝে উঠতে পারিনি। রিচার্ড সিসন (Richard Sisson) ও লিও রোজ (Leo Rose) তাঁদের লেখা *ওয়ার অ্যান্ড সিজেশন (War and Secession)* বইতে লিখেছেন যে, ইয়াহিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার পেছনে মূলত তিনটি কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলোতে পাকিস্তান সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হত, তাতে এই সেনানায়ক ক্ষুব্ধ হয়ে থাকবেন। কারণ সেখানে পাকিস্তানিদেরকে ভারতের দ্বারা শক্তিহীন জড়বুদ্ধি বা অর্বাচীন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক জনমত ও প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানের পক্ষে যায়নি। তৃতীয়ত, কোনো ব্যবস্থা না নিলে জনগণ 'ফাঁসিতে ঝোলাবে' বলে ইয়াহিয়াকে ভুট্টো উপহাস করেন। অবশেষে ৩০ নভেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ডি-ডে (D-Day) হিসেবে নির্ধারণ করা হয় ২ ডিসেম্বর, কিন্তু পরবর্তীতে তা একদিন পিছিয়ে যায়।

৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যে ছটায় আমি অফিসেই ছিলাম। এর মধ্যে জেনারেল মানেকশ'র একটি টেলিফোন পাই। তিনি আমাকে বললেন যে, পাকিস্তানি বিমান থেকে পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের এয়ারফিল্ডগুলোর ওপরে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে এবং কলকাতার রাজভবনে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীকে আমি যেন এই সংবাদ জানাই। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা আমাদের সৈন্য পরিচালনা করব কি না, আমি তাঁকে সেটা জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীকে এটাও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে শিগ্‌গিরই তিনি অফিশিয়াল অর্ডার ইস্যু করবেন বলে আমাকে জানান। দুই কামরার মাঝের স্যুইং ডোর ঠেলে জেনারেল অরোরার কামরায় ঢুকে এই আলোচনার কথা তাঁকে জানালাম। এই সংবাদ প্রধানমন্ত্রীকে জানাবার দায়িত্ব মানেকশ' যদিও আমাকে দিয়েছেন, আমি বললাম যে, তাঁর পক্ষেই এটা যথাযথ হবে এবং এই ফাঁকে আমি প্রয়োজনীয় কয়েকটি অর্ডার ইস্যু

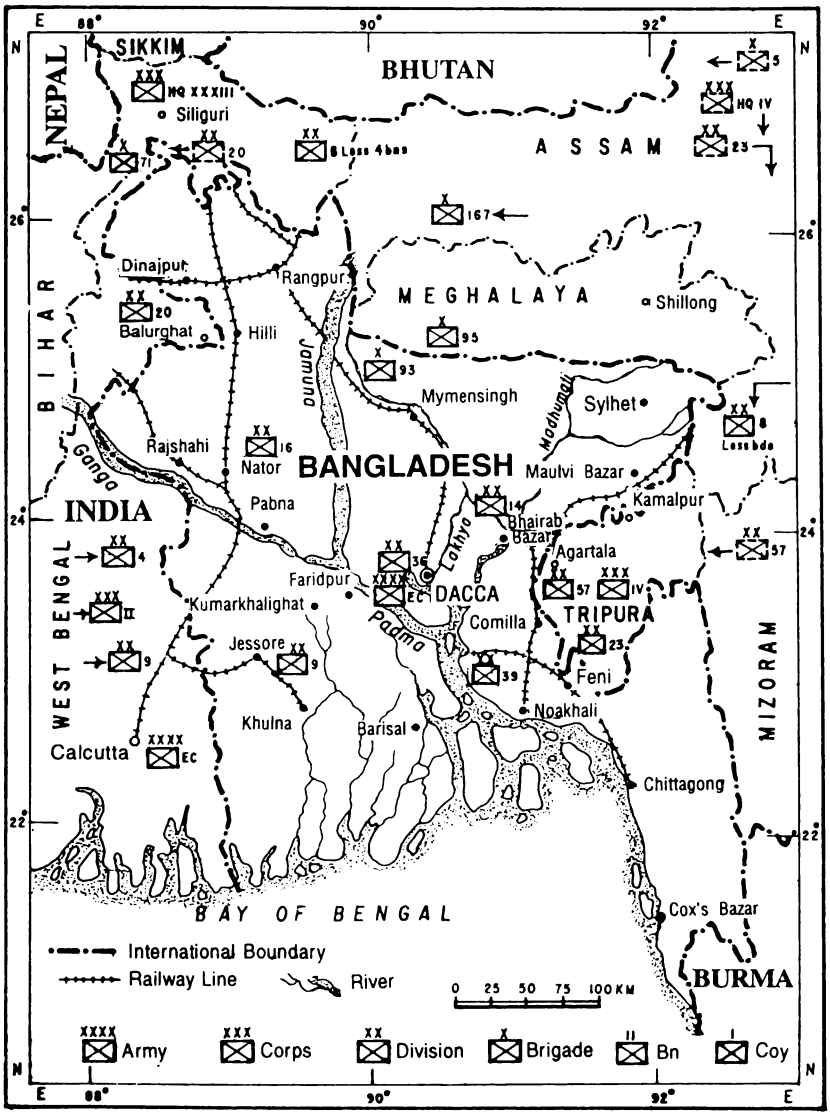

The external boundaries of India depicted in this map are neither correct nor authentic.

মানচিত্র ১ প্রাথমিক সেনাবিন্যাস এবং সৈন্য সমাবেশের এলাকায় সৈন্য চালনা

এবং বিমান বাহিনীর সমর্থন লাভের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। এতে সম্মত হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গেলেন।

সৌভাগ্যবশত স্টাফদেরকে একসাথে পেতে কোনো সমস্যা হয়নি, কারণ সকলেই বাড়তি সময় ধরে কাজ করছিল। অ্যাড্‌ভান্সড্ এয়ার হেডকোয়ার্টার্সে জানানো হয় যে, আমি জেএএওসি (JAAOC)-তে আসছি এয়ার সাপোর্টের সমন্বয় সাধনের জন্য। স্টাফ এবিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্ডার ইস্যু করে। সমস্ত কোর কম্যান্ডারকে আমি ফোনে ব্রিফ করি। জেএএওসি-তে বিমান বরাদ্দের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং বিমান অভিযানের জন্য বাহিনীতে সেনাবরাদ্দ করা হয়। পাকিস্তানি এয়ারফিল্ডসমূহের রানওয়ে ছিল আমাদের প্রথম লক্ষ্য। আনুমানিক রাত আটটা তিরিশ মিনিটে আক্রমণ শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সমন্বয় শেষ হয়। অরোরা ঠিক তখনই প্রধানমন্ত্রীকে ব্রিফ করে ফিরেছেন। গৃহীত প্রস্তুতির কথা আমি তাঁকে জানালে সকলের মধ্যে স্বস্তি নেমে আসে। সৈন্যরা অধীর আগ্রহে আক্রমণ শুরুর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সে আমাদের জানামতে অবকাঠামো তৈরি ছিল, রসদ ও সরবরাহ-ব্যবস্থাও যথাসম্ভব সম্পন্ন ছিল এবং আক্রমণ-পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়েছিল অনেক খুঁটিনাটি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে, যা নিয়ে আলোচনা ও 'ওয়ার গেম' করা হয়েছে। অরোরা ছিলেন খুবই উৎফুল্ল। তিনি তাঁর এডিসি (ADC)-কে মেস থেকে এক বোতল হুইস্কি আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমরা বুঝে নিলাম যে, আগামী বেশ কিছুদিন আর বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যাবে না।

আমরা সকলে যখন খানিকক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে *নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স (New York Times)*-এর প্রতিবেদক সিডনি শ্যানবার্গ (Sydney Schanberg)-এর ফোন পাই। শ্যানবার্গ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তানি আক্রমণের জবাবে আমরা কী করতে যাচ্ছি। হালকা সুরে তাঁকে আমি জানালাম যে, আমরা পানভোজনে ব্যস্ত আছি। তিনি জানতে চাইলেন, আমরা শঙ্কিত কি না। উত্তরে তাঁকে বললাম, ইস্টার্ন আর্মি শিগ্‌গিরই বাংলাদেশ স্বাধীন করে ফেলবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের প্রথম যে বাহিনী ঢাকায় যাবে, তিনি সেটার সাথে থাকার অনুমতি ও প্রতিশ্রুতি চাইলেন। এ বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব বলে তাঁকে কথা দিলাম। পরে যুদ্ধের চূড়ান্ত অধ্যায়ে ৪র্থ কোরের টহলদার বাহিনীর সাথে শ্যানবার্গ ঢাকায় প্রবেশ করেন।

এর আগে ৩ ডিসেম্বর সকালে আমাদের ইস্টার্ন ন্যাভাল কম্যান্ডের ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যান্ডিং ইন চিফ অ্যাডমিরাল কৃষ্ণণ ফোনে আমাকে জানান যে, একজন মৎস্যজীবী বিশাখাপত্‌নম বন্দরের প্রবেশমুখে পাকিস্তানি সাবমেরিনের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছে। বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের সময়ে পাকিস্তানি সাবমেরিন *গাজী (Ghazi)*-র সিগন্যাল ইন্টারসেপ্ট আমাদের কাছে ছিল। এই তথ্য আমরা আগেই ভারতীয় নৌবাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কৃষ্ণণ বলেন যে, মাইন পাততে গিয়ে ১ অথবা ২ ডিসেম্বর

গাজী-র ধ্বংস হওয়া দৈব ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ঘটনার ফলে নৌবাহিনীও আক্রমণ শুরুর আরো বেশি স্বাধীনতা লাভ করে। পরদিন, অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর সকালে আবার ফোন করে কৃষ্ণণ জিজ্ঞাসা করলেন, *গাজী*-র ধ্বংস হবার ঘটনাটি আমরা দিল্লীতে জানিয়েছি কি না। জবাবে আমি বললাম, তিনি জানাবেন ভেবে আমি আর সেটা করিনি। আশ্বস্ত হয়ে তিনি আমাকে অতীতের তিক্ত আলোচনার কথা ভুলে যেতে অনুরোধ করলেন। নৌবাহিনীর অফিশিয়াল ভাষ্যে পরবর্তীতে বলা হয় যে, ৪ ডিসেম্বরে ইস্টার্ন ফ্লিটের জাহাজগুলো *গাজী*-কে ডুবিয়ে দিয়েছে।

যুদ্ধের অগ্রগতি

পশ্চিম সেক্টর

যশোরের পতন

১৯৭১-এর ৪ ডিসেম্বরে পুরোদমে লড়াই শুরু হতে না হতেই ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের পুরোটাই পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই অঞ্চলের নিচু এলাকাগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, চৌগাছা অঞ্চলের সৈন্যদেরকে যশোরে সরিয়ে এনে এবং রাজশাহী অঞ্চল থেকে বিমানে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য এনে যশোরের প্রতিরক্ষা আরো দৃঢ় করা হয়। কাজেই ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা ভেদ করার লক্ষ্যে তাদের নিরাপত্তাব্যূহের ওপরে বারংবার আঘাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর আগে ২৮ নভেম্বরেই আমরা পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, বয়রা অঞ্চলে ডিভিশনটি তাদের আত্মরক্ষামূলক অবস্থান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনে অগ্রসর হয়ে চুয়াডাঙ্গা~হাকিমপুর~যশোর এবং মিঠাপুকুরিয়া~লেবুতলা~যশোর অক্ষরেখা ব্যবহারের ভান করতে পারে। কিন্তু পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কায় বাস্তবে কাজটা তারা বেশ ধীর গতিতে করতে থাকে। এই অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৫ ডিসেম্বর ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্স মেজর জেনারেল ইন্দর গিলের সাথে কথা বলে আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের রিজার্ভ হিসেবে রাখা এক-ব্যাটালিয়ন-গ্রুপ-কম ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেড, টাঙ্গাইলে যেটার অবতরণ করার কথা, আমাদেরকে ব্যবহার করতে দেবার অনুরোধ করি। বরাবরের মতো সহযোগিতাপূর্ণ ইন্দর তৎক্ষণাৎ এতে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু শর্ত দেন যে, প্রয়োজন হলে তাদেরকে আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের নিয়ন্ত্রণে ফেরত দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি রাজি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেড কম্যান্ডার ব্রিগেডিয়ার ম্যাথু টমাস (Mathew Thomas)-কে ডেকে পাঠাই এবং আক্রমণরেখা নির্দেশ করে পেছন থেকে যশোর দখল করার দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে দিই। তার জন্য আমরা বাড়তি একটি ব্যাটালিয়নের ব্যবস্থাও করা হয়। ২য় কোরের লেফ্টন্যান্ট জেনারেল রায়নাকে আমি এ সম্পর্কে অবহিত করি এবং টমাসকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করতে বলি। এক-ব্যাটালিয়ন-কম ব্রিগেডটি তার কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ৬ ডিসেম্বর রওয়ানা দেয়। ইতোমধ্যে ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেড এসে পৌঁছানোর আগেই অবশ্য ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন যশোর আক্রমণের জন্য

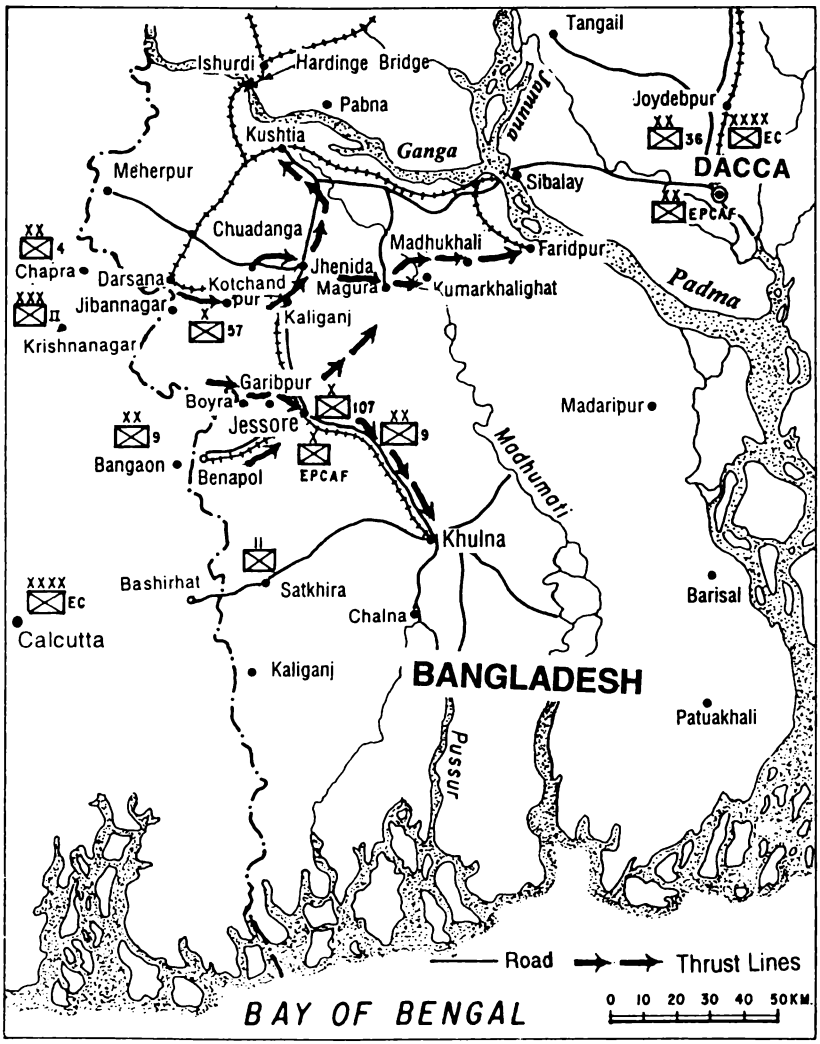

The external boundaries of India depicted in this map are neither correct nor authentic.

মানচিত্র ২ পশ্চিম সেক্টর

উদ্দীপিত হয়ে থাকে। পাকিস্তানিরা এর আগেই যশোর খালি করে তাদের সুরক্ষিত ঘাঁটি দৌলতপুর, খুলনা এবং মধুমতি নদীর পূর্বপারে সরে যাওয়ার ফলে ৬ ডিসেম্বরে চুয়াডাঙ্গা~যশোর রোডে অবস্থিত দুর্গা বরকতি এলাকা দখলের কাজে এই ব্রিগেড গ্রুপকে ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়েনি। ৭ ডিসেম্বর বিকেলের মধ্যেই আমরা যশোরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করি। সিগন্যাল ইন্টারসেপশনের কাজে নিয়োজিত নিয়াজির দল আমাদের ৫০ প্যারা ব্রিগেডের চলাচল-সংক্রান্ত সিগন্যাল ধরতে পারলেও সঠিকভাবে সেটার মর্মোদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। দমদম এয়ারপোর্টে ৫,০০০ ছত্রীসেনা দেখা গেছে, সিবিএস (CBS) রেডিওর প্রচারিত এই খবর থেকে এক ব্যাটালিয়ন গ্রুপ এয়ারড্রপের পর নিয়াজির ধারণা জন্মায় যে, ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেড পুরোটাই টাঙ্গাইলে নেমেছে। ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের কথা ছিল যে, ফরিদপুর আক্রমণে ৪ মাউন্টেন ডিভিশনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তারা যশোর থেকে মাগুরাতে সৈন্য পাঠাবে। এটা না করে ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন মূল পরিকল্পনার ধারার বিপরীতে তার বাহিনীসমূহ পুনরায় একত্র করে কিঞ্চিৎ বিরতির পরে গতি পরিবর্তন করে খুলনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে আমরা ৫০ প্যারা ব্রিগেডকে মাগুরা অক্ষরেখা ধরে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিই। এতে এই ব্রিগেডের একটি ব্যাটালিয়নে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ৪ মাউন্টেন ডিভিশনও মাগুরা দখলের জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল।

খুলনার অচলাবস্থা

যশোর দখলের পর ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ৩২ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড খুলনার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। শত্রুরা আমাদের অগ্রসরকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য তাদের সুরক্ষিত এলাকা রামনগর, সিংলা, নওয়াপাড়া ও ফুলতলায় অজস্র ঘাঁটি গেড়ে রেখেছিল। রাস্তার দুপাশে ছিল জলাভূমি। শত্রুরা সরে যাবার আগে ব্যাপক হারে ব্রিজ ও কালভার্ট ধ্বংস করে যায়। তাদের তৈরি করা বাধাগুলো অবশ্য আমরা একের পর এক হটিয়ে দিই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শত্রুদেরকে বেষ্টন করে বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও সামগ্রিকভাবে আমাদের অগ্রগতি ছিল শম্বুকগতিসম্পন্ন। শত্রুদের প্রধান প্রতিরক্ষাকেন্দ্র দৌলতপুরে আমরা তাদের মুখোমুখি হই ১১ ডিসেম্বর। দৌলতপুর খুলনারই একটি অংশ এবং এই দুইয়ে মিলে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ একটি সরু বেল্ট তৈরি করেছে। তাৎক্ষণিকভাবে এটাকে পাশ কাটানোর কোনো উপায় ছিল না। কারণ এর পশ্চিমপাশে জলা আর পূর্বপাশে ভৈরব নদ। শেষ পরিখা-দুর্গে এসে মনে হল যে, পাকিস্তানিরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। এর ফলে দৌলতপুর ও খুলনা দখলের অপারেশন এক দীর্ঘ ক্লান্তিকর কঠিন প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তানিরা প্রতি ইঞ্চি জমির দখল রাখার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করে। আমাদের অপারেশনের প্ল্যান ও নির্দেশের সাথে সঙ্গতি না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন তার জন্য নির্ধারিত মাগুরা~ফরিদপুরমুখী আক্রমণরেখা অনুসরণ করার পরিবর্তে বিনা কারণে এই এলাকায় মনোনিবেশ করে। উপর্যুপরি আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের মুখে উভয়

পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৬ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত এই ডিভিশন পূর্ব শিরোমণি, পশ্চিম শিরোমণি ও শ্যামগঞ্জে মাত্র তিনটি শত্রু-এলাকা দখল করতে সমর্থ হয়। ১৬ ডিসেম্বর সকালে যশোরে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করার জন্য আমি যখন ঢাকায় যাবার পথে হেলিকপ্টার পরিবর্তন করছিলাম, তখন আমি লক্ষ করলাম, একটি পর্যবেক্ষণ বিমান কাজে যাবার জন্য তৈরি হয়ে প্রায় উড্ডয়নের পথে। আর্টিলারি পাইলট আমাকে জানায় যে, সে খুলনা অঞ্চলে যাচ্ছে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল স্থির করে আসার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে রেডিওসেট হাতে নিয়ে এই অপ্রয়োজনীয় লড়াই বন্ধের জন্য ডিভিশনকে নির্দেশ দিই। কারণ তারা ভাল করেই জানে যে, আগের দিন বিকেল থেকেই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে এবং আমি সমস্ত পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করতেই ঢাকায় যাচ্ছি। এর আগে ৪২ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড ভৈরব নদ অতিক্রম করে পশ্চিমপারে ঘাঁটি স্থাপন করে একটি আক্রমণ রচনার চেষ্টা করে। ১৩/১৪ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় নৌকায় করে প্রথম পারাপারটি সম্পন্ন হয়। ব্রিগেডটি প্রায় কোনো ধরনের বাধার মুখোমুখি না হয়েই দক্ষিণে নদীর মোহনা পর্যন্ত চলে যায়। দ্বিতীয় দফায় পারাপারের সময় অবশ্য তারা শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়ে। অপারেশন বাতিলের নির্দেশ দেবার পরও পারাপার অব্যাহত ছিল।

৪ মাউন্টেন ডিভিশন ৫ ডিসেম্বরে দর্শনা ও কোটচাঁদপুর দখল করে। কালীগঞ্জ দখল করে মেইন রোড ধরে ঝিনাইদহের দিকে অগ্রসর হবার পরিবর্তে ডিভিশনটি মাঠের মধ্যে দিয়ে উত্তরদিকে এক অসাধারণ আক্রমণ পরিচালনা করে। চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহের মধ্যবর্তী স্থানে এক ব্যাটালিয়ন স্কোয়াড্রনের একটি রোড ব্লক তারা স্থাপন করে। এই অবরোধ ভাঙার লক্ষ্যে শত্রুদের বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। অবরোধের পশ্চিমদিকে অবস্থিত সৈন্যদেরকে ঝিনাইদহে শক্তি বৃদ্ধির পরিবর্তে উত্তরে কুষ্টিয়ার দিকে পশ্চাদপসারণ করতে হয়। ৪১ মাউন্টেন ব্রিগেড অত্যন্ত দুরূহ কোটচাঁদপুর~তালসর~ঝিনাইদহ্ অক্ষরেখা ধরে ঝিনাইদহে প্রবেশ করে। ৭ ডিসেম্বর বিকেলে তুলনামূলকভাবে সহজে ঝিনাইদহের পতন হয়। মাগুরার পতন হয় ৮ ডিসেম্বর এবং এরপরে মধুমতি ফেরিঘাটের নাগাল আমরা পাই। ফলে এই অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত দুই কোম্পানি ছত্রীসেনা শেষ পর্যন্ত নামাবার প্রয়োজন পড়েনি।

মধুমতি অতিক্রম

মাগুরা দখলের পর ৬২ মাউন্টেন ব্রিগেড ফরিদপুরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। কুমার নদের ব্রিজ পাকিস্তানিরা উড়িয়ে দিয়ে মধুমতি নদীর পূর্বপারে সরে যায় এবং আমাদের অগ্রগতিকে বাধা দেবার জন্য নদীর পশ্চিমপারে মাজাইল এলাকায় কিছু সৈন্য রেখে যায়। শত্রুর বাধা অপসারণ করে মধুমতির পশ্চিমপারে ৬২ মাউন্টেন ব্রিগেড জমায়েত হয়। ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যার আগেই তারা নদী অতিক্রমের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলে। এর মধ্যে ৭ মাউন্টেন ব্রিগেড, যেটাকে কুষ্টিয়া পাঠানো হয়েছিল, পাকিস্তানিদের ভেঙে যাওয়া একটি ব্রিগেড এবং উত্তর দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণের

জন্য মোতায়েন করা এক স্কোয়াড্রন পাকিস্তানি লাইট ট্যাঙ্কের আক্রমণের মুখে পড়ে। কুষ্টিয়াতে শত্রুপক্ষের এত শক্তিশালী অবস্থান আগে বোঝা যায়নি। ফলে ৭ মাউন্টেন ব্রিগেড বেশ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যায়। আমাদের পাঁচটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় এবং অগ্রবর্তী বাহিনীর প্রচুর সৈন্য হতাহত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৪ মাউন্টেন ডিভিশনের প্রতিক্রিয়া হয় অপ্রয়োজনীয় রকমের বেশি। মধুমতি অতিক্রম করে আক্রমণরেখা ধরে অগ্রসর হবার পরিবর্তে ৯ ডিসেম্বরে তারা কুষ্টিয়া রওয়ানা দেয়। ১২ ডিসেম্বরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজে পৌঁছে দেখা গেল যে, পাকিস্তানিরা সরে গেছে এবং যাবার সময় ব্রিজটি তারা আংশিকভাবে ধ্বংস করে গেছে। ২য় কোর যদি আমাদের প্রস্তাবিত শিকারপুর~কুষ্টিয়া আক্রমণরেখা ধরে চলত, তাহলে এই অঘটন ঘটত না। এতে হার্ডিঞ্জ ব্রিজও অক্ষত থাকত, পাকিস্তানিরাও নদীর অপর পারে সরে যাবার সুযোগ পেত না। এর চেয়েও বড় ক্ষতি হল ডিভিশনটির মূল আক্রমণরেখায় ফিরে আসতে বিলম্ব। আমি মূল আক্রমণরেখায় মনোনিবেশ করার কথা জানালে রায়না আমাকে জানান যে, ৪ মাউন্টেন ডিভিশন যে তাদের প্রাথমিক দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে অন্য কাজে সৈন্য পাঠিয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি অবগত ছিলেন না। এর ফলে ফরিদপুরের দিকে যাত্রা শুরু করতে কমপক্ষে তিন দিন দেরি হয়ে যায় এবং এ কারণে গোয়ালন্দঘাট দিয়ে পদ্মা পার হয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হবার পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। মূল নির্দেশ অনুযায়ী ২য় কোর যশোর~মাগুরা অক্ষরেখায় ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনও সৈন্য পাঠাতে ব্যর্থ হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যস্থল খুলনা দখলের কাজে শক্তির অপচয় ঘটানোতেও তাদের মৌন সম্মতি ছিল। ৫ ডিসেম্বর হার্ডিঞ্জ ব্রিজের সামান্য উজানে আইডাব্লিউটি ফ্লোটিলা ২য় কোরের কাছে রিপোর্ট করে। ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় নিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত নৌবহরটি সেখানেই নোঙর করা ছিল। ফ্লোটিলাটি ফরিদপুরে নিয়ে যেতে রায়নাকে প্ররোচিত করলে আমাকে তিনি বলেন, উত্তরপার থেকে হালকা অস্ত্রের গোলাবর্ষণের কারণে সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। জবাবে তাঁকে বললাম, এই ব্রিজ পেরিয়ে বহুবছর আমি স্কুলে গেছি এবং আমি জানি যে, নদী এত প্রশস্ত যে এক পার থেকে অন্য পার নজরে আনা অসম্ভব। এ কথার কোনো জবাব তিনি দিলেন না। কিন্তু এটা বেশ ভালভাবেই বোঝা গেল যে, পদ্মা~ব্রহ্মপুত্রের বাইরে যেতে তিনি রাজি নন। ফলে এই সেক্টরের ঢাকা যাবার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয়নি (পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য)।

কুষ্টিয়া ও ভেড়ামারা শত্রুমুক্ত করার পর আবার মধুমতি অতিক্রমের দিকে মনোসংযোগ করা হয়। ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ৬২ মাউন্টেন ব্রিগেড নদীর পশ্চিম পারে এবং ৭ মাউন্টেন ব্রিগেড মাগুরাতে সমবেত হয়। ৫০০ গজ চওড়া এবং কোথাও কোথাও ৪০ ফুট গভীর নদীটি ছিল বেশ বড় এক বাধা। পূর্বদিকে প্রক্ষিপ্ত গভীর একটি কোণ ফেরিঘাটের পশ্চিমে একটি রাস্তা তৈরি করেছে, যেটা নদীর পার ঘেঁষে উত্তরে আনুমানিক দুই মাইল এবং দক্ষিণে চার মাইল জুড়ে বিস্তৃত। শত্রুরা তাদের ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের কর্নেল জেনারেল স্টাফের অধীনে গঠিত একটি অস্থায়ী ব্রিগেডে আনুমানিক দুটি দুর্বল ব্যাটালিয়ন এবং ১০৫ মিমি. কামানের একটি ব্যাটারি নিয়ে

পূর্বপারে তাদের দখল বজায় রেখেছিল। মূল পরিকল্পনা ছিল এ রকম, ৬২ মাউন্টেন ব্রিগেড উত্তরদিক দিয়ে নদী অতিক্রম করে শত্রুদের মূল অবস্থানের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে তাদেরকে ঘিরে রাখবে এবং মেইন রোডের ওপরে অবস্থিত কুমারখালী দখল করবে। আরো চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এ কাজে ৬২ ও ৭ — দুই মাউন্টেন ব্রিগেডকেই ব্যবহার করা হবে। এক দল এগোবে উত্তরদিক দিয়ে ও অন্য দল দক্ষিণদিক দিয়ে এবং সাঁড়াশি আক্রমণ করে ফেরিঘাটের পূর্বদিকের রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। প্রবল প্রতিরোধের মুখে ১৪/১৫ ডিসেম্বরে এই ব্রিগেড দুটি নদী পার হয়। ৭ মাউন্টেন ব্রিগেডের কাজটি ছিল বেশ দুরূহ। কারণ প্রাথমিক অবস্থা যাচাইয়ের মতো যথেষ্ট সময় তাদের হাতে ছিল না এবং নদীর তীরে জায়গামতো পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ মাঠের মধ্যে দিয়ে মার্চ করতে হয়। নদী অতিক্রমের কাজটি সফলভাবেই শেষ হয় এবং ১৫ ডিসেম্বর বিকেলের মধ্যে মেইন রোডে সাঁড়াশি আক্রমণ সম্পন্ন হয়। ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাবার কয়েকটি বেপরোয়া প্রচেষ্টার ব্যর্থ হয়ে যাবার পর শত্রুরা তাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও লোকজন নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। ৪ মাউন্টেন ডিভিশনকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যর্থতার কারণে এবং যশোর~মাগুরা আক্রমণরেখা থেকে সরে এসে খুলনা আক্রমণের জন্য ৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনকে মৌন সম্মতি দানের সাথে সাথে তারা ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ ফ্লোটিলা ব্যবহার না করায় এতে বেশ কিছুটা দেরি হয়। এর ফলে ঢাকা আক্রমণের সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়ে যায়।

উত্তর-পশ্চিম সেক্টর

৭১ মাউন্টেন ব্রিগেড ইতোমধ্যেই মিরগড় থেকে শুরু করে ৩ ডিসেম্বরের মধ্যেই পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও দখল করে নেয় এবং দক্ষিণদিকে তাদের অগ্রগতি অব্যাহত রেখে ৫ ডিসেম্বরে বীরগঞ্জ অধিকার করে ৬ ডিসেম্বর কান্তনগরে ঢ্যাপা নদীর ব্রিজের কাছে পৌঁছায়। আমাদের অনুমান অনুযায়ীই, ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে ঢ্যাপা ও আত্রাই নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় শত্রুরা শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। নদী অতিক্রমের চেষ্টা করলে আমাদের ব্রিগেডের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ৯/১০ ডিসেম্বর রাতে দিনাজপুরের দিকে শত্রুদের অবস্থানের দক্ষিণে একটি ব্যাটালিয়ন ব্লক স্থাপন করা হয়। কিন্তু এতে শত্রুরা খুব একটা বাধাগ্রস্ত হয়নি। কারণ তাদের রসদের সরবরাহ আসত পূর্বদিক থেকে। এরপরে মূল আক্রমণরেখা পূর্বদিক থেকে নীলফামারীর দিকে পরিবর্তনের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ব্রিগেডটি দিনাজপুর শহরের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ক্রমাগত টহলদল পাঠিয়ে আক্রমণের হুমকি অব্যাহত রাখে। আরো দশ মাইল উত্তরে গিয়ে ব্রিগেড ঢ্যাপা নদী অতিক্রম করে এবং ১৩ ডিসেম্বর খানসামা দখল করে। ১৪ ডিসেম্বর এর আরো চার মাইল পূর্বদিকের একটি এলাকা শত্রুমুক্ত করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর সকালের মধ্যে ব্রিগেড নীলফামারীর পাঁচমাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পৌঁছায়। ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডের অব্যাহত চাপের মুখে পাকিস্তানিরা শেষ পর্যন্তও দক্ষিণের বিপদাক্রান্ত অঞ্চলে তাদের

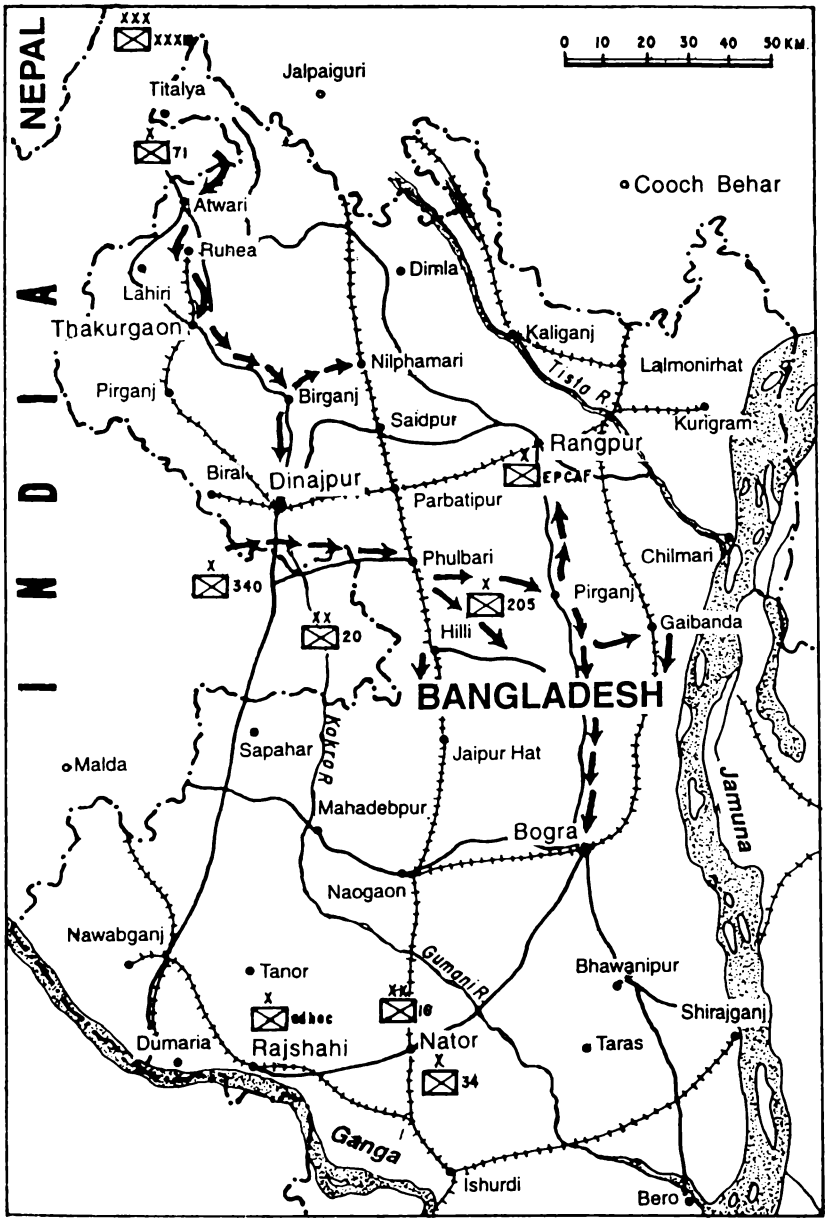

The external boundaries of India depicted in this map are neither correct nor authentic.

মানচিত্র ৩ উত্তর-পশ্চিম সেক্টর

শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের মজবুত ঘাঁটি সৈয়দপুর, রংপুর, পার্বতীপুর ও দিনাজপুর থেকে কোনো সৈন্য এনে সেই ঘাঁটিসমূহের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল করে ফেলেনি।

রংপুর আক্রমণের উপক্রম

৬ মাউন্টেন ডিভিশনের অধীনস্থ ৯ মাউন্টেন ব্রিগেড ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে কুড়িগ্রাম ও লালমণিরহাট দখল করে নেয় এবং অধিকৃত এলাকাসমূহ থেকে রংপুরের ওপরে আক্রমণের মহড়া অব্যাহত রাখে। পরবর্তীতে ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের অধীনস্থ ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেডকে আক্রমণাত্মক অপারেশনের জন্য বিশ্রাম দেবার লক্ষ্যে এই ব্রিগেডটি দিনাজপুরের দক্ষিণদিকের এলাকায় স্থানান্তর করা হয়।

হিলি~গাইবান্ধা 'কটিরেখা' অধিকার

২০ মাউন্টেন ডিভিশন বালুরঘাট পাহাড় অঞ্চলে দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৬৫ মাউন্টেন ব্রিগেডকে সেখানে স্থাপন করে। দক্ষিণদিক থেকে দিনাজপুরে অনুসন্ধান করার জন্য ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং মূল আক্রমণ রচনার জন্য ৬৬ ও ২০২ মাউন্টেন ব্রিগেড পীরগঞ্জে অবস্থান নেয়। ৬৬ মাউন্টেন ব্রিগেড ফুলবাড়ি দখল করে। অন্যদিকে হিলি~চরকাই অক্ষরেখা ধরে অগ্রসর হবার নির্দেশ থাকলেও ২০২ মাউন্টেন ব্রিগেড হিলি ছাড়িয়ে আর এগোতে পারেনি। ফলে ৬৬ মাউন্টেন ব্রিগেডকে চরকাই দখলেরও নির্দেশ দেয়া হয়, যা তারা ৪ ডিসেম্বরে সম্পন্ন করে। পীরগঞ্জের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে ৬৬ মাউন্টেন ব্রিগেড ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে নওয়াবগঞ্জ ও হাতঙ্গিঘাট এবং ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে কাঞ্চনধাঘাট দখল করে। পীরগঞ্জ অভিমুখে অভিযানের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে ৯ মাউন্টেন ব্রিগেড এসে ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেডকে অব্যাহতি দেয়।

৭ ডিসেম্বর পশ্চিম দিক থেকে ঘোড়াঘাটে পৌঁছানোর জন্য ৬৬ মাউন্টেন ব্রিগেডকে নির্দেশ দেয়া হয়, অথচ পীরগঞ্জ দখল করে ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড উত্তর-পূর্বদিক থেকে ঘোড়াঘাটে পৌঁছায়। পাকিস্তানিদের দুটি ইনফ্যান্ট্রি কোম্পানি ও এক ট্রুপ আরমারের নিয়ন্ত্রণাধীন ভাদুরিয়াতে এসে ৬৬ মাউন্টেন ব্রিগেড কঠিন প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। ভাদুরিয়াকে শত্রুমুক্ত করতে তাদের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত লেগে যায় এবং গণনা করে দেখা যায় যে, শত্রুদের ৮২ জন নিহত হয়েছে। আমাদের পক্ষের ১৭ কুমায়ুনেরও ৫৫ জন নিহত ও ৭২ জন আহত হয়।

৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ৭ ডিসেম্বরে পীরগঞ্জ, ৯ ডিসেম্বরে পলাশবাড়ি এবং ১০ ডিসেম্বরে তারা গাইবান্ধা ও ফুলছড়িঘাট দখল করে। এর ফলে একটি 'কটিরেখা (waistline)' তৈরি হয় এবং পাকিস্তানিরা দিনাজপুর~রংপুর অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আরো দক্ষিণে চাপ সৃষ্টি করে এই ব্রিগেড অসাধারণ এক আক্রমণ রচনার মাধ্যমে ১১ ডিসেম্বর গোবিন্দগঞ্জ দখল করে। তিনটি ট্যাঙ্ক ও পাঁচটি ১০৫ মিমি. গানসহ একটি সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ন তারা অধিকার অথবা

নিশ্চিহ্ন করে। এর মধ্যে পাকিস্তানিরা হিলি ও ঘোড়াঘাটের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাদের সুসংসহত অবস্থান থেকে পরিকল্পিতভাবে লড়াই করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১১ ডিসেম্বর হিলির ও ১২ ডিসেম্বর ঘোড়াঘাটের পতন হয়। যোগাযোগের পথ বের করার জন্য পীরগঞ্জেও পাকিস্তানিরা প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালায়, কিন্তু কোনো সাফল্য তারা লাভ করেনি।

বগুড়ার দিকে অগ্রযাত্রা

'কটিরেখা'র ওপরে দখল নিশ্চিত হবার পর বগুড়া দখলের জন্য দুটি অক্ষরেখা ধরে অগ্রসর হবার পরিকল্পনায় হাত দেয়া হয়: ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড এগোবে গোবিন্দগঞ্জ~বগুড়া আর ২০২ মাউন্টেন ব্রিগেড ঘোড়াঘাট~ক্ষেতলাল~বগুড়া অক্ষরেখা ধরে। একই সাথে ১৬৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের ওপরে জয়পুরহাটের দিকে কিছুটা এগিয়ে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। ১৩ ডিসেম্বর পাঁচবিবি দখল করতে গিয়ে পাকিস্তানিদের উদ্দীপিত প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেও ১৬৫ মাউন্টেন ব্রিগেড জয়পুরহাট দখল করে বিনা-বাধায়। ২০২ মাউন্টেন ব্রিগেডের একটি কলাম ঘোড়াঘাট~সৈয়দপুর~ক্ষেতলাল অক্ষরেখা ধরে এগোবার পথে প্রবল প্রতিরোধের মুখেও ১২ ডিসেম্বর ক্ষেতলাল দখল করে। রাস্তাঘাট ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে দেয়ার ফলে ক্ষেতলাল ছাড়িয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড অবশ্য খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। অসাধারণ আরো একটি অভিযানে এক কোম্পানি পাকিস্তানি সৈন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন ইছামতি নদীর ব্রিজ অক্ষতভাবে ১৩ ডিসেম্বর তারা দখল করে। বগুড়া পৌঁছানোর পথে করতোয়া নদীর ব্রিজও তারা অক্ষত অবস্থায় দখল করে। বগুড়ার দালানকোঠাসমৃদ্ধ এলাকা ২০৫ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের অবশিষ্ট অংশের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেখানে পাকিস্তানিরা শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে লড়াই করে। এর মধ্যে যুদ্ধ থেমে যায়। ৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড ২০ জন অফিসার ও ৫০০ জন অন্যান্য র‍্যাঙ্কের সৈন্যকে বন্দী করে এবং বগুড়ার উত্তরাংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

রংপুরের দিকে অগ্রযাত্রা

১৪ ডিসেম্বর ৬৬ মাউন্টেন ব্রিগেড ও তারপর ২০২ মাউন্টেন ব্রিগেডকে রংপুরের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেয়া হয়। হালকা প্রতিরোধের পর ১৫ ডিসেম্বর মিঠাপুকুর অধিকৃত হয় এবং অভিযান বন্ধের নির্দেশ এসে পৌঁছানোর আগেই দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণদিক থেকে ব্রিগেড দুটি রংপুরে প্রবেশ করে।

সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেও ২০ মাউন্টেন ডিভিশন অপারেশন সম্পন্ন করায় সবচেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর

সিলেট বিচ্ছিন্নকরণ

৮ মাউন্টেন ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেড ১ ডিসেম্বর থেকে কুলাউড়া ঘেরাও করে বসে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৬ ডিসেম্বর শত্রু নিধনের জন্য বিমান আক্রমণ চালালে কুলাউড়ার পতন হয়। ৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে মুন্‌শিবাজার দখল করে এবং ৭ ডিসেম্বর প্রবল প্রতিরোধের মুখে মৌলভিবাজারের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ছিন্ন করে ফেলে। পাকিস্তানি ৩১৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডকে মৌলভিবাজার থেকে সিলেটে সরে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। ১০ ডিসেম্বর ৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড বিনা-বাধায় সৈয়দপুর ও শেরপুরঘাট দখল করে সিলেটের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একমাত্র সড়ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপরে কোর রিজার্ভ হিসেবে তারা আগরতলায় সমবেত হয়।

৭ ডিসেম্বর ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেডের ৪/৫ জিআর (4/5 GR) হেলিকপ্টারে করে সুরমা নদী অতিক্রম করে সিলেটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যায়। পাকিস্তানিরা সিলেট থেকে বেসামরিক লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে শহরের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুসংহত করে। পাকিস্তানি ২০২ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের হাতে শহর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। মৌলভিবাজার থেকে পাকিস্তানি ৩১১ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড এসে সিলেট গ্যারিসনে যোগ দেয়। এতে করে সিলেটে তাদের শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ছয়টি ব্যাটালিয়ন, এক রেজিমেন্ট ১০৫ মিমি. গান এবং এক ব্যাটারি ১২০ মিমি. কামান।

পাকিস্তানি ৩১১ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড যে মৌলভিবাজার থেকে সিলেটে চলে আসতে পারে, এটা কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সে আমরা ধারণা করতে পারিনি। এতে আমরা বেশ অবাক হয়ে যাই। আমাদের ধারণা ছিল, এই ব্রিগেডটি মেঘনা নদীর ওপরের করোনেশন ব্রিজে হটে গিয়ে মেঘনা ক্রসিং ও ঢাকার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ়তর করবে। ওরা এটা করলে মেঘনা পেরিয়ে ৪র্থ কোরের অগ্রযাত্রা খুব কঠিন হত। তাদের সিলেট যাওয়া-সম্পর্কিত রেডিও ইন্টারসেপ্ট পেয়ে আমরা খুব আশ্বস্ত বোধ করি। এর অর্থ হল এই যে, এই ব্রিগেড দুটি এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সিলেটে থাকছে, যেখানে তাদেরকে অকেজো করে আটকে রাখা সম্ভব। যুদ্ধশেষে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আবদুল মজিদ কাজি (Abdul Majid Quazi)-র কাছে জানতে চাই, কেন তাঁরা এই ব্রিগেডটি সিলেটে নিয়ে গেলেন। জবাবে তিনি বলেন যে, সিলেট দখল করতে না দেবার ব্যাপারে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। নিয়াজির নগরদুর্গ-কৌশল এবং ডিভিশনাল কম্যান্ডার কর্তৃক তার প্রয়োগ পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে বহুধাবিভক্ত করে ফেলে আমাদের ঢাকা দখল সহজতর করে দেয়।

দক্ষিণে দাউকি থেকে অগ্রসরমান ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্ট (5/5 GR)-কে ৮ মাউন্টেন ডিভিশনের অধীনে আনা হয় এবং ৭ ডিসেম্বর জৈন্তিয়াপুর–দরবাস্ত–সিলেট রোড ধরে সিলেটের দিকে এগোতে শুরু করে। এই ব্যাটালিয়ন চান্দঘাট দখল করে উত্তর-পূর্বদিক থেকে সিলেটে প্রবেশ করে। ১ ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন সুসম্পন্ন এক অভিযান

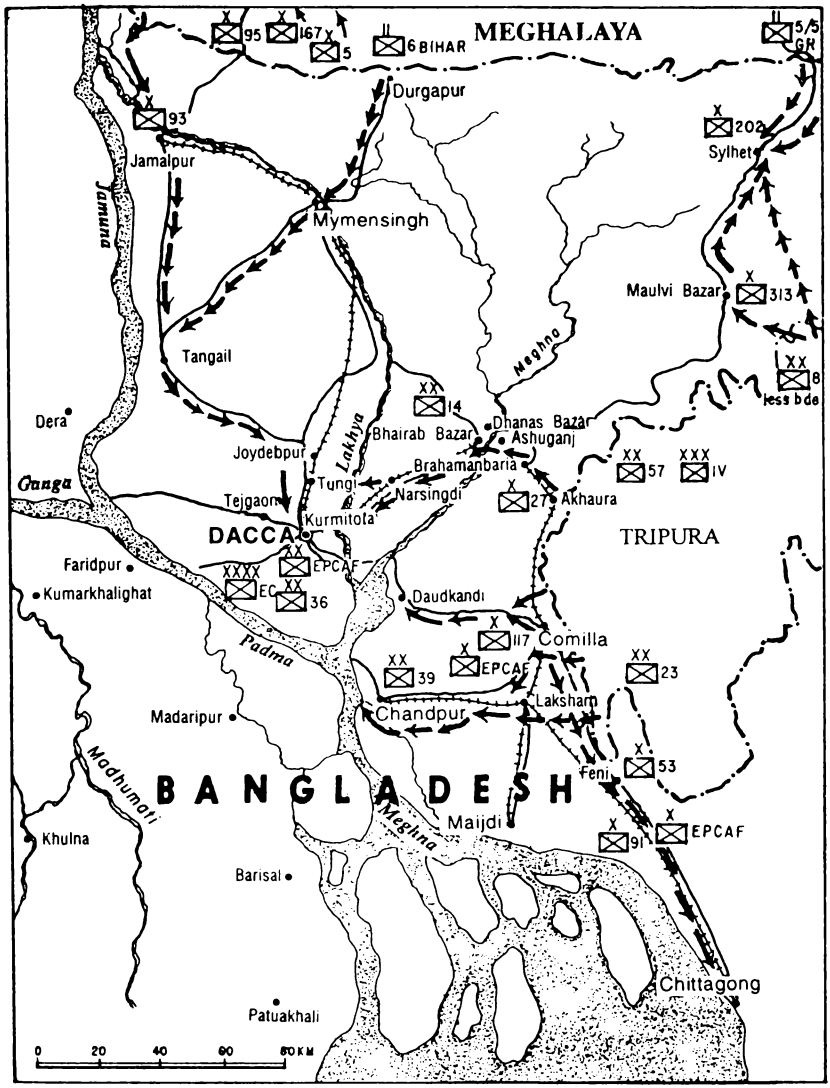

The external boundaries of India depicted in this map are neither correct nor authentic.

মানচিত্র ৪ উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর

শেষ করে কানাইরঘাট থেকে চিকনাগুল এসে ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের সাথে যোগ দেয়। ৪/৫ গুর্খা রেজিমেন্ট ছাড়া ৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেড সিলেটের দিকে অগ্রসর হয়, ১১ ডিসেম্বর ফেঞ্চুগঞ্জ দখল করে এবং ১৩ ডিসেম্বর ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের সাথে যুক্ত হয়। ৯ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত দুই ব্রিগেডের সিলেট গ্যারিসন ঘেরাও অবস্থায় সেক্টরের বাকি অংশের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

আশুগঞ্জে মেঘনার দিকে অগ্রযাত্রা

৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন আশুগঞ্জ ঘিরে ফেলে এবং ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দখল করে নেয়। এই যুদ্ধের সময় ৩১১ মাউন্টেন ব্রিগেডের একটি ব্যাটালিয়ন কড্ডা এলাকায় তিতাস নদীর ওপরে আড়াআড়িভাবে অবরোধ তৈরি করতে সমর্থ হয় এবং দেখতে পায় যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া~আখাউড়া রেলপথ থেকে রেললাইন তুলে ফেলে সেটাকে রোড বানানো হয়েছে। তিতাসের ওপরের রেলওয়ে ব্রিজটি শুধু অক্ষতই ছিল না, বরং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে আরো অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে, এই এলাকাটি প্রায় অরক্ষিতই রয়ে গেছে। প্রথমদিকে এই অক্ষরেখা ধরে ঢাকার দিকে অগ্রসর হবার কথা আমরা ভাবিনি। আমরা ভেবেছিলাম যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা খুব মজবুত হবে এবং মৌলভিবাজার থেকে হটে আসা ব্রিগেডের অংশটিও এই অঞ্চলেই আসবে। এছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জের মধ্যে তেমন কোনো সড়ক যোগাযোগ ছিল না। পাকিস্তানি ৩১১ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড উত্তরে সিলেটের দিকে যাওয়ায় অবশ্য সড়কপথে তখন একটি অক্ষরেখা বিদ্যমান ছিল। কোর কম্যান্ডার-সমর্থিত জিওসি বেন গনজালভেস (Ben Gonzalves)-এর একটি সুপারিশ অনুযায়ী ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের আক্রমণরেখা দাউদকান্দির পরিবর্তে ব্রাহ্মণবাড়িয়া~আশুগঞ্জে পরিবর্তন করা হয়।

এক-ব্রিগেড-কম এই ডিভিশনটি জলমগ্ন এলাকা দিয়ে ত্রিমুখী আক্রমণ চালায়। সাঁড়াশির মুখ বন্ধ হবার আগেই অবশ্য শত্রুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সটকে পড়ে। ৯ ডিসেম্বর ডিভিশন আশুগঞ্জে পৌঁছায়। কিন্তু তার আগেই, আমরা যেমন ভেবে রেখেছিলাম, করোনেশন ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে আশুগঞ্জে সামান্য কিছু প্রতিরোধ রেখে শত্রুরা ভৈরববাজারে সরে যায়।

মেঘনা অভিমুখে অগ্রযাত্রা

হেডকোয়ার্টার্স মেইন ৪র্থ কোরের প্রত্যক্ষ আওতাধীন ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেডের ওপরে গোমতী নদী অতিক্রম করে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমদিকের সড়ক-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনকে সাহায্য করার জন্য ময়নামতির নিকটবর্তী হবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। ৭ ডিসেম্বর সংবাদ পাওয়া যায় যে, বুড়িচং থেকে শত্রুরা সরে গেছে। ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেড সাহসের সাথে সুযোগটি তৎক্ষণাৎ কাজে লাগায়। বিনা-বাধায় তারা গোমতী অতিক্রম করে চান্দিনা ও জাফরগঞ্জে অবরোধ বসায়। কোর এঞ্জিনিয়ররা

একটি পার্শ্বসড়ককে মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে ক্লাস ৫ ট্র্যাকে রূপান্তরিত করে। এই একই ট্র্যাককে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে একটি ব্রিজ তৈরিসহ ক্লাস ৯ ট্র্যাকে রূপ দেয়া হয়। এই ট্র্যাকের ওপরে ব্রিগেডটি শেষ পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল।

এর মধ্যে এক ট্রুপ আরমারসহ ১২ কুমায়ুনকে দাউদকান্দি দখলের জন্য দ্রুত সামনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাস্তায় কোনো সুসংগঠিত প্রতিরোধ তাদেরকে মোকাবেলা করতে হয়নি, শুধু ইলিয়টগঞ্জে এক প্লাটুন সৈন্যের দুর্বল প্রতিরোধ ছাড়া। এলাকাটি শত্রুমুক্ত করা হয় এবং ৯ ডিসেম্বর দাউদকান্দি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পাকিস্তানিরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ৯ ডিসেম্বর কুমিল্লা শহর শূন্য করে দখল করা হয়। যারা পেরেছে, তারা ময়নামতির নগরদুর্গে আশ্রয় নেয়। ময়নামতির দিকে সরে যাবার সময় কুমিল্লা ও দাউদকান্দির মাঝামাঝি অঞ্চলে প্রায় ১,৫০০ সৈন্য আটকা পড়ে এবং আত্মসমর্পণ করে। স্থানীয় পর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর এটাই সর্বপ্রথম বড় আকারে আত্মসমর্পণ।

লাকসাম অবরোধ এবং চাঁদপুরে মেঘনার দিকে অগ্রযাত্রা

কুমিল্লা–লাকসাম–চৌদ্দগ্রাম–মুদাফরগঞ্জ অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লালমাই পাহাড় এলাকায় পাকিস্তানি ১১৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের বেশ শক্ত নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তাদের অবস্থানের গভীরতা ছিল কম। ফলে লাকসামকে বিচ্ছিন্ন করে লালমাইয়ের প্রতিরোধ এড়িয়ে চাঁদপুরে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৬১ মাউন্টেন ব্রিগেড সৌগ্রাম অঞ্চলের সড়ক অবরোধ করে উত্তরদিকের এলাকা দখল করে। ৩ ডিসেম্বর রাতে ৩০১ মাউন্টেন ব্রিগেড নিঃশব্দে লালমাই পাহাড় ও লাকসামের মধ্যবর্তী এলাকায় প্রবেশ করে এবং ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে মুদাফরগঞ্জ অধিকার করে। পথে একটি সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ন তাদের হাতে ধরা পড়ে। ৭/৮ ডিসেম্বর রাতে পাকিস্তানিরা মুদাফরগঞ্জের ওপরে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালায়, কিন্তু আমাদেরকে তারা সরাতে পারেনি। ব্রিগেড তার অব্যাহত অগ্রযাত্রার মধ্যে ৮ ডিসেম্বর প্রবল প্রতিরোধের মুখে হাজীগঞ্জ দখল করে এবং ৯ ডিসেম্বর চাঁদপুরে পৌঁছায়।

৩০১ মাউন্টেন ব্রিগেডকে অনুসরণ করে ১৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড লাকসামের উত্তর ও পশ্চিমের অক্ষরেখার ওপরে অবস্থান নেয়। লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণভাগ পাকিস্তানিরা ৭ ডিসেম্বর ছেড়ে দেয় এবং ১৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড তা অধিকার করে।

ইতোমধ্যে ৩/৪ ডিসেম্বর রাতে ৮৩ মাউন্টেন ব্রিগেডও নিঃশব্দে প্রবেশ করে এবং চৌদ্দগ্রাম ও লাকসামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবরোধ স্থাপন করে। ৫ ডিসেম্বর চৌদ্দগ্রাম মুক্ত করা হয়। লাকসাম গ্যারিসন ময়নামতিতে সরে যায় এবং ৯ ডিসেম্বর লাকসাম দখল করা হয়।

মেঘনা অববাহিকা অধিকার

৯ ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের বাহিনী মেঘনার তীরবর্তী প্রধান তিনটি পয়েন্ট আশুগঞ্জ, দাউদকান্দি ও চাঁদপুরে পৌঁছে যায় এবং মেঘনা নদীর গুরুত্বপূর্ণ বিস্তৃতির ওপরে

আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বদিক থেকে ঢাকার প্রবেশপথ এর ফলে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

ময়নামতি অবরোধ

ট্যাঙ্করোধী পরিখা ও তিন লাইন প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে ময়নামতি শত্রুদের এক মজবুত ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। চারটি ট্যাঙ্ক ও একটি আর্টিলারি ব্যাটারিসহ কুমিল্লা, লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম থেকে হটে আসা সৈন্য মিলিয়ে এই ক্যান্টনমেন্টে প্রায় ৪,০০০ সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছিল। সরাসরি আক্রমণের মাধ্যমে তাদেরকে পরাজিত করার চেষ্টা করলে আমাদেরকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হতে পারে বলে আমি এর বিপক্ষে মত দিয়েছিলাম। কোর কম্যান্ডাররা অবশ্য ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট দখলের ব্যাপারে বরাবরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

৯ ডিসেম্বরের মধ্যে এই অবস্থানকে পাশ কাটিয়ে দুইদিক থেকে অবরোধ করা হয়। ৬১ মাউন্টেন ব্রিগেড উত্তর ও পশ্চিমদিক থেকে এগিয়ে আসে এবং তাদেরকে ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের কম্যান্ডে আনা হয়। ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের অধীনস্থ ১৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড এগিয়ে আসে দক্ষিণদিক থেকে। ১৬ ডিসেম্বর ৮৬ জন অফিসার, ১৯৭৫ জন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও ৪,০০০ অন্যান্য র‍্যাঙ্কের সৈন্য আত্মসমর্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে। আমাদের হিসেব মতো চট্টগ্রাম কম গুরুত্বসম্পন্ন লক্ষ্য হলেও আর্মি হেডকোয়ার্টার্স তার প্রাথমিক লক্ষ্যস্থলের তালিকায় যেহেতু চট্টগ্রামকে রেখেছে, এই এলাকা দখলের জন্য আমাদেরকে কিছু সৈন্যের ব্যবস্থা করতে হয়।

'কিলো (Kilo)' সাঙ্কেতিক নামের এই বাহিনী তৈরি করা হয় মিজো পাহাড় থেকে আনা ঈষৎ পরিবর্তিত দুটি নিয়মিত '১' ব্যাটালিয়ন, দুটি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন, একটি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন, একটি সিআরপি ব্যাটালিয়ন, একটি মাউন্টেন রেজিমেন্ট, মুজিব ব্যাটারি এবং একটি বিএসএফ পোস্ট গ্রুপ দিয়ে। পরবর্তীতে এই বাহিনীর কম্যান্ড দেয়া হয় কাউন্টার ইনসার্জেন্সি স্কুলের ব্রিগেডিয়ার আনন্দ স্বরূপ (Anand Saroop)-এর হাতে। এই বাহিনী পরিচালনার জন্য সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সসহ ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং (Shabeg Singh)-এর কথা আমরা ভেবে রেখেছিলাম। অরোরা এই দায়িত্ব নেয়ার কথা বললে সরাসরি তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, এটা তাঁর সামরিক সুখ্যাতির ওপরে কুপ্রভাব ফেলবে! তাঁর এই প্রত্যাখ্যান অরোরা নীরবে মেনে নেন। লাকসাম এলাকায় আমাদের অপারেশনের ফলে শত্রুরা ফেনী ছেড়ে চলে যায় এবং ৬ ডিসেম্বর কিলো বাহিনী তা দখল করে। ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে বাহিনী করেরহাট ও জোরারগঞ্জ দখল করে এবং চট্টগ্রামের দিকে যাত্রা শুরু করে। শত্রুদেরকে ঘিরে ফেলে ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে সীতাকুণ্ড মুক্ত করা হয়। চট্টগ্রাম দখলের ব্যাপারে উৎসাহী কোর কম্যান্ডারের উদ্যোগে শক্তি বৃদ্ধি ও চট্টগ্রাম দখল ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ৮৩ মাউন্টেন ব্রিগেড এসে বাহিনীর

সাথে যোগ দেয় এবং ১২ ডিসেম্বর তারা সীতাকুণ্ড অঞ্চলে সমবেত হয়। শত্রুপক্ষের দুটি কোম্পানির অধিকৃত কুমিরা ঘাট মুক্ত করা হয় ১৩/১৪ ডিসেম্বর। চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে ফৌজদারহাটে পৌঁছানোর পর যুদ্ধবিরতি শুরু হয়।

১৪ ডিসেম্বর সকালে এয়ার ফোর্স ক্যানবেরা (Air Force Canbera)-র দু'জন পাইলট আমার সাথে দেখা করে দিল্লীতে চিফ অভ্ স্টাফদের নির্বাচিত এলাকা টঙ্গীতে বোমাবর্ষণের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্রিফিং চায়। অথচ এর মধ্যে আমাদের সৈন্যরা আমাদের ফাইটার বম্বার এয়ারক্র্যাফ্টের নাগালের মধ্যে টঙ্গীর উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে। এই টার্গেটটি ছিল নির্মাণাধীন একটি কারখানা। কয়েক মাস আগে এটিকে স্ট্র্যাটেজিক টার্গেটের তালিকায় ঢোকানো হয়, কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর আর কোনো গুরুত্ব নেই। রণাঙ্গনের পূর্ব অংশে আমাদের সৈন্যরা চট্টগ্রামের প্রবেশমুখে পৌঁছে যাচ্ছিল, যা আমাদের ফাইটার বম্বার এয়ারক্র্যাফ্টের রেঞ্জের অনেক বাইরে। বিমানবাহী জাহাজ *ভিক্রান্ত (Vikrant)*-এর বিমানগুলো এই আক্রমণে সহযোগিতা করার মতো অবস্থায় ছিল না। সামগ্রিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি অবিলম্বে এই আক্রমণ চট্টগ্রামের প্রবেশমুখ ফৌজদারহাটে শত্রু-অবস্থানের দিকে চালিত করি। আক্রমণটি সফল হয়। সেই রাতেই হেডকোয়ার্টার্স ইস্টার্ন এয়ার কম্যান্ডের সিনিয়র এয়ার স্টাফ অফিসার দেবাশর (Devashar)-এর একটি ক্ষুব্ধ ফোন আমি পাই। দেবাশর বলেন, দিল্লী থেকে চিফ অভ্ এয়ার স্টাফ জানতে চেয়েছেন যে, তিন বাহিনীর প্রধানদের নির্ধারিত স্ট্র্যাটেজিক বিমান আক্রমণের গতিপথ পরিবর্তনের ধৃষ্টতা কার? দেবাশরের কাছে আমি পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা ও দ্রুত পরিবর্তনশীল অপারেশনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলি যে, অপারেশনের টার্গেট পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিন বাহিনীর চিফ অভ্ স্টাফের মতৈক্যের জন্য দীর্ঘ আলোচনার সময় এখন নেই। পাইলটদের যে কোনো দোষ নেই — যাবতীয় দায়ভার যে একান্তই আমার, সেটাও তাঁকে আমি বললাম । সুদক্ষ দূরদর্শী এয়ার ফোর্সের চিফ অভ্ স্টাফ লক্ষ্যস্থল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করেন। পরে আর এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য শুনিনি।

মেজর জেনারেল সুজন সিং উবান (Sujan Singh Uban)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে প্রয়োজনে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের আক্রমণে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে মানেকশ' আমাদেরকে চাপ দিচ্ছিলেন। আমি তাদেরকে আলাদা কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেবার কথা ভাবছিলাম। মিজোরাম থেকে দুটি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন যেহেতু আমরা সরিয়ে এনেছিলাম, আমি পরামর্শ দিই, সুজন সিংয়ের বাহিনী মিজোরাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকে পড়ে কিছু কম্যান্ডো ও অনিয়মিত বাহিনীর সামান্য কিছু সদস্যের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাঙ্গামাটি দখল করবে এবং চট্টগ্রাম আক্রমণের উপক্রম করবে। এলাকাটি পাহাড় ও ঘন বনজঙ্গলে পূর্ণ থাকায় সুজন সিংয়ের বাহিনী তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব সহজেই পালন করতে সমর্থ হয়। যুদ্ধবিরতির পর তারা চট্টগ্রামে চলে আসে এবং সেখান থেকে তাদেরকে ভারতে ফিরিয়ে নেয়া হয়।

কক্সবাজারে বিধ্বংসী উভচর অভিযান

পাকিস্তানিরা যাতে বার্মায় পালিয়ে যেতে না পারে, সেই লক্ষ্যে সমুদ্রপথে কক্সবাজারে সৈন্য পাঠাবার জন্য ৯ ডিসেম্বর জেনারেল মানেকশ' ফোনে আমাকে নির্দেশ দেন। আমি তাঁকে বললাম যে, তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তিনি তাঁর কথায় অনড় রইলেন। আমি বললাম, উভচর অভিযানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোনো বাহিনী আমাদের নেই এবং আমাদের লাইফ বেল্ট, স্ক্র্যাম্বলিং নেট বা ল্যান্ডিং ক্র্যাফট — কিছুই নেই। সবচেয়ে বড় কথা, যে সৈন্যদলকে তিনি পাঠাতে চাইছেন, সমুদ্র সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। আমাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন যে, তিনি কোনো অজুহাত শুনতে রাজি নন এবং তিন বাহিনীর চিফ অভ্ স্টাফের এটাই নির্দেশ। উপযুক্ত একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ঠিক করে রাখার জন্য কলকাতায় নৌবাহিনীকে আমি অনুরোধ করি। সৌভাগ্যবশত *বিশ্ব বিজয় (Vishwa Vijay)* তখন সবেমাত্র মাল খালাস করেছে। আমি সেটা রিক্যুইজিশনের নির্দেশ দিলাম। অপারেশন নিয়ে ইস্টার্ন কম্যান্ডে আমরা নৌবাহিনীর সাথে আলোচনা করি। বেশ কয়েকটি উভচর অপারেশনে আমি অংশ নিয়েছিলাম বলে আমি জানতাম যে, এর জন্য কিছু বিশেষ সাজ-সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি বার্মায় কাজ করেছি এবং কক্সবাজারের দক্ষিণে বিস্তৃত সৈকতে উভচর অপারেশনের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছি বলে সেখানকার তটরেখা ও সৈকত সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা ছিল। উখিয়ার সৈকত ছিল মৃদু ঢালসম্পন্ন এবং বেশ কিছু খাঁড়ি সেখানে ছিল যেগুলো সরাসরি সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। বিষয়টি আমি নৌবাহিনীর গোচরে আনি। যেহেতু আমাদের লাইফ বেল্ট নেই এবং আমাদের সৈন্যরা আগে কখনো সমুদ্র দেখেনি, আমি নৌবাহিনীকে বোঝাই যে, ল্যান্ডিং ক্র্যাফ্টগুলো সৈকতে রেখে জোয়ারের সময় সেগুলো ভাসানো যেতে পারে। নৌবাহিনী এতে সম্মত হয়, কিন্তু পরে এই পরিকল্পনা তারা বদলে ফেলে। এর পরিণতি হয় ভয়ঙ্কর। পরিকল্পনা অনুযায়ী সৈন্যদল নিয়ে একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ১০ ডিসেম্বর রওয়ানা দিয়ে ১২ ডিসেম্বর নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছে যাবার কথা ছিল। জাহাজ থেকে সৈন্যদের নামানোর জন্য দুটি এলএসটি (LST) ব্যবহার করার কথা ছিল, সৈন্যরা যাতে পায়ে পানি না লাগিয়ে তীরে নামতে পারে। বিমানবাহী জাহাজ *ভিক্রান্ত* থেকে প্রয়োজনীয় বিমান ও গোলন্দাজ-সহায়তা পাবার কথা ছিল। 'রোমিও (Romeo)' কোডনেমবিশিষ্ট এই বাহিনীকে জড়ো করা হয়েছিল তাড়াহুড়ো করে। আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম, ২য় কোরের অধীনে ব্রিগেডিয়ার এস এস রাই (S S Rai)-এর কম্যান্ডে ৮ মাউন্টেন আর্টিলারি ব্রিগেড, ১/৩ গুর্খা রেজিমেন্ট, ১১ বিহারের দুটি কোম্পানি এবং একটি আর্টিলারি এই ফোর্সে থাকবে। এই অভিযানে নৌবাহিনীর ১৫০ জনের একটি দলের অংশগ্রহণ করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তারা আসেনি। নির্ধারিত সময়ের দুদিন পরে ১২ ডিসেম্বর এই দল কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে।

সমুদ্রে থাকাকালীনই ১৪ ডিসেম্বর বাহিনীটিকে আইএনএস *গিলদার (*INS *Gildar)* ও *ঘড়িয়াল (Gharial)*-এ তোলা হয়। ম্যাপ দেখে সমস্ত পরিকল্পনা করা

হয়েছিল বলে অকুস্থলে পৌঁছানোর পর সৈকতের প্রকৃত জরিপ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে নৌবাহিনীও পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা বদলানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং সৈন্যদেরকে নামানোর জন্য নৌকা ব্যবহারের চেষ্টা করে। এই কাজের জন্য সৈকতের প্রাথমিক সমীক্ষাও যথাযথভাবে করা হয়নি। খাঁড়িগুলো সম্পর্কে নৌবাহিনীকে আমি আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম। তারপরেও একটি নৌকা কূলে ভেড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে সোজা একটি খাঁড়িতে ঢুকে যায়। মাত্র ১২ জন সৈনিক তীরে পৌঁছাতে পারে এবং তাদের মধ্যে দুজন ডুবে যায়। আরেকবারের চেষ্টায় ৩০ জন সৈনিককে তীরে নামানো হয়। *ভিক্রান্ত* এতে অংশ নেয়নি। ততক্ষণে পরিষ্কার বোঝা গেছে যে, ওই এলাকায় কোনো শত্রুসৈন্য ছিল না। কাছাকাছি শুধু মুক্তিবাহিনীর একটি ক্যাম্প ছিল। শেষ পর্যন্ত এই সৈন্যদলকে ১৬ এবং ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে দেশী নৌকায় করে জাহাজ থেকে নামানো হয়। দুর্বল পরিকল্পনার ফসল তাড়াহুড়ো-করে-করা এই অপারেশন থেকে বড় ধরনের লোকসানের হাত থেকে আমরা বেঁচে যাই স্রেফ ভাগ্যক্রমে। সেনাপ্রধানের একটি টেলিফোন ছাড়া দিল্লীর সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স থেকে আর কোনো লিখিত নির্দেশ পাঠানো হয়নি। উভচর অভিযানে প্রয়োজন বিশেষ ধরনের যান ও সাজ-সরঞ্জাম, সুসমন্বিত বিস্তৃত পরিকল্পনা, অংশগ্রহণকারী সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং মহড়া। এ সমস্ত পূর্বশর্তের কোনোটিই ছিল না। দিল্লী থেকে পাঠানো বাহিনীপ্রধানদের এ ধরনের ঘোড়সওয়ারী নির্দেশের ভিত্তিতে এসব হঠকারী অভিযান চালানো উচিত নয়।

উত্তরমুখী আক্রমণ এবং ছত্রীসেনা অবতরণ

জামালপুর গ্যারিসনের শত্রুসৈন্যরা শেষ পর্যন্ত ৪ ডিসেম্বর ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং ৭ ডিসেম্বর অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেও ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জামালপুর দখল করা সম্ভব হয়নি। এর আগে ব্রিগেডিয়ার ক্লের (Kler) আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে লেফ্‌টন্যান্ট কর্নেল সুলতান (Sultan)-কে বার্তা পাঠান। হার মানতে অস্বীকার করে সুলতান চিঠির উত্তরের সাথে একটি বুলেট পাঠান। সামরিক ইতিহাসে এই চিঠি নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ স্থান দাবি করে এবং সে কারণে পরিশিষ্ট ৩-এ এটার প্রতিলিপি দেয়া হয়েছে।

মানেকশ'র অনুমোদন পাওয়ার পর ইন্দর গিল ৮ ডিসেম্বর ১৬৭ ও ৫ মাউন্টেন ব্রিগেডকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেন। ব্রহ্মপুত্রের ওপারে জামালপুরে আক্রমণ জোরদার করার জন্য তাদেরকে ব্যবহার করা যায়নি। ১২ ডিসেম্বর ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড জামালপুরের দক্ষিণে পৌঁছায়। ইতোমধ্যে ১১ ডিসেম্বর মধুপুর অঞ্চলে ২ প্যারা নামানো হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ডি প্লাস ৭-এ, অর্থাৎ যুদ্ধ শুরুর সাত দিনের দিন ছত্রীসেনা নামানো হয়। আকাশে যেহেতু আমরা তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ বলে আমি চেয়েছিলাম যে, অবতরণের কাজটি হোক সকাল নটায়। দুর্ভাগ্যবশত প্যারাশ্যুট ব্রিগেড কম্যান্ডার ব্রিগেডিয়ার টমাস তাঁর ব্রিগেড নিয়ে যশোরের পথে ছিলেন। তাঁর সেকেন্ড-

ইন-কম্যান্ড কর্নেল সুদ্দার (Scudder) চেয়েছিলেন শেষবেলায় সৈন্য নামাতে। আমি আবারও গুরুত্ব আরোপ করে বললাম, যেহেতু আকাশে আমাদের শক্তি শত্রুর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর এবং যেহেতু অবতরণের এলাকা সিদ্দিকীর নিয়ন্ত্রণে, এবং যেহেতু এই এলাকায় আগেই পাঠানো ক্যাপ্টেন ঘোষ (Ghosh)-এর ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন সিগন্যাল ডিটাচমেন্ট খবর দিয়েছে যে, কোনো সমস্যা নেই, সেহেতু শেষবেলায় সৈন্য নামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বিমান ব্যবহারের কারণে অবতরণ যেহেতু ছড়িয়ে ছিটিয়ে হবে; রাতের অন্ধকারে প্যারাশ্যুট দিয়ে নামানো সাজ-সরঞ্জাম উদ্ধার করা একটি বড় সমস্যা হবে। সুনির্দিষ্টভাবে আমি আরও বললাম যে, যত তাড়াতাড়ি সৈন্য নামানো যাবে, পলায়নপর শত্রুসৈন্যদের সংখ্যা তত কমানো যাবে। এই পর্যায়ে অরোরা আমার অফিসে প্রবেশ করেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন যে, একজন প্যারাট্রুপার হিসেবে সুদ্দারের সঙ্গে তিনি একমত। আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চলার পর অরোরা ও সুদ্দার শেষ পর্যন্ত এক ঘণ্টার সামান্য কিছু বেশি ছাড় দিয়ে বিকেল চারটায় সৈন্য নামাতে রাজি হন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হলেও কোনোরকম অঘটন ছাড়াই অবতরণ সম্পন্ন হয়। খুব তাড়াতাড়ি ব্যাটালিয়ন নিজেদেরকে সংহত করে ফেলে এবং ময়মনসিংহ থেকে পিছিয়ে যাওয়া কমপক্ষে ৩০০ শত্রুসৈন্য আটক করে। সকাল নটায় অবতরণ করলে এই সংখ্যা আরো বেশি হত। আমার আরো আনন্দের কারণ ঘটিয়ে বিদেশী সংবাদ সংস্থা প্রচার করে যে, এই এলাকায় প্রায় ৫,০০০ ছত্রীসেনা অবতরণ করেছে। এই সংবাদে ঢাকায় লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল নিয়াজির সাহস উবে যায়। পাকিস্তানের চিফ অভ্ জেনারেল স্টাফকে পাঠানো এক বার্তায় নিয়াজি যে সংবাদটি পাঠান, তা হল:

> শত্রুরা হেলিকপ্‌টার থেকে নরসিংদির দক্ষিণে আনুমানিক এক ব্রিগেড সৈন্য এবং টাঙ্গাইলে একটি প্যারা ব্রিগেড নামিয়েছে। বন্ধুদেরকে ১২ ডিসেম্বর ফার্স্ট ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছানোর অনুরোধ রইল।

ছত্রীসেনা নামানোর দিন সন্ধ্যায় সিবিএস (CBS) প্রতিনিধি ফোনে আমাকে বলেন, দম দম বিমানবন্দরে তিনি প্রায় ৫,০০০ ছত্রীসেনা দেখেছেন। আমি এই তথ্য সমর্থন করি কি না। উত্তরে বললাম, এই খবর আমি সমর্থনও করছি না, আবার প্রতিবাদও করছি না। তাঁকে আরো বললাম, এখানে সেন্সরশিপের কোনো বালাই নেই বলে তিনি যা দেখেছেন, সেটা রিপোর্ট করতে কোনো বাধা নেই। আমাদের জন্য এটা ছিল এক সৌভাগ্য। পরে ঢাকায় নিয়াজি আমাকে ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁকে বিশ্বাস করতে হয়েছিল যে, শুধু একটি ব্যাটালিয়ন নয়, বরং পুরো এক ব্রিগেড ঢাকার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে এবং এর ফলে তাঁর ধারণা হয়েছিল, শহর-রক্ষার মতো শক্তি তাঁর নেই। তিনি আরো বলেছিলেন যে, চাঁদপুরের পতন হবার পরই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই যুদ্ধে তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড গ্রুপ, ৬৭ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং ২ প্যারা ও হেডকোয়ার্টার্স কমিউনিকেশন জোন এরিয়ার অধীনস্থ ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং (Sant Singh)-এর বিহার ব্যাটালিয়ন দক্ষিণে অগ্রসর হয় এবং ১৩ ডিসেম্বর নাগাদ ঢাকার প্রান্তরেখায় উপস্থিত হয়। ২০,০০০ সুসজ্জিত যোদ্ধার বাহিনীসহ 'বাঘা' সিদ্দিকীরও আমাদের সৈন্যদের সাথে অগ্রসর হবার কথা ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তা করেননি।

মেঘনা অতিক্রম ও ঢাকার দিকে অগ্রসর

ভৈরববাজারে শত্রুরা দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তা রক্ষার ব্যাপারে তাদেরকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছিল। ফলে, ভৈরববাজারকে নজরে রেখে আরো দক্ষিণদিক দিয়ে মেঘনা অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই পারাপারের জন্য প্রাপ্ত সমস্ত হেলিকপটার এবং স্থানীয় নৌকাসহ সমস্ত নৌযান ব্যবহার করা হয়।

৯ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটায় এই পারাপার শুরু হয়। এমআই৪ (Mi4) হেলিকপ্টারগুলো ব্যাটালিয়নের অংশবিশেষ এবং লাইট রেজিমেন্টের একটি অংশ পার করে। মেইন্টেন্যান্সের সমস্যার কারণে ১৪টির মধ্যে একবারে ৭ অথবা ৮টির বেশি হেলিকপ্টার পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে যতটা পারা গেছে, টানা-হ্যাঁচড়া করে দেশী নৌকায় পারাপার করা হয়। ১১ ডিসেম্বর আবার হেলিকপ্টারে করে একটি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটলিয়নের অংশবিশেষ ও কামানটানা গাড়ি ছাড়াই মাউন্টেন গানের দুটি সেকশন পার করে নরসিংদিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ১২ ডিসেম্বর নরসিংদি আমাদের দখলে চলে আসে। ট্যাঙ্কগুলো নদীর পাশ ঘেঁষে নরসিংদিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। কোনো গাড়িই এই নদী অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি। সাইকেল, রিকশা, গরুর গাড়ি ও রেলওয়ে ওয়াগন বোঝাই করে স্থানীয় লোকজন দিয়ে সেটা রেললাইনের ওপর দিয়ে ঠেলে এবং পায়ে হেঁটে সৈন্যদল অগ্রসর হতে থাকে। ১৩ ডিসেম্বর কিছু সৈন্য লক্ষ্যা নদীর পূর্বপার পর্যন্ত পৌঁছায়। ১৪ ডিসেম্বর টহলদার বাহিনীর কিছু অংশ নদী অতিক্রম করে। ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের অগ্রবর্তী টহলদার দল টঙ্গীর প্রবেশপথে পৌঁছায়। ৪র্থ কোর হেডকোয়ার্টার্সকে একটি ৫.৫ মিমি. কামান আমি মেঘনার ওপারে নিয়ে আসতে বলি, যাতে সেটা থেকে ঢাকার উপকণ্ঠে গোলাবর্ষণ করে শত্রুদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত তারা এটা করতে পারেনি।

১৪/১৫ ডিসেম্বর ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের যে ইনফ্যান্ট্রি অংশ চাঁদপুরে ছিল, ফেরিতে করে সেটা দাউদকান্দিতে নদী অতিক্রম করে। ভারি অস্ত্রশস্ত্র বা যানবাহন পার করতে না পারলেও নারায়ণগঞ্জের পূর্বদিকে বৈদ্যেরবাজারে তারা সমবেত হতে শুরু করে।

পশ্চিমদিক থেকে চেষ্টা

পশ্চিমদিক থেকেও ঢাকা অবরুদ্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। ৫ মাউন্টেন ব্রিগেড নিয়োগ করতে মানেকশ'র বিলম্বের কারণে ১৩ ডিসেম্বর ৩৩শ কোরকে ৩৪০ মাউন্টেন

ব্রিগেড এবং এক স্কোয়াড্রন পিটি ৭৬ ট্যাঙ্ক যমুনা পার করে নিয়ে যেতে বলা হয়। ১০১ কমিউনিকেশন জোন এরিয়াকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ফুলছড়িঘাটে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনযান তৈরি রাখতে বলা হয়। ২য় কোরের একটি ব্রিগেড গ্রুপকে গোয়ালন্দঘাট দিয়ে পদ্মা অতিক্রম করানোর একটি আনুষঙ্গিক পরিকল্পনাও করা হয়। ফারাক্কা থেকে যে নৌযানগুলো ৫ ডিসেম্বরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজে নিয়ে আসা হয়, ঢাকা অভিমুখে সেনা-অভিযানের লক্ষ্যে সেগুলোকে গোয়ালন্দঘাটে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়। ২য় কোর অবশ্য হার্ডিঞ্জ ব্রিজ থেকে নৌযান ভাটিতে আনতে সম্মত হয়নি।

১৩ ডিসেম্বর জেনারেল মানেকশ'র কাছ থেকে আমরা একটা সিগন্যাল পাই। বাংলাদেশে যেসব শহর আমরা পাশ কাটিয়ে এসেছি, সেগুলোকে অবিলম্বে দখল করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। ঢাকা ছাড়া অন্য সমস্ত শহরের নামই তিনি লিখে দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে ছিল দিনাজপুর, রংপুর, সিলেট, ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট, এমন কি খুলনা ও চট্টগ্রামের নামও সেখানে ছিল। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স অপারেশন ইনস্ট্রাকশনে এগুলোকে প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ঢাকা দখল সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে একটি শব্দও এতে নেই। ইতোমধ্যে আমরা ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এমন অবস্থায় আবার পিছিয়ে গিয়ে এসব শহর দখলের চেয়ে ঢাকা দখল আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের বিশ্বাস। সেটা না করে এসব করতে গেলে আমাদের সমস্ত অপারেশন ওখানেই আটকা পড়ে থাকত, সামনে এগুনো যেত না। যে শহরগুলো ইতোমধ্যেই আমরা দখল করতে পেরেছিলাম, সেগুলো হল যশোর ও কুমিল্লা — এই শহরগুলো থেকে পাকিস্তানিরা নিজে থেকেই সরে গিয়েছিল। এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, জাতিসংঘের আর কোনো সিদ্ধান্তে তারা ভেটো দেবে না। এই অবস্থায় যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, আমরা খুব সুবিধাজনক অবস্থানে থাকব না। সম্ভবত এসব কারণেই পাশ-কাটিয়ে-আসা এই শহরগুলো যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দখল করার প্রয়োজনীয়তা মানেকশ' অনুধাবন করেছিলেন। আমাদের সমস্ত ফরমেশন যাতে এই নির্দেশ পায়, সেই লক্ষ্যে জেনারেল মানেকশ' এই চিঠির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সমস্ত কোরে পাঠিয়ে দেন। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে পাওয়া নির্দেশমতো কোরগুলো যেন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, সেজন্য কোর কম্যান্ডারদের সাথে আমি কথা বলি এবং তাঁদেরকে জানাই যে, তাঁদের কাছে অনুলিপি দেয়া হয়েছে শুধু তাঁদের অবগতির জন্য। কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্স থেকে অর্ডার ইস্যু না হলে কোনো অপারেশন পরিচালনা করা যাবে না।

১৩ ডিসেম্বর জারি করা জেনারেল মানেকশ'র অর্ডারের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। অরোরা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। আমার অফিসে এসে তিনি আমাকে শহরগুলো — বিশেষত রংপুর ও সিলেট, শুরু থেকেই যেগুলো দখল করার ব্যাপারে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল — দখল-না-করার দোষে অভিযুক্ত করেন। এই পর্যায়ে যুদ্ধবিরতি আমাদের বিপর্যয়ের কারণ হতে পারত। যশোর ও কুমিল্লা ছাড়া আমরা কোনো শহরই দখল

করিনি। ফলে ঢাকা দখল করা আমাদের জন্য খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। নিয়াজিকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করতে রাজি করানোও ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর পক্ষের লোকজনকে দিয়ে কোনোরকমে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার ব্যাপারটিও আমাদের অজানা ছিল না। তাছাড়া একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার জন্য ঢাকায় অবস্থিত জাতিসংঘের প্রতিনিধি মার্ক হেনরি (Marc Henri) ও জন কেলি (John Kelly)-র তৎপরতা সম্পর্কেও আমরা অবহিত ছিলাম। সিগন্যাল ইন্টারপ্রিটেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল পি সি ভল্লকে ডেকে নিয়াজির সাথে আমার টেলিফোন-কাম-রেডিও যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিই। কলকাতায় আমাদের নৌবাহিনীর তৈরি এই ফ্রিকোয়েন্সিতে অনিচ্ছাকৃত জ্যামিং সত্ত্বেও তিনি সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হন। পাকিস্তানিদের কাছে আমি আবার ব্যাখ্যা করি যে, ঢাকার উপকণ্ঠে আমাদের যে বাহিনীগুলো অপেক্ষা করছে, সেসব খুবই শক্তিশালী। এই পরিস্থিতিতে তারা (পাকিস্তানিরা) আত্মসমর্পণ করলে তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করা হবে এবং সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা হবে। আমি তাদেরকে আরো জানিয়ে দিই যে, ঢাকার মুক্তিবাহিনীর খুব শিগ্‌গিরই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠার আশঙ্কা প্রবল। এটা তাদের (পাকিস্তানিদের) জন্য নিঃসন্দেহে এক ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। পাকিস্তানিরা তখন জানতে চায়, জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য অধিকার এবং আত্মসমর্পণের পর সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য এবং সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর সদস্যদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে কি না। আমি তাদেরকে জানাই, এসবের নিশ্চয়তা আমরা দেবো এবং জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের প্রাপ্য সম্মান তাদেরকে দেয়া হবে। এরপরে তারা জানতে চায়, তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তারা তাদের কাছে রাখতে পারবে কি না। জবাবে আমি বলি, আমি চেষ্টা করব যাতে তারা তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিজেদের কাছে রাখতে পারে। এরপর ব্রিগেডিয়ার আদি সেথনা ও আমি মিলে আত্মসমর্পণের একটি খসড়া দলিল প্রণয়নের কাজ শুরু করে দিই। অতীতের আত্মসমর্পণের বিভিন্ন দলিল আমরা ঘাঁটাঘাঁটি করে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সবদিক থেকে এতটাই স্বতন্ত্র যে, অন্যান্য আত্মসমর্পণের শর্তাবলি এতে প্রযোজ্য নয়। একটি খসড়া তৈরি করে আমরা আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দিই। ইতোমধ্যে জাতিসংঘে তুমুল রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু হয়। সেখানে ভারতের বক্তব্য ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক উৎপীড়নের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ৬ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে নতুন এক জাতির জন্ম হল, যাদের স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে তৈরি নিজস্ব সরকার আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সমর্থন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী যে কোনো প্রস্তাবনাকে তারা এ পর্যন্ত ভেটো দিয়ে এসেছে।

বিচারপতি হামদুদুর রেহমান (Hamdoodur Rehman)-এর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ইনকয়্যারি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৫ ও ৭ ডিসেম্বরে দেয়া পূর্ব পাকিস্তানে লড়াই বন্ধের সোভিয়েত প্রস্তাব গ্রহণ করলে 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে রক্ষা করা যেত'। আমেরিকার অবস্থান ছিল মোটামুটি চীনের মতোই। ৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘে নিয়োজিত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ (George Bush) আগ্রাসনের দায়ে ভারতকে অভিযুক্ত করেন এবং একই দিনে ভারতকে দেয়া সব ধরনের অর্থনৈতিক সাহায্য প্রত্যাহার করা হয়। এর আগে সামরিক সাহায্যও প্রত্যাহার করা হয়েছিল। আশু যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে নিয়োজিত বাহিনীগুলোকে নিজ নিজ সীমানার ভেতরে সরিয়ে নেয়া এবং পর্যবেক্ষক বহাল করার জন্য বুশ জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। সোভিয়েত ইউনিয়ন এতে ভেটো দেয়। চীনও প্রায় একই ধরনের একটি প্রস্তাব আনে, যা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয়। ৮ ডিসেম্বর ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেবার পর যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের দাবিসম্বলিত আর্জেন্টিনার আনা একটি প্রস্তাব ১০টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকা সত্ত্বেও ১০৪-১১ ভোটে সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ১৩ ডিসেম্বর একটি মার্কিনী প্রস্তাবনা ভোটের জন্য দেয়া হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বিরোধিতা করে। সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় পোল্যান্ড যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের দাবিতে একটি প্রস্তাবনা পেশ করে। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে ভারতের সর্বনাশ হয়ে যেত। আমাদের সৌভাগ্য, ১৫ ডিসেম্বর ভুট্টো প্রস্তাবনার তাঁর কপিটি ছিঁড়ে ফেলেন, সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার দায়ে জাতিসংঘকে অভিযুক্ত করেন এবং ঝড়ের বেগে অধিবেশন ছেড়ে চলে যান। জাতিসংঘের ওপরে এ ধরনের ক্রমবর্ধমান চাপ এবং সোভিয়েত ইঙ্গিত থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তাদের পক্ষে ভবিষ্যতে অন্য কোনো প্রস্তাবনায় ভেটো প্রয়োগ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। এর অর্থ, আমাদেরকে ন্যূনতম সময়ে যত বেশি সম্ভব শহর দখল করতে হবে। সম্ভবত এটাই কোনোভাবে ১৩ ডিসেম্বরে মানেকশ'র ইস্যু করা নির্দেশের কারণ হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের সমস্ত শহর দখলের নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন; শুধু ঢাকা ছাড়া, যেটা দখল করাই হওয়া উচিত ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য।

পশ্চিমে আমাদের সামরিক অভিযানের তেমন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছিল না। ৬ ডিসেম্বর ইন্দর গিল আমাকে ১৩০ মিমি. মাঝারি আর্টিলারি রেজিমেন্টগুলো, মাঝারি ট্যাঙ্কের একটি রেজিমেন্ট, ১২৩ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং এক-ব্যাটালিয়ন-গ্রুপ বাদে সমস্ত ৫০ প্যারাশ্যুট ব্রিগেড পশ্চিমে পাঠিয়ে দিতে বলেন। আমি সম্মত হই, কিন্তু পরবর্তীতে বগুড়া সেক্টরে নিয়োজিত ট্যাঙ্ক স্কোয়াড্রনটি পাঠানোর পরামর্শ দিই। বিমানবিধ্বংসী আর্টিলারির সবটা আমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই যুদ্ধে আমাদের সুনির্দিষ্ট কোনো স্ট্র্যাটেজিক লক্ষ্য ছিল না। প্রকৃত অর্থে সামগ্রিক কোনো স্ট্র্যাটেজিই আমাদের ছিল না যেটা নিয়ে

নিদেনপক্ষে কখনো আলোচনা হয়েছে। এর আগে ১৫ নভেম্বরে পশ্চিম রণাঙ্গণের জন্য প্রস্তাবিত কয়েকটি অপারেশনের ধারণাগত কিছু ত্রুটি তুলে ধরে ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্সের কাছে সামগ্রিক স্ট্র্যাটেজির ওপরে আমি একটি চিঠি লিখেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার সেথনা নিজ হাতে চিঠিটি ডেলিভারি দিয়েছিলেন। ইন্দর চিঠিটি মানেকশ'র কাছে উপস্থাপন করলে মানেকশ' ধরে নেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনার সমালোচনা করা হচ্ছে। পরে ইন্দর আমাকে বলেছিলেন যে, এই চিঠির ওপরে মানেকশ' লিখেছিলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কীভাবে কম্যান্ড করতে হবে, সেটা মেজর জেনারেল জেকবের কাছে শেখার ইচ্ছে তাঁর নেই (পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য)।

পাকিস্তানিরা তাদের সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য প্রপাগান্ডা চালাচ্ছিল, চীন ও আমেরিকা সামরিক সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং শিগ্‌গিরই তা বাস্তবায়িত হবে। এটা তারা বিশ্বাসও করতে শুরু করে দিয়েছিল। ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানের আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে পাঠানো নিয়াজির বার্তা আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এটার বক্তব্য ছিল:

> ঢাকা প্রচণ্ড চাপের মুখে। বিদ্রোহীরা ইতোমধ্যে শহর ঘিরে ফেলেছে। ভারতীয়রাও এগিয়ে আসছে। পরিস্থিতি গুরুতর। প্রতিশ্রুত সাহায্য ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে অবশ্যই বাস্তবায়িত হতে হবে। নেফা-য় নয়, শিলিগুড়িতে এটা কার্যকর হবে এবং শত্রুদের এয়ারবেসগুলোকে ব্যস্ত রাখার মাধ্যমে (Dacca under heavy pressure. Rebels have already surrounded the city Indians also advancing. Situation serious. Promised assistance must take practical shape by 14 December. Will be effective in Silliguri not NEFA and by engaging enemy air bases.)।

এই 'প্রতিশ্রুত সাহায্য' মানে চীনা ও আমেরিকান হস্তক্ষেপ। ভারতীয়দের মধ্যে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে চীনারা তিব্বতে তাদের সামরিক ফরমেশনগুলোতে আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি পাঠাতে শুরু করে। কাঠমণ্ডুস্থ মার্কিন মিলিটারি অ্যাটাশে কর্নেল মেলভিন হোল্স্ট (Melvin Holst) সম্ভাব্য চীনা হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সচেতনতার কথা জানিয়ে রিপোর্ট করেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। ১৯৫৯/১৯৬০ সালে ফোর্ট সিলে কর্নেল হোল্স্ট ও আমি একই সাথে অ্যাডভান্সড আর্টিলারি অ্যান্ড মিসাইলের ওপরে কোর্স অভ্ ইনস্ট্রাকশন শেষ করি। যুদ্ধ শেষ হলে ফোর্ট উইলিয়ামে তিনি আমার সাথে দেখা করেন; কিন্তু চীনা হস্তক্ষেপের আশঙ্কা সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট-সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান। সিদ্দিক সালিক (Siddiq Salik)-এর লেখা *উইটনেস টু সারেন্ডার (Witness to Surrender)* অনুযায়ী, 'উত্তরদিক থেকে হলুদ এবং দক্ষিণদিক থেকে সাদা' সৈন্যরা যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে আসছে, এই মর্মে রিপোর্ট বের করে রাওয়ালপিন্ডি

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মনোযোগ যুদ্ধবিরতি থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সিগন্যাল ইন্টারসেপশনের কাজে নিয়োজিত আমাদের সংস্থা এই বার্তাগুলো সংগ্রহ করে। আমাদের উত্তরসীমান্তের পর্যবেক্ষণকেন্দ্রগুলোতে যোগাযোগ করলে তারা আমাদেরকে জানায় যে, চীনাদের গতিবিধির কোনো নিশানাও দেখা যাচ্ছে না। সালিক বলেছেন যে, জেনারেল নিয়াজি ঢাকাস্থ চীনা ও আমেরিকান কূটনৈতিক মিশনের প্রধানদের সাথে এব্যাপারে যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সরকারের এধরনের কোনো পরিকল্পনার কথা জানেন না বলে জানিয়েছেন। পাকিস্তানি ইস্টার্ন কম্যান্ড চীনা ও আমেরিকান সাহায্যের কথা আবার জিজ্ঞাসা করলে তাদেরকে আরো ছত্রিশ ঘণ্টা অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়। রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠানো এই বার্তাগুলো আমরা ইন্টারসেপ্ট করি এবং নিশ্চিত হই যে, চীন ও আমেরিকার তৎপরতা ঘেউ ঘেউয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; কামড়ানোর কোনো ইচ্ছেই তাদের নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী জাহাজ *এন্টারপ্রাইজ (Enterprise)*-এর গতিবিধি নিয়ে দিল্লীতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এর সাথেকার অন্য যুদ্ধজাহাজগুলোর মধ্যে ছিল চারটি গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়্যার, একটি গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট ও একটি ল্যান্ডিং ক্র্যাফ্টসহ একটি উভচর অ্যাসল্ট শিপ। ১৩/১৪ ডিসেম্বর রাতে মালাক্কা (Malacca) প্রণালী অতিক্রম করে এই টাস্কফোর্স অগ্রসর হয়। আমাদের অনুমতি নিয়ে ১২ ডিসেম্বর ব্রিটিশ ও আমেরিকান নাগরিকদেরকে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের তিনটি এবং জাতিসংঘের একটি সি১৩০ (C130) বিমানে করে রানওয়ের যে অল্প জায়গাটুকু ভারতীয় বিমানবাহিনী অক্ষত রেখেছিল, সেটুকুই ব্যবহার করে ঢাকা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। রয়্যাল এয়ার ফোর্সের ক্রুরা পরে রিপোর্ট করে যে, ভারতীয় বিমানবাহী জাহাজ *ভিক্রান্ত*-এর বিমান থেকে তাদের ওপরে গুলিবর্ষণ করা হয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশত তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এয়ার চিফ মার্শাল পি সি লাল (P C Lal)-এর স্মৃতিকথা *মাই ইয়ারস্ উইথ দি আইএএফ (My Years with the IAF)*-এ এই অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। কাজেই আমেরিকানরা নিশ্চয়ই আশা করেনি যে, আমরা বিশ্বাস করব, শুধু বেসামরিক নাগরিকদেরকে সরিয়ে নেওয়াই হচ্ছে টাস্কফোর্সের উদ্দেশ্য। ভারতীয়দের মনে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা যে একটি সন্দেহের জন্ম দিতে চেয়েছিল, এটা পরিষ্কার। টেলিফোনে নিয়মিত কথাবার্তার মধ্যে অ্যাডমিরাল কৃষ্ণণ একদিন টাস্কফোর্সের গতিবিধি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলে আমি আমেরিকান হস্তক্ষেপের কোনো আশঙ্কা দেখি না বলে মত প্রকাশ করি। আমি নিশ্চিত ছিলাম, তাদের এই গতিবিধির উদ্দেশ্য হল আমাদেরকে একটু ভয় দেখানো। যাই হোক, এই নৌবহর এত দূরে ছিল যে, সময়মতো তার পক্ষে উত্তর-বঙ্গোপসাগরে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। এসব যুক্তি কৃষ্ণণের মনঃপূত হয়নি। শুধু তাই নয়, তাঁর আরো ধারণা জন্মে যে, ড্যাফ্নে (Daphne) শ্রেণীর আরেকটি পাকিস্তানি সাবমেরিন উপসাগরে ঘোরাফেরা করছে। এই বিশাল বিস্তৃতি কাভার করার ক্ষমতা ড্যাফ্নের ছিল

না। তা সত্ত্বেও তাঁর ধারণা হয় যে, সমুদ্রের মধ্যেই কোথাও রিফুয়েলিংয়ের ব্যবস্থা থাকা অসম্ভব নয়। সম্ভবত এই কারণেই উভচর আক্রমণের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয় এবং ১৩/১৪ তারিখে উখিয়াতে ল্যান্ডিংয়ে বিমানবাহী জাহাজ *ভিক্রান্ত*-এর সহায়তা করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি।

পাকিস্তানি ইস্টার্ন কম্যান্ডের ওপরে জেনারেল মানেকশ'র আত্মসমর্পণের আহ্বানের প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। প্রথমদিকে মানেকশ' এসব বার্তা পাঠাতেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি (Rao Farman Ali)-র উদ্দেশ্যে। ৯ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ড. এ এম মালিক (Dr A M Malik) অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির সুপারিশসহ ইয়াহিয়া খানের কাছে বার্তা পাঠান। ইয়াহিয়া খান উত্তরে জানান যে, গভর্নরকেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে জেনারেল নিয়াজিকে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তখন জাতিসংঘের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক হেনরিকে পাঁচ দফার একটি প্রস্তাব দেয়া হয়: অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি; পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের প্রত্যাবাসন; ফিরে-যেতে-ইচ্ছুক অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানির প্রত্যাবাসন; ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং কোনো ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নেয়ার নিশ্চয়তা। রাওয়ালপিন্ডি থেকে নির্দেশের জন্য অপেক্ষমাণ গভর্নর ১৪ ডিসেম্বর বেলা বারোটায় গভর্নমেন্ট হাউসে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক আহ্বান করেন। সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্সের প্রধান লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল পি সি ভল্ল সকাল নটা তিরিশ মিনিটে আমাকে এই ইন্টারসেপ্‌শনটি এনে দেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে শিলংয়ের ইস্টার্ন এয়ার কম্যান্ডে সুদক্ষ সিনিয়র এয়ার স্টাফ অফিসার এয়ার ভাইস মার্শাল দেবাশরকে ফোন করি। আমরা একমত হই যে, বৈঠকটি ভেঙে দিতে পারলে গভর্নর আরো বেশি করে আত্মসমর্পণের দিকে ঝুঁকবেন। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা জানি না, দুই গভর্নর হাউসের মধ্যে কোনটিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে—নতুনটা নাকি পুরনোটা। আমার ধারণা, পুরাতনটিতেই বৈঠক হবে; কারণ ইয়াহিয়া ঢাকায় এলে নতুন হাউসেই উঠতেন। ট্যুরিস্ট গাইড ম্যাপ থেকে আমরা পুরাতন গভর্নর হাউস চিহ্নিত করে আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সেখানে কোনো বিমানবিধ্বংসী কামান আছে কি না, দেবাশর জানতে চাইলে আমি জানাই যে, ওখানে সেসব নেই। আশ্বস্ত হয়ে তিনি বললেন, আকাশযুদ্ধের সম্ভাবনা না থাকায় এটা একেবারে 'ছেলের হাতের মোয়া (piece of cake)'-র মতো অনায়াসসাধ্য। আমাদের বিমানগুলো নিখুঁতভাবে আক্রমণ সম্পন্ন করে। প্রাথমিক আক্রমণের অব্যবহিত পরে গ্যাভিন ইয়াং (Gavin Young) গভর্নর হাউসে জাতিসংঘের জন কেলির সাথে দেখা করতে গিয়ে কী দেখেছেন, সেটা তিনি তাঁর *ওয়ার্ল্ডস্ অ্যাপার্ট (Worlds Apart)* নামক বইতে বর্ণনা করেছেন। গ্যাভিন ইয়াংকে কেলি বলেন যে, ড. মালিক তাঁর মন্ত্রিসভার সাথে বৈঠক করছেন। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি উপস্থিত ছিলেন। গ্যাভিন ইয়াং ও কেলি গভর্নরের সাথে দেখা করতে যান। কেলিকে আতঙ্কিত ড. মালিক জিজ্ঞাসা করেন, "আমাদের কি এখন

হাল ছেড়ে দেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?" কেলি জাতিসংঘকে এর মধ্যে জড়াতে চাননি বলে সরাসরি প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। গ্যাভিন ইয়াং এরপর ড. মালিকের সাথে দেখা করলে তিনি জানতে চান যে, তাঁর পরিবারকে তিনি কোনো হোটেলে পাঠিয়ে দেবেন কি না। পরবর্তী বিমান আক্রমণ শুরু হলে ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্যে ড. মালিক পদত্যাগপত্র পেশ করেন। আক্রমণ যখন পুরোদমে চলছে, তখন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ড. মালিক তাঁর জুতো-মোজা খুলে ওজু করে মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে বাঙ্কারের মধ্যে নামাজ আদায় করেন। এটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্নরের শেষ কাজ।

এর আগে ১৩/১৪ ডিসেম্বর রাতে নিয়াজি পাকিস্তানি কম্যান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল হামিদ (Hamid)-এর সাথে কথা বলে তাঁকে অনুরোধ করেন, যাতে ইয়াহিয়া খানকে বলে অবিলম্বে তিনি যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার ব্যবস্থা করেন। ১৪ ডিসেম্বর নিয়াজির কাছে এক বার্তা পাঠিয়ে ইয়াহিয়া অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। নিয়াজিকে পাঠানো ইয়াহিয়ার বার্তাটি ছিল:

> প্রবল প্রতিকূলতার মুখেও আপনারা বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। জাতি আপনাদেরকে নিয়ে গর্বিত এবং সারা পৃথিবী প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিদ্যমান সমস্যার সমাধানকল্পে মানুষের-পক্ষে-সম্ভব এমন সমস্ত পদক্ষেপই আমি গ্রহণ করেছি। বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে আপনারা পৌঁছেছেন যে, এরপরে প্রতিরোধের যে কোনো প্রচেষ্টাই হবে অমানুষিক এবং সেটা কার্যকরীও হবে না; বরং তা আরো প্রাণহানি ও ধ্বংসেরই কারণ হবে। এই অবস্থায় আপনাদের উচিত হবে যুদ্ধ বন্ধ করে পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও অন্যান্য বিশ্বস্ত সহযোগীদের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সমরাভিযান বন্ধ করে পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীর এবং অন্যান্য জনসাধারণ যারা দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারে, তাদের সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারতকে অনুরোধ করার জন্য আমি ইতোমধ্যেই জাতিসংঘে তৎপরতা চালিয়েছি। (You have fought a heroic battle against overwhelming odds. The nation is proud of you and the world full of admiration. I have done all that is humanly possible to find an acceptable solution to the problem. You have now reached a stage where further resistance is no longer humanly possible nor will it serve any useful purpose. It will only lead to a further loss of life and destruction. You should now take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of armed forces personnel, all those from West Pakistan, and all loyal elements. Meanwhile I have moved the UN to urge India to stop hostilities in East Pakistan forthwith and

to guarantee the safety of armed forces and all other people who may be the likely targets of miscreants.)

ভারতীয় সময় বিকেল তিনটায় নিয়াজি এই বার্তা পান। এরপর নিয়াজি আর ফরমান আলি ইউনাইটেড স্টেট্স কনসাল জেনারেল হার্বার্ট স্পিভ্যাক (Herbert Spivack)-এর সাথে দেখা করতে যান। স্পিভ্যাককে নিয়াজি ভারতের সাথে পূর্ববর্ণিত বিষয়াবলির নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। জবাবে স্পিভ্যাক বলেন যে, বিষয়টি তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে। তা সত্ত্বেও তিনি একটি বার্তা পাঠারেন। রাও ফরমান আলি বার্তাটির খসড়া তৈরি করে স্পিভ্যাককে দেন। যুদ্ধবিরতির জন্য আগের প্রস্তাবনাগুলোর আলোকে বার্তাটি প্রণীত হয়:

ক্রমবর্ধমান প্রাণহানি ও সম্পদ ধ্বংসের যবনিকাপাতের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সম্মানজনক শর্তসাপেক্ষে আমরা যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে ইচ্ছুক:

ক. যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে যাবতীয় সামরিক অভিযান বন্ধ হবে।

খ. পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার জাতিসংঘের গৃহীত ব্যবস্থা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তরিত হবে।

গ. যে বিষয়গুলোতে জাতিসংঘ নিশ্চয়তা দেবে, সেগুলো হল:

১. পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারেনি, সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর এমন সকল সদস্যের নিরাপত্তা।

২. সকল পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক নাগরিক ও সরকারি চাকুরিজীবী, যারা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি, তাদের নিরাপত্তা।

৩. ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অস্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিরাপত্তা।

৪. মার্চ ১৯৭১ থেকে যারা পাকিস্তান সরকারের চাকুরি করেছেন অথবা সরকারকে সহায়তা করেছেন এবং পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার নিশ্চয়তা।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে গভর্নরের কাছে ফরমান আলি এই বার্তার একটি অনুলিপি প্রদান করেন।

বার্তাটি ভারতে না পাঠালেও অবশ্য ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়। ১৪ ডিসেম্বর আনুমানিক বিকেল পাঁচটায় কলকাতাস্থ কনসুলার অফিসের একজন কূটনীতিক স্পিভ্যাকের সাথে নিয়াজির ভাষায় যুদ্ধবিরতি অথবা আত্মসমর্পণের প্রস্তাবনা নিয়ে তাঁর আলোচনার কথা আমাকে জানান। সাথে সাথে আমি কলকাতাস্থ ইউনাইটেড স্টেট্স কনসাল জেনারেল হার্বার্ট গর্ডন (Herbert Gordon)-এর কাছে ফোন করি। তিনি এ বিষয়ে তাঁর অবগতির কথা অস্বীকার করেন। আমি তাঁকে আবার একটু পরীক্ষা করে

দেখার কথা বলতেই তিনি বললেন, "জেক, সত্যি বলছি, নিয়াজির অনুরোধ সম্পর্কে আমি আসলেই কিছু জানি না।" এরপরে আমি জেনারেল মানেকশ'কে ফোন করে তাঁকে দিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করি। তথ্যটি সঠিক কি না, সে বিষয়ে মানেকশ' আমাকে প্রশ্ন করলে আমি তাঁকে জানাই যে, একজন দায়িত্বশীল পদস্থ কর্মকর্তা আমাকে ফোনে এটা জানান এবং আমি তাঁকে বিশ্বাস করি। এর মধ্যে আমি নিয়াজির সাথে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করব বলে তাঁকে জানাই। জেনারেল মানেকশ' মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলেন এবং তিনি জানান যে, স্পিভ্যাককে করা কোনো অনুরোধ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। আপাতদৃষ্টে মনে হয়, বার্তাটি স্পিভ্যাক ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে পাঠান, যিনি পরবর্তীতে ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেন। পরে কিসিঞ্জার জানান, স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিষয়টি একদিন ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবার আগে পাকিস্তানিরা পশ্চিমে আরো কিছু এলাকার দখল নিতে পারে।

জেনারেল মানেকশ' বার্তাটি পান ১৫ ডিসেম্বর। তিনি নিশ্চয়তা দেন, পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। এ বিষয়ে পাকিস্তানি ইস্টার্ন কম্যান্ডকে ফোর্ট উইলিয়ামে ইস্টার্ন কম্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। পাকিস্তানি কম্যান্ডার-ইন-চিফ এই শর্ত গ্রহণ করার জন্য নিয়াজিকে সংকেত দেন। ১৫ ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটা থেকে পরদিন বেলা ৯টা পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির জন্য উভয়পক্ষ রাজি হয়। পরবর্তীতে এই মেয়াদ বিকেল তিনটা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। যতটা বোঝা যায়, ইয়াহিয়া যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিলেন, যেটা ছিল আত্মসমর্পণেরই নামান্তর, যদিও হাসান জহির (Hasan Zaheer) তাঁর *দ্য সেপারেশন অভ্ ইস্ট পাকিস্তান (The Separation of East Pakistan)* বইতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পাকিস্তানিরা 'আত্মসমর্পণ (surrender)' শব্দটি পরিহারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ঢাকায় আত্মসমর্পণ নিয়ে আলোচনার সময় নিয়াজি আশা করেছিলেন, স্পিভ্যাককে দেয়া তাঁর প্রস্তাবনা অনুযায়ী দলিল তৈরি করা হবে। সম্ভবত এই কারণেই পরবর্তীতে ঢাকায় আত্মসমর্পণের দলিল দেখার পরে সেটা গ্রহণ করতে নিয়াজির অনীহা লক্ষ করা যায়।

১৬ ডিসেম্বর সকাল সোয়া নটায় জেনারেল মানেকশ' ফোনে আমাকে অবিলম্বে ঢাকায় গিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে বলেন। আত্মসমর্পণের দলিলের যে খসড়া এর আগে আমরা পাঠিয়েছিলাম, সেটা অনুমোদিত হয়েছে কি না, এটা জানতে চাইলে প্রশ্নটি তিনি কৌশলে এড়িয়ে যান। আমি তখন জানতে চাইলাম, সুনির্দিষ্টভাবে কোন কোন বিষয়ে কী কাঠামোতে আমি আলোচনা করব। উত্তরে তিনি আমাকে বেশি ঝামেলা বাধাতে নিষেধ করলেন এবং বললেন যে, কী করতে হবে, এটা আমি ভালই বুঝি। ব্রিগেডিয়ার সেথনাকে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠাবেন যাতে টাইপ-করা দলিল অরোরা হাতে করে নিয়ে আসতে পারেন। মানেকশ'কে আমি জানালাম, আমি একটি

রেডিও মেসেজ পেয়েছি এবং তাতে নিয়াজি আমাকে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করেছেন, যদিও আমি যেতে তেমন আগ্রহী নই। তিনি বললেন, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত কি না, সেটা পরে তিনি আমাকে জানাবেন। অরোরাকে আমি এ বিষয়ে ব্রিফ করে ঢাকায় যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। কর্নেল ইন্টেলিজেন্স খারা ও অ্যাডভান্স হেডকোয়ার্টার্সের এয়ার কমোডর পুরুষোত্তম (Purushottam)-কে আমার সাথে যেতে বললাম। এর আগে আত্মসমর্পণের দলিলের যে খসড়াটি অনুমোদনের জন্য দিল্লীতে পাঠিয়েছিলাম, সেটার একটা কপি আমাদের সাথে নিয়ে নিলাম।

সেথনাকে ব্রিফ করে তাঁকে ভারতীয় ও বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য হেলিকপটারের ব্যবস্থা করতে বললাম। তাঁকে আরো বললাম যে, ইস্টার্ন কম্যান্ডের সেনাবাহিনী প্রধান ছাড়াও নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানরা এতে যোগদান করছেন। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী থেকে কর্নেল ওসমানী ও উইং কম্যান্ডার খন্দকার যেন উপস্থিত থাকেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য আত্মসমর্পণের আলোচনার বিষয়টি সেথনা সমস্ত সেনাস্থাপনাকে জানিয়ে দেন এবং যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে বলেন।

হেলিপ্যাডের দিকে যাবার পথে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই মিসেস ভান্তি অরোরা (Bhanti Aurora)-র সাথে দেখা। তিনি যখন বললেন যে, ঢাকায় আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে আমার সাথে তাঁর দেখা হবে, আমি ভাবলাম তিনি রসিকতা করছেন। আমার অভিব্যক্তিতে বিস্ময় লক্ষ করে তিনি যোগ করলেন, "আমি বসব আমার কর্তার পাশে।" আমি দ্রুত অরোরার অফিসে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সত্যিই তিনি তাঁর স্ত্রীকে এই অনুষ্ঠানে নিয়ে যাচ্ছেন কি না। জবাবে তিনি বললেন যে, তিনি মানেকশ'র অনুমোদন নিয়েছেন। আমি বললাম, ঢাকায় এখনো লড়াই চলছে বলে খবর আসছে। এই অবস্থায় কোনো মহিলাকে সেখানে নিয়ে যাওয়াটা কোনোভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বাঁকা সুরে তিনি উত্তর দিলেন যে, ঢাকায় তাঁর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আমার। আমি বুঝে গেলাম, এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। আমি নিজের কাজে চলে গেলাম।

যশোরে আমরা হেলিকপটার পরিবর্তন করতে নামলে আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে পাঠানো একটি বার্তা আমাকে দেয়া হয়। তাতে বলা হয়েছে, সরকার আমাকে নিয়াজির লাঞ্চের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। আত্মসমর্পণের দলিলের খসড়ার অনুমোদন-সম্পর্কিত কোনো বার্তা তখনো আমি পাইনি। দূর থেকে গোলাবর্ষণের শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। ঢাকার এয়ারফিল্ডের প্রবেশমুখে এসে আমরা একটি হেলিকপ্টারকে চলে যেতে দেখি। টারম্যাকে ১৮ জন পাকিস্তানি সৈন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিমানবিধ্বংসী কামান যে আমাদের হেলিকপ্টারের দিকে নিশানা করা আছে, সেটাও আমরা লক্ষ করি। এয়ার কমোডর ফিরে যেতে চাইলেও পাইলটকে আমি ল্যান্ড করার নির্দেশ দিই। পাকিস্তানি ইস্টার্ন কম্যান্ডের চিফ অভ্ স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী (Baqar Siddiqui) আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঢাকাস্থ জাতিসংঘ প্রতিনিধিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে

আলোচনায় তাঁর অফিস ব্যবহারের জন্য তিনি প্রস্তাব দেন। কিন্তু আমি চাইনি, জাতিসংঘ এতে কোনোভাবে জড়িত হোক। কারণ বর্তমান সমস্যার প্রেক্ষাপটে তাদের কিছু করণীয় আছে বলে আমি মনে করি না। এয়ার কমোডর পুরুষোত্তমকে আমি পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের সাথে যোগাযোগ করে অরোরা ও তাঁর সফরসঙ্গীদের নিরাপদ অবতরণ নিশ্চিত করতে বলি। টারম্যাকের ওপরের ১৮টি বিমান সম্পর্কে আমি তাঁকে ঠাট্টা করি। এই বিমানগুলো ভূপাতিত অথবা ধ্বংস হওয়ার খবর আমরা শুনেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী, কর্নেল এম এস খারা ও আমি গাড়িতে করে নিয়াজির হেডকোয়ার্টার্সে যাই। পথে মুক্তিবাহিনী আমাদেরকে থামায়। তারা খুবই জঙ্গি মেজাজে ছিল এবং যে কোনো রকমের ভাংচুর শুরু করার জন্য তৈরি ছিল। তাদের সাথে ছিলেন বিদেশী সংবাদ সংস্থার কয়েকজন প্রতিনিধি। আমি ব্যাখ্যা করি যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করবে। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে এবং পাকিস্তানি কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্স দখল করে নিয়াজি ও তাঁর অনুচরদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে চায়। এটা নিয়ে তাদের সাথে আমাদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। আমি পরিষ্কার ভাষায় বলি যে, বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে এবং এই সরকারের সদস্যরা ক্ষমতা গ্রহণের জন্য শিগ্‌গিরই ঢাকায় এসে পৌঁছাবেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে কোনো অবনতি না ঘটে বা কোনো ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা যাতে না নেয়া হয়, মুক্তিবাহিনীকে আমি সেটা নিশ্চিত করতে বলি। যুদ্ধবিরতি যেহেতু কার্যকর হয়েছে এবং পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়েছে, জেনেভা কনভেনশনের প্রতি সম্মান দেখাতেই হবে। তারা স্লোগান দিতে থাকে এবং হুমকি দেয় যে, তারা কারো তোয়াক্কা করে না এবং তারা তাদের ইচ্ছেমতো কাজ করবে। আমি তাদেরকে তখন বললাম, জেনেভা কনভেনশনের ধারা যাতে যথাযথভাবে অনুসৃত হয়, সেটা আমরা নিশ্চিত করব। বিদেশী সাংবাদিকরা এর পরিবর্তে রিপোর্ট করেন যে, আমি তাদেরকে গুলি করার হুমকি দিয়েছি। এরপরে তারা আমাদেরকে যেতে দেয় এবং দুপুর একটায় আমরা হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছাই।

জেনারেল নিয়াজি তাঁর অফিসে আমাকে স্বাগত জানান। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিষয়ের উপদেষ্টা মেজর-জেনারেল রাও ফরমান আলি, মেজর জেনারেল জামশেদ (Jamshed), নৌবাহিনীপ্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ (Shariff), বিমানবাহিনীর এয়ার কমোডর ইমাম (Imam) ও ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী। মেজর জেনারেল জি সি নাগরা (G C Nagra), জামালপুরে গুরবক্স গিল আহত হওয়ার পর যিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছান। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার একদিন পর নাগরা পাকিস্তানি আউটপোস্টে একটি বার্তা পাঠান, "প্রিয় আবদুল্লাহ্, আমি মিরপুর ব্রিজে। তোমার প্রতিনিধি পাঠাও (Dear Abdullah, I am at Mirpur Bridge. Send your representative.)।" নিয়াজি, যিনি আমাকে আশা করছিলেন, এই বার্তা পেয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে

পড়েন। এই অবস্থায় কী তাঁর করণীয়, আত্মসমর্পণ আলোচনায় নাগরার কোনো ভূমিকা আছে কি না, কিছুই তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। সাদা পতাকাসহ নাগরা ও তাঁর পথ প্রদর্শককে নিয়াজির নির্দেশে পাকিস্তানি আউটপোস্টে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং পাকিস্তানিরা তাঁকে নিয়াজির হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে আসে। নাগরা ও নিয়াজি পাঞ্জাবি ভাষায় আদিরসাত্মক ঠাট্টা-তামাশায় মেতে ওঠেন। সালিক তাঁর বইতে লিখেছেন যে, কৌতুকগুলো ছাপার অযোগ্য হওয়ায় তার কোনোটাই উল্লেখ করা গেল না। আমি নিয়াজিকে বললাম যে, টঙ্গীসহ বিভিন্ন এলাকায় এখনো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে। তাঁর উচিত লড়াই বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রতি অর্ডার ইস্যু করা। নিয়াজি যখন অর্ডার ইস্যু করছেন, তখন নাগরাকে বাইরে ডেকে এনে আমি তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিই। প্রথমত, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য ঢাকার অভ্যন্তরে আনতে হবে। তারপর আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি মনে করি, এতদিন যারা নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছে, সেই জনগণের সামনে প্রকাশ্যেই এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। অতীতে অন্যান্য আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠিত হয়েছে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণের পর। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল, সেই সাথে আছে প্রয়োজনীয় সংস্থানের অভাব এবং হাতে আর মাত্র দু-তিন ঘণ্টা সময়, যার মধ্যে আত্মসমর্পণ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পূর্ব-আলোচনা সেরে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। নিকটবর্তী এলাকা থেকে তখনো গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমাদের প্যারাশ্যুট রেজিমেন্ট ও একটি পাকিস্তানি ইউনিট দিয়ে নাগরাকে আমি গার্ড অভ্ অনারের আয়োজন করতে বলি। দলিলে সই করার জন্য তাঁকে একটি টেবিল ও দুটি চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হয়। যেখানে জাতিসংঘ ও রেড ক্রস প্রতিনিধিদল, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সদস্যবৃন্দ এবং বিদেশী নাগরিকরা আশ্রয় নিয়েছেন, সেই ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তাঁকেই করতে হয়। ছোট একটি দল ও একটি রেডিও ডিটাচ্‌মেন্ট আমার জন্য রেখে যেতে বলি; কারণ আর্মি কম্যান্ডারকে অভ্যর্থনা জানাতে আমাকে আবার এয়ারপোর্টে যেতে হবে। আর্মি কম্যান্ডারের নিরাপত্তার জন্য বিমানবন্দরে একটি দল পাঠানোর নির্দেশও তাঁকে আমি দিই।

আমি নিয়াজির অফিসে ফিরে এলে কর্নেল খারা আত্মসমর্পণের শর্তাবলি পাঠ করে শোনান। নিয়াজির চোখ থেকে দরদর করে পানি পড়তে থাকে, সেই সাথে ঘরে নেমে আসে পিনপতন নিস্তব্ধতা। উপস্থিত অন্যানদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। তাঁদের আশা ছিল, ১৪ ডিসেম্বরে স্পিভ্যাককে দেয়া তাঁদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী এই দলিল প্রণীত হবে, যেটাতে জাতিসংঘের দেয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী যুদ্ধবিরতি ও প্রত্যাবর্তন কার্যকর করা হবে। ফরমান আলি ভারতীয় ও বাংলাদেশী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান। নিয়াজি বলেন যে, আমি তাঁকে যেটাতে সই করতে বলছি, সেটা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল। আমরা যখন এই দলিল প্রণয়ন করি, তখন আমরা একটা বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ রেখেছি যে, কোনোভাবেই এটা যেন অপমানজনক মনে না হয়। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, অনমনীয় নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

পরবর্তীতে সুফল বয়ে আনেনি। পরাজিত প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা না করাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতীতে যা কিছুই ঘটুক না কেন, কিছুটা ছাড় তাদেরকে অবশ্যই দেয়া উচিত। রেডিওতে যা বলেছিলাম বা তাঁর সাথে আমার ফোনে যে কথা হয়েছিল, সেটার সূত্র ধরে তাঁকে আমি আবারও স্মরণ করিয়ে দিই যে, সৈনিকের প্রাপ্য সম্মান তাঁরা পাবেন এবং জেনেভা কনভেনশন কঠোরভাবে পালন করা হবে। এছাড়াও আমরা সংখ্যালঘু জাতিসত্তাগুলোর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিই। এ ধরনের নিশ্চয়তা ও ধারা ইতিহাসের অন্য কোনো আত্মসমর্পণের দলিলে নেই। অন্যদের পড়ার জন্য নিয়াজি দলিলটি এগিয়ে দেন। তাঁরা এর কিছু পরিবর্তন দাবি করেন। আমি আবারো বলি যে, এর শর্তাবলি যথেষ্ট উদার। এর পরে তাঁদেরকে আলোচনার সুযোগ দিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাকিস্তানি সেন্ট্রির সাথে গল্পগুজব শুরু করি। তার বাড়ি, পরিবার ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে প্রথমে তাকে খানিকটা বিভ্রান্ত দেখায়। এরপরে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সে যা বলল, তার মর্মার্থ এই যে, একজন ভারতীয় আর্মি জেনারেল তার ভালমন্দ সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন, অথচ এটা নিয়ে তার নিজের অফিসারদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি অফিসে ফিরলে নিয়াজি বললেন, যারা তখন পর্যন্ত প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল, তাদের কাছেও যুদ্ধবিরতির নির্দেশ পৌঁছে গেছে এবং কোথাও আর কোনো লড়াই নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দলিলটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি না। কোনো মন্তব্য না করে তিনি কাগজটা আমাকে ফেরত দেন। সেটাকে আমি তাঁর সম্মতি হিসেবে ধরে নিই। এর পর আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া নিয়ে নিয়াজির সাথে আমরা আলোচনা করি। তিনি চান যে, আত্মসমর্পণ এই অফিসেই অনুষ্ঠিত হোক। রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা তাঁকে জানাই। "এটা ঠিক নয়," বলে তিনি প্রতিবাদ করেন। আমি তাঁকে বললাম যে, ভারতীয় ও পাকিস্তানি ডিটাচ্‌মেন্ট লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল অরোরাকে গার্ড অভ্ অনার প্রদর্শন করবে। এর পরে অরোরা ও নিয়াজি দলিলে স্বাক্ষর করবেন। সবশেষে নিয়াজি তাঁর তরবারি সমর্পণ করবেন। নিয়াজি জানালেন, তাঁর কোনো তরবারি নেই। আমি বললাম, সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিস্তল সমর্পণ করবেন। মনে হল, তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি নীরব রইলেন। এটাও আমি তাঁর সম্মতি হিসেবে ধরে নিলাম। প্রকাশ্য জনসমক্ষে আত্মসমর্পণের আয়োজন এবং সম্মিলিত গার্ড অভ্ অনার ও সাদামাটা টেবিল নিয়ে কিছুটা সমালোচনা হয়। অথচ আমাকে কোনো দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি এবং আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ও প্রটোকল বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময় বা সংস্থানও আমি পাইনি, যদিও এরই মধ্যে সবকিছুর ব্যবস্থা করা ছাড়াও পাকিস্তানিদের অবিলম্ব নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের জন্য শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা আমার নিজের উদ্যোগেই করতে হয়। আনুমানিক তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণের শর্তাবলি চূড়ান্ত করে উপযুক্ত একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হয়। আমাদের বাহিনী তখনো ঢাকায় প্রবেশ করেনি এবং রাজধানী ও তার আশেপাশের এলাকায় টুকটাক সংঘর্ষ তখনো চলছিল। অতীতের দিকে চোখ ফেরালে এখন মনে

হয়, তখনকার পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক। যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এরপরে নিয়াজি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর অফিসার ও সৈনিকেরা তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সাথে রাখতে পারবে কি না। এর আগে টেলিফোনে কথা বলার সময়ও এই একই প্রশ্ন তিনি করেছিলেন। তখন আমি আভাস দিয়েছিলাম যে, এই অনুরোধ আমরা বিবেচনা করে দেখব। মুক্তিবাহিনীর ব্যাপারে নিয়াজি সন্ত্রস্ত ছিলেন বলে তিনি জানতে চান, আত্মসমর্পণের পর তাঁর লোকজনের নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা হবে। আমি এই বলে তাঁকে আশ্বস্ত করি যে, আমাদের সৈন্যরা শহরে ঢুকতে শুরু করেছে এবং ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি তারা সঞ্চার করতে পারবে। আবার তিনি জানতে চান, মুক্তিবাহিনীর হাতে যেহেতু পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র আছে, সেহেতু পর্যাপ্ত ভারতীয় সৈন্য এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত পাকিস্তানিরা নিজেদের কাছে অস্ত্র রাখতে পারবে কি না। উত্তরে আমি বলি যে, আমরা নিরস্ত্র না করা পর্যন্ত তারা নিজেদের কাছে অস্ত্র রাখতে পারবে এবং এই নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় আমাদের তিন-চারদিন পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরে পাকিস্তানিদেরকে নিরস্ত্র না করার সিদ্ধান্তও সমালোচিত হয়। কিন্তু ঢাকায় আমাদের পর্যাপ্ত সৈন্য এসে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত এটা না করে উপায় ছিল না। আমি শুধু আশা করছিলাম, পাকিস্তানিদেরকে দলিলের যে খসড়াটি আমি দেখিয়েছি, অরোরা যেন স্বাক্ষরের জন্য তাঁর সাথে সেটাই নিয়ে আসেন। এই তথ্যটি রেডিও মারফত জানাবার জন্য আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু নাগরা তাঁর সাথে করে এসকর্ট ও রেডিও ডিটাচ্‌মেন্ট নিয়ে চলে গেছেন, কিছুই রেখে যাননি। শেষপর্যন্ত পাকিস্তানি রেডিও মারফত ইস্টার্ন কম্যান্ডে আমি জানাই যে, আত্মসমর্পণের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। আমি তাদেরকে বলি যে, আর্মি কম্যান্ডারের ঢাকায় পৌঁছানোর আনুমানিক সময় যেন আমাকে জানানো হয়। এর কোনো উত্তর আমি পাইনি। ঢাকায় অবতরণের পরিবর্তে আর্মি কম্যান্ডার আগরতলা যান ৪র্থ কোর কম্যান্ডার এবং সেই কোরের ডিভিশনাল কম্যান্ডারদেরকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে নিতে।

হেডকোয়ার্টার্সের বাইরে অস্থিরভাবে আমি পায়চারি করছিলাম। এর মধ্যে আমার অজান্তে বিবিসি (BBC)-র অ্যালান হার্ট (Allan Hart) আমার ছবি নিতে শুরু করেন। কয়েকমিনিট ধরে এক সাথে আমরা ওঠানামা করি। তাঁর সাথে যে মাইক্রোফোন থাকতে পারে, সেটা আমার মাথায় একেবারেই আসেনি। সৌভাগ্যবশত আমি তেমন কোনো মন্তব্য করিনি। অফিসে ফিরে এলে নিয়াজি আমাকে তাঁর সাথে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানালে আমরা একসাথে মেসের দিকে রওয়ানা দিই। *অবজারভার (Observer)*-এর গ্যাভিন ইয়াং বললেন যে, তাঁরও খুব খিদে পেয়েছে। জানতে চাইলেন, আমাদের সাথে তিনি লাঞ্চ করতে পারবেন কি না। আমি তাঁকে সাথে নিয়ে নিলাম। আমার খেতে ইচ্ছে করছিল না। মেসের যে চিরাচরিত খাবার মুরগির রোস্ট দিয়ে মেইন কোর্স। গ্যাভিন ইয়াং একটা স্কুপ পেয়ে গেলেন *অবজারভার*-এর দুই পৃষ্ঠা জুড়ে খবরের শিরোনাম হল, 'দ্য সারেন্ডার লাঞ্চ (The Surrender

Lunch)'। পুরো দৃশ্যটাই আমার কাছে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল — মেসের ডিসপ্লেতে রুপা, পাকিস্তানি অফিসাররা খাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে খোশগল্প করছে, যেন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মেসে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। খারা ও আমি এককোণে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাদের সাথে ভ্রাতৃভাবে মিশে যাওয়া বা খাওয়া — কোনোটারই কোনো ইচ্ছে আমাদের ছিল না।

লাঞ্চের পর অরোরার ঢাকায় পৌঁছানোর আনুমানিক সময় জানতে চেয়ে কলকাতায় আবার একটা রেডিও মেসেজ পাঠাই। তাদের কাছে কোনো খবর পাওয়া গেল না। বিকেল তিনটায় নিয়াজিকে আমি আমাদের সাথে এয়ারপোর্টে যেতে বলি। সামনে পাইলট-জিপ নিয়ে আমরা তাঁর গাড়িতে করে এয়ারপোর্ট যাই। এখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত হয়। মুক্তিবাহিনী আমাদেরকে এয়ারফিল্ডে যেতে বাধা দেয়। তাদের কেউ কেউ গাড়ির বনেটের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের সৌভাগ্য যে, শিখ খারা আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি তাঁর পাগড়িসহ মাথা গাড়ি থেকে বের করে বলেন যে, নিয়াজি ভারতীয় সেনাবাহিনীর বন্দি এবং আমাদেরকে বাধা দেয়া তাদের উচিত হচ্ছে না। চতুর্দিক থেকে হালকা অস্ত্রের বিচ্ছিন্ন গোলাগুলির শব্দ তখনো শোনা যাচ্ছিল। অনেক ঝামেলার মধ্যে দিয়ে আমরা এয়ারফিল্ডে পৌঁছাই। পৌঁছানোর অব্যবহিত আগে রাস্তা-হারিয়ে-ফেলা দুই ভারতীয় প্যারাট্রুপারসহ একটি জিপ থামিয়ে তাদেরকে আমাদের সাথে আসতে বলি। এটা ছিল সৌভাগ্যের ছোঁয়া। এয়ারফিল্ডে নিয়াজির নিরাপত্তা নিয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। পাইলট-জিপে পাকিস্তানি মিলিটারি পুলিশের হাতে ছিল রিভলবার। প্যারাট্রুপার দুজনের হাতের রাইফ্‌ল ছাড়া দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোনো ভারতীয় সৈন্যের দেখা নেই। খারাকে আমি বললাম যে, নাগরা যেহেতু কাউকে পাঠাননি, খারার উচিত হবে কিছু ভারতীয় সৈন্য — সম্ভব হলে কিছু ট্যাঙ্ক — সংগ্রহ করা। আমরা জানতাম, ৪র্থ কোর ১৫ ডিসেম্বর রাতে কিছু ট্যাঙ্ক মেঘনা নদী পার করার চেষ্টা করছিল। কী করা যায়, দেখতে খারা বেরিয়ে যান। এর সামান্য পরে এক ট্রাক বোঝাই মুক্তিবাহিনী রানওয়ের অন্য পাশে এসে থামে। মুক্তিবাহিনীর দুজন সৈন্যের পিছনে কাঁধে মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্কের ব্যাজ লাগিয়ে একজন লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। এই লোকটিই 'বাঘা' সিদ্দিকী, যাঁকে আমি তাঁর-সম্পর্কে-শোনা বর্ণনার সাথে মিলিয়ে চিনতে পারি। বিপদের গন্ধ পেয়ে আমি নিয়াজিকে আড়াল করার জন্য প্যারাট্রুপার দুজনকে নির্দেশ দিয়ে সিদ্দিকীর দিকে এগিয়ে যাই। আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করার জন্যই নিয়াজিকে বেঁচে থাকতে হবে। আমি আশঙ্কা করছিলাম, সিদ্দিকী হয়ত নিয়াজিকে গুলি করতে এসেছেন। ভদ্রভাবে আমি সিদ্দিকীকে এয়ারপোর্ট ত্যাগ করতে বললে তাঁর মধ্যে নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এর পর অর্ডার হিসেবে আমি এর পুনরাবৃত্তি করি। তখনও তিনি ইতস্তত করছিলেন। তারপর সিদ্দিকী রুষ্টভাবে রানওয়ে অতিক্রম করে ট্রাকের দিকে রওয়ানা দেন। চিৎকার করে আমি তাঁকে এয়ারফিল্ড থেকে ট্রাক সরিয়ে নিতে বলি। ট্রাকটি শেষ পর্যন্ত চলে যাওয়ায় আমি

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। এর সামান্য পরে একটি পিটি ৭৬ ট্যাঙ্ক নিয়ে খারা হাজির হন। কথা ছিল, ২০,০০০ যোদ্ধা নিয়ে সিদ্দিকী আমাদের বাহিনীর সাথে মার্চ করে ঢাকায় আসবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। পশ্চাদপসরণরত পাকিস্তানিদেরকে টাঙ্গাইলে তিনি ইন্টারসেপ্ট না করে এখন ঢাকার এই এয়ারফিল্ডে কী উদ্দেশ্যে এসেছেন, তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। কয়েকদিন পরে তিনি বিদেশী সাংবাদিকদেরকে তাঁর ভাষায় বিশ্বাসঘাতকদেরকে জনসমক্ষে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যার দৃশ্য দেখান। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে এসব ছবি ব্যাপক প্রচার লাভ করে।

আনুমানিক বিকেল সাড়ে চারটায় আর্মি কম্যান্ডার ও তাঁর সফরসঙ্গীরা পাঁচটি এমআই৪ (Mi4) ও চারটি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টারের এক বহরে করে ঢাকায় পৌঁছান। নিয়াজি ও আমি তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে যাই। মিসেস অরোরাকে সাথে নিয়ে আর্মি কম্যান্ডার নেমে আসেন। আরো অবতরণ করেন এয়ার মার্শাল দেওয়ান (Dewan), ভাইস অ্যাডমিরাল কৃষ্ণণ, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল সগত সিং, ৪র্থ কোরের ডিভিশনাল কম্যান্ডাররা ও উইং কম্যান্ডার এ কে খন্দকার। ওসমানীকে অবশ্য দেখা গেল না। নিয়াজি, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল অরোরা ও এয়ার মার্শাল দেওয়ান গাড়ির দিকে এগিয়ে যান। আমারও এই গাড়িতেই যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মিসেস অরোরা তাঁর স্বামীর পাশের আসন দখল করায় সেই আশা আমাকে ছাড়তে হয়। গাড়ি রওয়ানা দিয়ে দিলে আমিও অন্য গাড়িতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে রেসকোর্স ময়দানের দিকে যাত্রা করি। আয়োজনের জন্য সময় খুব কম থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি মোটামুটি ভালভাবে সম্পন্ন হয়। গার্ড অভ্ অনার পরিদর্শনের পর অরোরা ও নিয়াজি টেবিলের দিকে এগিয়ে যান। অরোরার নিয়ে-আসা আত্মসমর্পণের দলিল টেবিলের ওপরে রাখা হয়। নিয়াজি সেটার ওপরে কৌতূহলী চোখ বুলিয়ে নিয়ে সই করেন। অরোরাও সই করেন। দলিলের ওপরে সতর্ক দৃষ্টিপাত করার সময় এটার শিরোনাম লক্ষ করে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই। সেখানে লেখা আছে 'Instrument of Surrender — To Be Signed at 1631 Hours IST (Indian Standard Time)'। ঘড়ির দিকে চোখ ফেলে দেখি, সময় তখন বিকেল চারটা পঞ্চান্ন মিনিট। এরপর নিয়াজি তাঁর কাঁধ থেকে এপ্যলেট (epaulette — সেনা অধিনায়কদের সম্মানসূচক ব্যাজ) খুলে ফেলেন এবং ল্যানিয়ার্ড (lanyard — ছোট দড়িবিশেষ)-সহ .৩৮ রিভলবার অরোরার হাতে ন্যস্ত করেন। তাঁর চোখে অশ্রু দেখা যাচ্ছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত জনতা তখন নিয়াজিবিরোধী ও পাকিস্তানবিরোধী স্লোগান ও গালিগালাজ দিতে থাকে। রেসকোর্সের আশেপাশে তেমন কোনো সৈন্য না থাকায় নিয়াজির নিরাপত্তা নিয়ে আমরা শঙ্কিত ছিলাম। আমরা কয়েকজন সিনিয়র অফিসার মিলে নিয়াজির জন্য একটি বেষ্টনী রচনা করে তাঁকে পাহারা দিয়ে একটি ভারতীয় জিপের কাছে নিয়ে যাই। পাকিস্তানিদেরকে নিরস্ত্র করা, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বন্দিদেরকে ভারতে নিয়ে

যাবার ব্যাপারে সগত সিংকে আমি ব্রিফ করি। এর পরে আগরতলায় যাবার উদ্দেশ্যে আমরা ঢাকা বিমানবন্দরে আসি। আমরা যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন পাকিস্তান নৌবাহিনীর রিয়ার অ্যাডমিরাল শরিফ, যিনি আগেই আমার কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন, অ্যাডমিরাল কৃষ্ণণকে বিদায় জানাতে আসেন। শরিফকে কৃষ্ণণ পিস্তল সমর্পণ করতে বললে তিনি হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে কৃষ্ণণের হাতে তুলে দেন। এর পরে আমাদের হেলিকপ্টার আকাশে ওড়ে।

মানেকশ' কীভাবে আগে থেকে আত্মসমর্পণের সময় হিসেবে বিকেল চারটা একত্রিশ মিনিট নির্ধারিত করলেন, অনেক ভেবেও সেটা আমি বুঝতে পারিনি। আমি জানতাম, পার্লামেন্টে অধিবেশন চলছে। কোনো কারণে মানেকশ' হয়ত প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে, বিকেল চারটা একত্রিশ মিনিটে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠিত হবে। কীভাবে হিসেব করে তিনি এই সময় বের করলেন, তা আজও আমার কাছে এক রহস্য। অথচ এই নির্ধারিত সময়ে অরোরা ও তাঁর সঙ্গীরা ঢাকা এয়ারফিল্ডে অবতরণও করেননি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় (Siddhartha Shankar Ray), যিনি পার্লামেন্টে উপস্থিত ছিলেন, পরে আমাকে বলেছেন যে, ঢাকায় কী ঘটছে, সেটা নিয়ে সবাই খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, পার্লামেন্টে উপস্থিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বারে বারে বলেছেন, আত্মসমর্পণের শর্তাবলি নিয়ে আলোচনার জন্য ঢাকায় গিয়ে জেনারেল জেকব লাঞ্চ করছেন। এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার যে, এমন অনিশ্চিত অশান্ত এক পরিস্থিতিতে একটা দীর্ঘ ও আয়েশি লাঞ্চের জন্য পরবর্তী প্রজন্ম জেনারেল জেকবকে মনে রাখবে!

দুর্ভাগ্যবশত কর্নেল ওসমানী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর জন্য পাঠানো হেলিকপ্টার পথিমধ্যে শত্রুর গুলির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সময়মতো সেটা মেরামত করে তোলা সম্ভব হয়নি। তাঁর অনুপস্থিতির ভুল ব্যাখ্যা করা হয় এবং পরবর্তীতে তা অনেক সমস্যার জন্ম দেয়।

ফোর্ট উইলিয়ামে ফিরে সেদিনের ঘটনাবলির রিপোর্ট লেখার জন্য অপারেশন রুমে ঢুকে পড়ি। ভোরবেলায় আমি আমার কোয়ার্টারে ফিরি। আমি সবে ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় বেল বাজল। *সানডে টাইম্‌স (Sunday Times)*-এর নিকোলাস টোমালিন (Nicholas Tomalin) দরজায় দাঁড়ানো। এই আত্মসমর্পণের ওপরে রিপোর্ট করার জন্য তাঁকে হেলিকপ্টারে জায়গা দেয়া হয়নি বলে তিনি খুবই বিমর্ষ। আত্মসমর্পণ ও এই অভিযানের স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে আমি তাঁকে সবিস্তার বর্ণনা দিই। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে তাঁর এই রিপোর্ট ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

কয়েকদিন পরে নিয়াজির সমর্পণ-করা রিভলবারটি পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারি, অস্ত্রটি নিয়াজির নয়। এটা একটা সাধারণ আর্মি ইস্যু .৩৮ রিভলবার। ময়লা দিয়ে এর ব্যারেল বন্ধ হয়ে আছে এবং মনে হয়, বেশ কিছুদিন এটা পরিষ্কারও করা হয়নি। ল্যানিয়ার্ডটিও নোংরা, ঘর্ষণের ফলে কয়েকটি জায়গা ছিঁড়ে গেছে। এটা

কোনো কম্যান্ডিং জেনারেলের ব্যক্তিগত অস্ত্র হতে পারে না, বরং মনে হয়, নিয়াজি এটা তাঁর কোনো মিলিটারি পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অস্ত্র হিসেবে সমর্পণ করেছেন। আমার মনে হল, নিয়াজির ভাগ্যে যা ঘটেছে, সেটা তাঁর প্রাপ্য ছিল।

১০. বাম দিক থেকে: লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি, ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং, ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং ও জেকব —আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের আগে

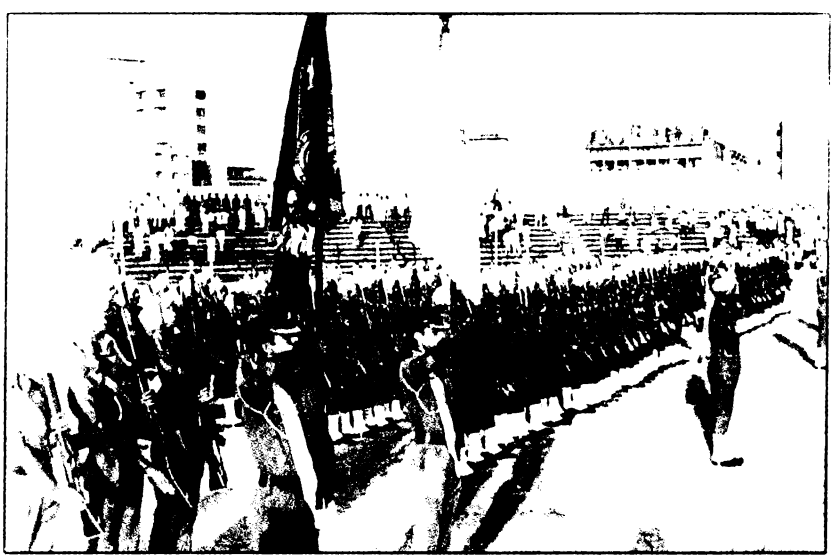

১১. মার্চ ১৯৭২-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিদায়ী কুচকাওয়াজ

১৩. লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল জেকব ইস্টার্ন কম্যান্ডের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন; পেছনে উপবিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী

যুদ্ধের পরিণতি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা থেকে ফোর্ট উইলিয়ামে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, পুলিশ ও অন্যান্য পেশাজীবীদেরকে নিয়ে সিভিল অ্যাফেয়ার্স সেল গঠন করা হয়। ভারতে পালিয়ে আসা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কিছু সরকারি চাকরিজীবীও এই সেলে ছিলেন। ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, সেনাবাহিনী ও ভারতীয় সরকারি চাকরিজীবীরা বাংলাদেশের বেসামরিক বিষয়গুলো দেখাশোনা করবে। আমি পরামর্শ দিই যে, বাঙালি সরকারি কর্মচারীরা ও পুলিশ আরো দক্ষতার সাথে দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম, বিশেষত পরিবর্তনের সময়টাতে। বাংলাদেশীরা তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো মিটিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত। আমাদের দায়িত্ব হবে বাংলাদেশে সীমিত সময়ের জন্য শুধু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং রেলপথ, সড়ক ও টেলিযোগাযোগ-ব্যবস্থার পুনঃস্থাপন। অন্য যে সমস্যাটি ছিল, সেটা হল সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে-চলে-যাওয়া শরণার্থীদের পুনর্বাসন।

বাংলাদেশ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় কোনোরকম কালক্ষেপণ না করে এবং এর ফলে সিভিল অ্যাফেয়ার্স সেলের আর কোনো কাজ থাকে না। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সিভিল অ্যাফেয়ার্স সেলের ব্রিগেডিয়ার সমীর সিনহা (Samir Sinha) ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেন। যুদ্ধবন্দিদেরকে ভারতে আনার কাজও নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলে।

জেনারেল নিয়াজি ও তাঁর ঊর্ধ্বতন কম্যান্ডারদেরকে ২০ ডিসেম্বর বিমানে করে কলকাতায় আনা হয় এবং ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সর্বপ্রথম যে কাজগুলো আমি করি, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল আত্মসমর্পণের দলিল নতুন করে টাইপ করিয়ে সেটাতে আবারও নিয়াজির সই নিয়ে নেয়া। নিয়াজি সাগ্রহে কাজটি করেন। কয়েকটি পর্বে আমি নিয়াজি ও তাঁর জেনারেলদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাঁদের অধিকাংশেরই ধারণা, এ যাত্রা তারা হেরে গেলেও যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি এবং সেই বাকি যুদ্ধগুলোতে তারা বদলা নেবে।

১৭ ডিসেম্বর বিকেলে *টাইম্‌স অভ্‌ ইন্ডিয়া*-র দিল্লী সংস্করণের একটি কপি হাতে নিয়ে অরোরা আমার অফিসে এলেন। সেটাতে 'আর্টিটেক্টস্‌ অভ্‌ ভিক্‌ট্রি' শিরোনামে একটি পূর্ণপাতার লেখা ছিল। জেনারেল মানেকশ', এয়ার চিফ মার্শাল পি সি লাল, অ্যাডমিরাল নন্দ ও মেজর জেনারেল জেকবের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা বেরিয়েছে। তাঁর নাম না থাকায় তিনি স্পষ্টতই হতাশ হয়েছিলেন। আমি এই বলে তাঁকে আশ্বস্ত করি যে, এতে আমার কোনো হাত নেই। কথাটা সত্যি। তখন অরোরা আমাকে বলেন যে, এর পর থেকে তিনি ঢাকার সিভিল অ্যাফেয়ার্স অর্গ্যাইজেশন দেখাশোনা করবেন এবং সেখানেই বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করবেন। আমি তাঁকে বললাম যে, আমাদের সৈন্যরা যত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে, ততই মঙ্গল। কারণ এর মধ্যেই তাদের কার্যকলাপ নিয়ে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। এর কয়েকদিন পরে জেনারেল মানেকশ' টেলিফোনে আমাকে বলেন যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর রসদ লুট হওয়ার গুজব শুনতে পেয়েছেন। আমি জবাব দিলাম, এটা গুজবই, আর কিছু নয়। তিনি জানতে চাইলেন, আমি কী শুনেছি। আমি বললাম, আমি গুজব ছড়াই না। এর পরে তিনি অরোরার সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন।

পরদিন জেনারেল মানেকশ' লুটতরাজের গুজব সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য আমাকে ঢাকায় যাবার নির্দেশ দেন। সেদিনই আমি ঢাকায় গিয়ে কম্যান্ডার ও স্টাফের সদস্যদের সাথে কলকাতা ও দিল্লীতে লুটতরাজের যেসব গুজব পৌঁছাচ্ছে, সে সম্পর্কে কথা বলি। এসব অভিযোগ তাঁরা অস্বীকার করেন। ফিরে এসে মানেকশ'কে আমি এসব গুজবের অসারতার ব্যাপারে আমাকে প্রদত্ত নিশ্চয়তার কথা বলি। কিন্তু অবিলম্বে সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে আমার সুপারিশ অব্যাহত রাখি। বাংলাদেশে যত বেশিদিন আমরা থাকব, জনপ্রিয়তা হারানোর আশঙ্কা আমাদের তত বাড়বে।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ শেখ মুজিব প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতীয় সৈন্যদেরকে তিনি আরো কিছুদিন বাংলাদেশে রেখে দেবার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারে সম্মত হন, যা মার্চ মাসে শুরু হয়। একটি বিদায়ী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এই সুযোগে আমি ঢাকায় গিয়ে মুজিবের সাথে দেখা করি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সদাশয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর সাথে আমি বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করি এবং তাঁর অনাড়ম্বর কাজকর্মে আমি চমৎকৃত হই। বারে বারে তিনি বলেন, "আমার জনগণ আমাকে ভালবাসে এবং আমি আমার জনগণকে ভালবাসি।" জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে তিনি সরাসরি টেলিফোন করে বিভিন্ন কাজকর্মের নির্দেশ দিতেন। ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এবং তাঁর প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা ছিল অসীম। জনগণের ভালবাসার 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেশের স্বাধীনতার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেন। বাংলাদেশের জনগণ তাঁকে 'জাতির

পিতা' উপাধিতে ভূষিত করেছে। আমাদের সময়ের একজন মহান নেতা হবার গৌরব তিনি অর্জন করেছেন।

কয়েকদিন পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেখান থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চাকমা উপজাতীয়দেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সেখানে আমাদের সৈন্যদের একটি পোস্ট স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকার আমাদেরকে অনুরোধ করে। "এটা আমাদের বিষয় না" বলে আমি এতে আপত্তি উত্থাপন করি। পরে অবশ্য ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্স আমাকে বলেন যে, এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশ এবং এটা পালন করতে হবে। সেই অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য পোস্ট নির্মাণের লক্ষ্যে একটি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড গ্রুপ পাঠানো হয়। এই কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

এই অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়েছে কি হয়নি, জুন ১৯৭২-এ জম্মু (Jammu)-তে একটি কোর হেডকোয়ার্টার্স তৈরির জন্য আমাকে বলা হয়। আমার কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল বলে কাশ্মির (Kashmir)-এ আমার প্রিয় একটি ঘেরে মাছ শিকারের জন্য সংক্ষিপ্ত ছুটি নিই। কাশ্মীরের পথে দিল্লীতে আমি জেনারেল মানেকশ'র সাথে দেখা করি এবং আসন্ন সিমলা-চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করি। মুন্নাওয়ার তাউয়ি (Munnawar Tawi) নদীর ওপারে অবস্থিত ছাম্ব (Chhamb) পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা তাঁকে আমি বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। এর পরে চেনাব (Chenab) ও ঝিলাম (Jhelum)-এর মধ্যবর্তী সমতলে আর কোনো বাধা নেই। পাকিস্তানিরা মুন্নাওয়ার তাউয়ির দক্ষিণ পারে সুরক্ষিত অবস্থান নিয়েছে এবং এই অতিক্রম করা খুবই দুরূহ। আমার ধারণা, লাদাখ (Ladakh)-এর যে ৩৬৪ বর্গমাইল এলাকা আমাদের দখলে আছে, সেটা আকারে ছাম্বের কয়েকগুণ বড় হলেও অর্থনৈতিক ও সামরিক কৌশলগত দিক থেকে এর গুরুত্ব অনেক কম। কিন্তু মানেকশ' এতে একমত হননি। ছাম্বে মাত্র কয়েকশ' বর্গ কিলোমিটারের বিনিময়ে আমরা পশ্চিমে সিন্ধ (Sind)-এর মরুভূমিতে যে কয়েক হাজার বর্গকিলোমিটার খুব সহজে দখল করেছি, সেটা সম্ভবত তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করছিল। অঙ্কের হিসেবে দেখলে এতে তাঁর কোনো ভুল নেই, কিন্তু কৌশলগত দিক থেকে এটা মারাত্মক একটা ভুল, যার পরিণাম আগামী বছরগুলোতে বোঝা যাবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে সিমলা আলোচনায় মানেকশ'র তেমন কিছু বলার সুযোগ হয়নি। কারণ সেখানে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল রাজনৈতিক ভালমন্দের প্রেক্ষাপটে। জানা যায় যে, যুদ্ধবিরতিরেখা অথবা নিয়ন্ত্রণরেখার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ করা হবে এই মর্মে ভুট্টো সম্মতি দান করলেও এটা লিখিতভাবে প্রকাশ না করতে অনুরোধ করেন; কারণ এতে তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই প্রসঙ্গে স্যাম গোল্ডউইন (Sam Goldwyn)-এর সেই বিখ্যাত কথাটি স্মরণ করাটা বোধ হয়

অপ্রাসঙ্গিক হবে না: "মৌখিক চুক্তির মূল্য এক টুকরো কাগজের দামের সমানও না (A verbal contract is not worth the paper it is written on.)।"

বাংলাদেশের জলাভূমি আর ধানক্ষেতের মধ্যেও আমরা একটি সুস্পষ্ট জয় লাভ করেছিলাম। যুদ্ধে আমরা ৯৩,০০০ যুদ্ধবন্দি পেয়েছি। তা সত্ত্বেও সিমলায় পাকিস্তানের সাথে আলোচনার টেবিলে আমরা অমীমাংসিত বিষয়গুলোর স্থায়ী সমাধান লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছি। যুদ্ধের ময়দানে অর্জিত সাফল্য ও সুবিধাগুলো সিমলার বৈঠকে বিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

নাটকের কুশীলব

নিকট অতীতের মধ্যে ভারতের সবচেয়ে বড় সামরিক বিজয়ের সময় জেনারেল স্যাম মানেকশ' ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান। ১৯৬২ সালের পরাজয় এবং তারপর ১৯৬৫ সালের অমীমাংসিত যুদ্ধের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্মান তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন। সবসময় তিনি সেনাবাহিনীর স্বার্থে কাজ করেছেন। কখনো কোনো আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ সহ্য করেননি। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন তিনি এবং তাঁর বাচনভঙ্গি ও রচনাশৈলী ছিল চমৎকার, যদিও প্রয়োজনের বাইরে কথা বলার প্রবণতা বেশ কয়েকবার তাঁর জন্য বিপদ ডেকে এনেছে। লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল বি এম কাউল মানেকশ'র মধ্যে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সবগুলো লক্ষণ আবিষ্কার করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত প্ররোচিত করেন। আনীত অভিযোগ ছিল পুরোপুরি ভিত্তিহীন। ফলে মানেকশ' অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। সঙ্কটের এই পুরোটা সময় জুড়ে আচার-আচরণে মানেকশ' ছিলেন অবিচল ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রতিমূর্তি। কোথাও কোনো চাপ বা দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্রও দেখা যায়নি। পরবর্তীতে তিনি অত্যন্ত সফল সম্ভবত ভারতের ইতিহসে সবচেয়ে সফল — একজন সেনানায়কে পরিণত হন, অথচ কৃষ্ণ মেননসহ জেনারেল কাউল ১৯৬২-র পরাজয়ের দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়িয়েছেন।

অরোরার প্রতি মানেকশ'র তেমন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। কী কারণে আমি জানি না, রুস্তমজীকে তিনি পাত্তাই দিতেন না। অথচ রুস্তমজী বিএসএফ-এর সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধান, যাঁকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধার চোখে-দেখেন। মানেকশ' প্রধানমন্ত্রীর আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতি মানেকশ'র সুস্পষ্ট উপেক্ষা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কৃতজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল র‍্যাঙ্কে পদোন্নতি দিয়ে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেন।

স্যাম মানেকশ'র প্রতি আমার নিজেরও শ্রদ্ধা অসীম। সামরিক কৌশলগত বিষয়াবলিতে মতপার্থক্য সত্ত্বেও আমার প্রতি তিনি বরাবরই সদয়, সহিষ্ণু ও বিবেচক ছিলেন, যে কারণে আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সৈনিক-অফিসার নির্বিশেষে তাঁকে সবাই পছন্দ করত। সেনাবাহিনীর প্রতি তিনি ছিলেন নিবেদিত। সবসময়ই তিনি সৈনিকদের মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। ১৯৭১-এর যুদ্ধে সেনাবাহিনী-

প্রধান ও বাহিনীপ্রধানদের চেয়ারম্যান হিসেবে যুদ্ধাভিযানের সামগ্রিক দায়-দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। সাফল্যের সাথে সে দায়িত্বভার তিনি বহন করেছেন এবং যে সম্মান তিনি পেয়েছেন, সেটা তাঁর অর্জিত। স্বাধীন ভারতের মহান অধিনায়কদের মধ্যে স্যাম নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গার দাবিদার।

জগজীবন রাম (Jagjıvan Ram), যাঁকে মানেকশ' এড়িয়ে চলতেই ভালবাসতেন, সম্ভবত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সামরিক কৌশল সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রশাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন দক্ষ। তিন বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত জনশক্তি, অস্ত্রশস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা যতদূর সম্ভব জগজীবন রাম নিশ্চিত করেছিলেন ।

আর্মি কম্যান্ডার লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ছিলেন সুমধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিশালদেহী এক মানুষ। পুরো বিষয়টি সংগঠিত করার কাজে ও পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনী নিয়োগে তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করেন। যুদ্ধে ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের কম্যান্ডার, যিনি আগেও অরোরার অধীনে কাজ করেছেন, মেজর জেনারেল লছমন সিং তাঁর *ভিক্‌ট্রি ইন বাংলাদেশ (Victory in Bangladesh)* বইতে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন

> তিনি ছিলেন মজবুত দেহাবয়ব এবং পেশাগত প্রজ্ঞার অধিকারী। মানেকশ'র অধীনে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং তাঁর যে কোনো ইচ্ছা নীরবে মেনে নেয়ার প্রস্তুতি তাঁর মধ্যে ছিল। একজন স্টাফ অফিসার হিসেবেই তাঁর বেশি পরিচিতি ছিল বলে সেনাবাহিনীতে খুব যোগ্য কম্যান্ডার হিসেবে তাঁর কোনো অবস্থান ছিল না। ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময়ে অরোরা ঘন ঘন রণাঙ্গন পরিদর্শনে গেলেও অধিকাংশ ফিল্ড কম্যান্ডারের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের প্রায় সকলের সাথেই তাঁর সম্পর্ক ছিল তেল আর জলের মতো এবং যুদ্ধে তাঁর অধস্তন কম্যান্ডারদের সাফল্য সত্ত্বেও তাঁদেরকে তিনি গড়ে তোলেননি। (He was physically tough and professionally knowledgeable. He served long years under Manekshaw and was believed to acquiesce readily to his wishes. He was not regarded in the Army as a commander of any distinction, his reputation being that essentially of a staff officer. During the 1971 operations Aurora undertook frequent visits to the forward areas but failed to win the confidence of most field commanders. His relations with the majority of them were like oil and water and he did not build up his subordinate commanders inspite of their successes in battle.)

সামগ্রিক রণকৌশল ও অপারেশন পরিচালনার ব্যাপারে মতদ্বৈততা সত্ত্বেও এই অভিযানের সফল পরিসমাপ্তির লক্ষ্যে এক সাথে আমরা ভালভাবেই কাজ করেছি। তিনি ছিলেন আর্মি কম্যান্ডার এবং সেজন্য এই অপারেশনের সাফল্যের কৃতিত্ব তাঁর অবশ্যপ্রাপ্য।

কোর কম্যান্ডারদের মধ্যে নীতি ও দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল মোহন থাপান (Mohan Thapan)-এর নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হয়। তাঁর পেশাগত সততা ছিল অসাধারণ এবং দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর কোরের পরিচালিত অপারেশনগুলো তিনি কার্যকরভাবে তত্ত্বাবধান করেন। অধীনস্থ স্টাফ ও কম্যান্ডাররা তাঁকে বেশ পছন্দ করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি অরোরার সাথে মানিয়ে চলতে পারেননি। তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় হত না বললেই চলে। ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের কম্যান্ডার মেজর জেনারেল লছমন সিং তাঁকে উপযুক্ত সহায়তা দেন। অভিযানের কঠিনতম বাধাগুলো জয় করতে হয় এই ডিভিশনকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী লছমন সিং তাঁর লক্ষ্য অর্জন করেন।

লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল সগত সিং ছিলেন তেজী ও সাহসী মানুষ। প্রাথমিক পর্যায়ে অরোরার সাথে তাঁর সম্পর্ক বেশ আন্তরিকই ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা তিক্ত হয়ে যায়। তাঁর ডিভিশনাল কম্যান্ডারদের সকলের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল না। ৫ম কোরের দ্রুত ও সুসম্পন্ন আক্রমণগুলোর সাফল্যের পেছনে মেজর জেনারেল বেন গনজালভেস, 'রকি' হীরা ও কৃষ্ণ রাও-এর উদ্যম উল্লখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সামগ্রিকভাবে ৪র্থ কোরের সাফল্যের কৃতিত্ব লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল সগত সিংকে দিতেই হয়। তিনিই ছিলেন এই কোরের পরিচালিত আক্রমণসমূহের পিছনের ব্যক্তি।

লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল 'ট্যাপি' রায়না ছিলেন ২য় কোরের কম্যান্ডে। তিনি ছিলেন শান্ত মেজাজের অফিসার। অরোরার সাথে তাঁর সুসম্পর্ক থাকলেও তাঁর ডিভিশনের কম্যান্ডারদের ওপরে তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল সামান্যই। তাঁদের মধ্যে একজন তো প্রকাশ্যেই তাঁর নির্দেশ অবজ্ঞা করতেন। পরবর্তীতে রায়না চিফ অভ্ আর্মি স্টাফ পদে উন্নীত হন এবং সেখানে তিনি দক্ষতা ও মর্যাদার স্বাক্ষর রাখেন।

মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং গিল ছিলেন ১০১ কমিউনিকেশন জোনের কম্যান্ডে। তাঁর ছিল প্রচুর উদ্যম ও সাহস। আমাদের ঢাকা আক্রমণের সময় কম্যান্ড করার জন্য আর্মি হেডকোয়ার্টার্স যখন পর্যাপ্ত সৈন্য ও একটি হেডকোয়ার্টার্স বরাদ্দ করতে অস্বীকার করে, তখন গুরবক্স সিংকে আমরা কম্যান্ডে দিয়ে দিই। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক সৈনিক, অথচ বড়ই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, আর্মি কম্যান্ডার বা আর্মি চিফ -- কেউই তাঁর ওপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

মেজর জেনারেল ইন্দর গিল ১৯৭১-এর অগাস্টে আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি অপারেশন্‌স হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটিশ আর্মিতে ইন্দর যোগদান করেন এবং রয়্যাল এঞ্জিনিয়ার্সে কমিশন লাভ করেন। গ্রিসে এক ছত্রীসেনা অবতরণ অপারেশনে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তিনি মিলিটারি ক্রস পদক পান।

খুবই উঁচুমানের অফিসার ইন্দর গিল ছিলেন বাস্তববাদী ও দক্ষ। তাঁর নিজের বিশ্বাসের ওপরে আস্থা ছিল। সিদ্ধান্ত নিতে তিনি ভয় পেতেন না এবং দায়িত্ব পালনে

ছিলেন সক্ষম। আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের অন্য স্টাফ অফিসারদেরকে ইন্দর ছাপিয়ে উঠেছিলেন স্বীয় যোগ্যতায়। এই অপারেশনে পশ্চিম ও পূর্ব — উভয় রণাঙ্গনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন, যে কারণে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে ও পরের কঠিন সময়টিতে ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। একদম প্রথম থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, হস্তক্ষেপ অনিবার্য। কোনো ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল না থাকায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে কোনো কার্যকর সমন্বয় ছিল না। ফলে, বিভিন্ন সংস্থার প্রধান ও তাঁর ব্যক্তিগত উপদেষ্টাদের কাছ থেকে তাঁকে পরামর্শ নিতে হত। জেনারেল মানেকশ'র মাধ্যমে প্রাপ্ত ইস্টার্ন কম্যান্ডের অনুমান ও বিশ্লেষণ তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে, তাড়াহুড়ো করে আক্রমণ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কাজেই, পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে তার পরে আক্রমণে যাওয়া উচিত।

ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন প্রাজ্ঞ, দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী। তিনি নিক্সন ও জাতিসংঘের চাপের মুখোমুখি হন। পাকিস্তানের প্রতি আমেরিক্যান ও চীনা সমর্থনের প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি ডি পি ধরকে দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন, যা আমাদেরকে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেয়। জাতিকে তিনি মহান এক সামরিক জয় এনে দেন, যা আমাদের সম্মান পুনরুদ্ধার করে ভারতকে একটি আঞ্চলিক পরাশক্তির মর্যাদা এনে দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইন্দিরা গান্ধীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

অর্জিত শিক্ষা

মাত্র তেরদিনের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে ভারতীয় ও বাংলাদেশী বাহিনী আনুমানিক ১৫০,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা মুক্ত করেছে। আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সুবিধাজনক দুর্গম একটি ভূখণ্ডে অত্যন্ত শক্তিশালী, সুশিক্ষিত একটি সেনাবাহিনীকে পরাভূত করে এটা ছিল এক সম্পূর্ণ বিজয়। রণাঙ্গনে সংখ্যাধিক্যের অনুপাত ছিল আমাদের পক্ষে ১.৮:১। রণবিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী আক্রমণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ৩:১-এর চেয়ে এটা অনেক কম।

পূর্ব রণাঙ্গনে পাকিস্তানিদের ক্ষয়ক্ষতির হিসেবে প্রায় ৮,০০০ সৈন্য নিহত ও আহত হয়। পাকিস্তানি ইস্টার্ন কম্যান্ডের চিফ অভ্ স্টাফের দেয়া তথ্য অনুযায়ী নিয়মিত ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট পুলিশের মোট সংখ্যা ৯৩,০০০, যার মধ্যে থেকে আনুমানিক ৩,০০০ যুদ্ধবন্দি আবার যুদ্ধ চলাকালীনই বন্দি হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানিদের যেসব অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম আমরা দখল নয়ত ধ্বংস করে ফেলি, সেগুলোর মধ্যে আছে ৪১টি ট্যাঙ্ক, ৫০টি কামান/ভারি মর্টার, ১০৪টি রিকয়েললেস গান, ঢাকা বিমানবন্দরে সারিবদ্ধভাবে রাখা ১৮টি এফ৮৬ (F86) বিমান এবং বিপুল সংখ্যক নৌযান। আমাদের পক্ষে ১,৪২১ জন নিহত, ৪,০৫৮ জন আহত এবং ৫৬ জন নিখোঁজ — সম্ভবত নিহত হয়। আমাদের ট্যাঙ্কের মধ্যে ২৪টি ধ্বংস ও ১৩টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিমানহানির সংখ্যা ১৪। পাকিস্তান সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনে তাদের ১১৫ জন অফিসার, ৪০ জন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও ১,১৮২ জন অন্যান্য র‍্যাঙ্কের সৈনিক হতাহত হয়। অথচ পশ্চিমা সাংবাদিকদের কাছে দেয়া তথ্য অনুযায়ী, তাদের পক্ষের ৭০ জন অফিসার, ৫৯ জন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার এবং ১,৪৮২ জন অন্যান্য র‍্যাঙ্কের সৈন্য হতাহত হয়েছে। আর আমাদের হিসেব অনুযায়ী পূর্ব রণাঙ্গনে ২৬ মার্চ থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানিদের ৪,৫০০ জন নিহত ও ৪,০০০ সৈন্য আহত হয়। ৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের প্রাণ হারায় ২,২৬১ জন আর আহত হয় ৪,০০০ জন। অর্থাৎ পূর্ব রণাঙ্গনে মোট ৬,৭৮১ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত এবং ৮,০০০ জন আহত হয়। পূর্ব রণাঙ্গনে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের প্রতিরক্ষামূলক আশ্রয় থেকে সাহস ও দৃঢ়তার সাথে লড়াই করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা তাদের অবস্থান টিকিয়ে

রাখতে সক্ষম হয়। তাদের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাকে পাশ কাটানোর জন্য পার্শ্ব-সড়ক ও অন্যান্য রাস্তা ব্যবহারের যে কৌশল আমরা অবলম্বন করি, সেটা তারা একেবারেই আশা করেনি। আমাদের অগ্রসর হওয়ার গতি দেখে তারা অবাক হয়ে যায়।

বিদ্যুদ্বেগে আক্রমণে সাফল্যের কৃতিত্ব অবশ্যই ইস্টার্ন আর্মির সবস্তরের সৈনিকের প্রাপ্য। মাত্র তেরদিনের লড়াইয়ে অসংখ্য নদীসঙ্কুল এলাকায় শত্রুপক্ষের একটি সুসংগঠিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাহিনীর বিপক্ষে একটি পরিষ্কার বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে তারা অসীম শৌর্য প্রদর্শন করে। মুক্তিবাহিনীকেও তাদের প্রাপ্য কৃতিত্ব দিতেই হবে। তাদের গেরিলা অপারেশনগুলো পাকিস্তানিদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তাদের চলাফেরা বিঘ্নিত করে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস ও সাহসের ভিত নড়িয়ে দেয়। অতএব ভারত-বাংলাদেশ সম্মিলিত বাহিনীর এই বিজয়ে তাদের অবদান বিশাল।

সব পর্যায়ের সাধারণ ও প্রশাসনিক কর্মীদেরকেও কৃতিত্ব দেয়া উচিত, যাঁরা এই অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও রসদ সরবরাহের পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এঞ্জিনিয়রদের অসাধারণ কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের বাতিল হয়ে যাওয়া ব্রিজ তৈরির সরঞ্জামাদি অনেক দেরিতে দেয়া সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন ডিপো থেকে সেসব সংগ্রহ করার পর প্রয়োজনীয় মেরামতি সম্পন্ন করে আক্রমণের অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে সময়মতো ব্রিজ তৈরি করে বাহিনীর অগ্রসর হওয়া ও লড়াই করার ব্যবস্থা করে দেয়।

১৯৭১-এর যুদ্ধ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। প্রথমত, যে কোনো অভিযান সফল করতে চাইলে সেটার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বিবৃত হওয়া অবশ্য-প্রয়োজনীয়। উদ্দেশ্যসম্পর্কিত দিকনির্দেশনা নির্ধারিত হলে শুধু তখনই লক্ষ্য নির্বাচন করা সম্ভব। ১৯৭১-এ এমনটি হয়নি। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স এবং সম্ভবত সরকারেরও উদ্দেশ্য ছিল একটি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠনের জন্য যত বেশি সম্ভব এলাকা দখল করা। চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ঢাকার গুরুত্ব দিল্লীর বাহিনীপ্রধানরা বিবেচনাতেও আনেননি। শহর ও অন্যান্য এলাকা দখলের ব্যাপারেই তাঁদের বেশি মনোযোগ ছিল। শহর, ইত্যাদি দখলের ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ এবং এতে লোকক্ষয়ও হয় অনেক বেশি। ইন্দর গিলের সমর্থন নিয়ে কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্সে জেনারেল স্টাফ ঢাকাকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন এবং আমাদের ঢাকায় প্রবেশে সহায়তা করবে বলে পাকিস্তানি কম্যান্ড ও যোগাযোগকেন্দ্রসমূহকে সম্পূরক লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করা হয়। আমাদের কম্যান্ড হেডকোয়ার্টার্স যে কৌশল অবলম্বন করে, তা হল, আমরা শত্রুদেরকে সীমানার কাছাকাছি টেনে এনে তাদেরকে বিভিন্ন শহর প্রতিরক্ষায় ব্যস্ত রাখা এবং সেই সুযোগে বিকল্প অক্ষরেখা ধরে তাদের অবস্থানকে পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হওয়া। রসদ ও সরবরাহ চালু রাখার জন্য জন্য পথ পরে খুলে দেবার সুযোগ থাকে।

অরোরা-সমর্থিত মানেকশ'র কৌশল অবশ্য ছিল যত বেশি সম্ভব এলাকা দখলে আনা এবং তাঁর ভাষায় 'প্রবেশপথ' খুলনা ও চট্টগ্রাম দখল করা। *তাঁর কর্ম-পরিকল্পনায়*

ঢাকার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পরে ১৩ ডিসেম্বরে আমরা যখন ঢাকার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয়েছি, তখন তিনি যেসব শহর আমরা পাশ কাটিয়ে এসেছি, তার সবগুলো দখল করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেন। *তখনও পর্যন্ত ঢাকা তাঁর তালিকায় স্থান পায়নি।* মানেকশ' সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলে আমাদের নিয়ন্ত্রণে যত বেশি সম্ভব শহরের দখল থাকা উচিত।

ঢাকা আক্রমণে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমাদের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও যুদ্ধের পুরোটা সময় ধরে চীনা হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় ৬ মাউন্টেন ডিভিশনকে মানেকশ' ভুটানের নিরাপত্তার জন্য উত্তরবঙ্গে রেখে দেন। ৬ মাউন্টেন ডিভিশনকে ব্যবহার করতে না পেরে আমরা চীন সীমান্ত থেকে তিনটি ব্রিগেড আনিয়ে নিই। এদের মধ্যে দুটিকে ঢাকা আক্রমণের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা বাহিনীর সাথে যুক্ত করে দিই। ৩০ নভেম্বরে এই বদলির কথা মানেকশ'র কানে গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই ব্রিগেডগুলোকে তাদের আগের অবস্থানে ফেরত পাঠাতে নির্দেশ দেন। ৮ ডিসেম্বরের পরে বারবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত দুটি ব্রিগেড তিনি কাজে লাগাতে অনুমতি দেন। তৃতীয় ব্রিগেডটিকে আগেই পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠানো হয়ে গেছে। আমাদেরকে প্রথমেই যদি ৬ মাউন্টেন ডিভিশন দিয়ে দেয়া হত, এমন কি পরেও যদি দুটি ব্রিগেডের জন্য আমাদেরকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেরি করতে না হত, তাহলে সম্ভবত আরো আগে আমরা ঢাকায় পৌঁছাতে পারতাম। মানেকশ'র প্রতি ন্যায়বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে, সোভিয়েতরা, আমেরিকানরা, কাঠমণ্ডুস্থ আমেরিকান মিলিটারি অ্যাটাশে এবং আমাদের পররাষ্ট্র ও ইন্টেলিজেন্সের কিছু বিশেষজ্ঞ পাকিস্তানের সমর্থনে চীনা হস্তক্ষেপের আশঙ্কা উড়িয়ে দেননি। মানেকশ' তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কোনো জটিল অভিযানেই একদম শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট একটি পর্যায় পর্যন্ত বিস্তারিত খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করা সম্ভব। তারপর প্রয়োজন আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা। সেই অনুযায়ী ঢাকা-সংলগ্ন বড় নদীগুলো পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এর পরে উত্তরদিক থেকে ঢাকা আক্রমণ আরো জোরদার করার জন্য আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা করা হয়।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতি ও সামরিক কৌশল নির্ধারণ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। ইন্টেলিজেন্সও এরকম একটি ক্ষেত্র, যেটার বাস্তবসম্মত পুনর্গঠন প্রয়োজন। ১৯৭১-এ নির্ভরযোগ্য একমাত্র ইন্টেলিজেন্স ডাটা আমরা পেয়েছিলাম আর্মি কোর অভ্ সিগন্যালের সিগন্যাল ইন্টারসেপ্ট ইউনিটের কাছ থেকে। ইন্টেলিজেন্সের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নির্ভুল অনুমান করার ক্ষমতা। ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো, পররাষ্ট্রবিষয়ক পণ্ডিতগণ ও বাহিনীপ্রধানগণ যুদ্ধের আগের ও যুদ্ধ চলাকালীন চীনা ও আমেরিকান অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে এবং তা মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

উচ্চতম পর্যায়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কোনো উপযুক্ত অবকাঠামো নেই। কার্যকরী কোনো চিফ অভ্ স্টাফ অর্গানাইজেশন নেই, চিফ অভ্ ডিফেন্স স্টাফ বলেও কিছু নেই। এয়ার চিফ মার্শাল পি সি লাল তাঁর *মাই ইয়ারস উইথ আইএএফ (My Years with IAF)* বইতে লিখেছেন:

> একটি সন্দেহ যা আমার ও অন্য অনেকের মনে বাসা বেঁধে আছে এবং সেটা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৭১-এর যুদ্ধের উদ্দেশ্যগুলো কী ছিল। সর্বাধিনায়ক ও সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর প্রধানরা যেভাবে বলেছেন, সেটা হল, পূর্ব রণাঙ্গনে যত বেশি সম্ভব এলাকা দখল করা, যাতে পাকিস্তানি বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করা যায় এবং বাংলাদেশে একটি সম্ভাব্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। এমন কোনো সম্ভাবনা তাঁরা বিবেচনা করেও দেখেননি যে, পাকিস্তানিদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করা সম্ভব, বাস্তবে যা তারা হয়েছিল এবং ঢাকার পতন ঘটানো সম্ভব এবং এর ফলে সমগ্র ভূখণ্ডটিই পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের নেতাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে পারে। পূর্ব রণাঙ্গনে যে কম্যান্ডাররা কাজ করছিলেন, সাবধানতার খাতিরে তাঁদেরকে সীমিত পরিসরে কাজ করতে হয়। কিন্তু নির্ধারিত লক্ষ্যে তাঁদেরকে দ্রুতগতিতে পৌঁছানোর দিকেও নজর রাখতে হয়। আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, আর দু-তিন সপ্তাহ দেরি হলেই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ অনিবার্যভাবে হস্তক্ষেপ করবে এবং কাশ্মিরের মতো উভয় পক্ষকে যুদ্ধবিরতিতে বাধ্য করবে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী — এই তিন বাহিনীকে এই মূল বোঝাপড়ার মাধ্যমে তারা নিজেরা যেটা ভাল মনে করে, সেই অনুযায়ী তাদেরকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলা হয়। (Here I must clarify one doubt that has existed in my mind and in the minds of others as to what the objectives of the 1971 war were. As defined by the Chiefs of Staff and by each respective service Chief, it was to gain as much ground as possible in the east to neutralize the Pakistani forces there to the extent we could and to establish a base as it were for a possible state in Bangladesh. The possibility that Pakistani Forces in East Pakistan would collapse altogether as they did and that Dacca would fall and that the whole would be available to the leaders of the freedom movement in East Pakistan was not considered something that was likely to happen. Caution demanded that people commanding in the East should work to limited objectives but to go about achieving them as rapidly as possible. It was feared that a delay of even two or three weeks would inevitably bring the UN Security Council and compel the two sides to come to some sort of cease fire such as Kashmir. With the basic understanding between the three services, the Army, the Navy and the Air Force, they were then left to plan their activities as they thought best.)

পেশাগত সততার জন্য খ্যাত পি সি লালের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, কোনো ধরনের 'পরিষ্কার রাজনৈতিক লক্ষ্য' ছিল না বা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোনো নির্ধারিত রণকৌশল অথবা অপারেশনের ওপরে দিল্লীস্থ বাহিনীপ্রধানদের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কিছুই ছিল না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামরিক কৌশল পাঠ ও বিশ্লেষণের ব্যাপারটি প্রায় সামগ্রিকভাবেই উপেক্ষা করা হয়েছে। আমাদের স্টাফ কলেজ এবং কলেজ অভ্ কমব্যাট প্রতিষ্ঠানে ব্রিগেড ও ডিভিশন পর্যায়ে ট্যাক্‌টিক্‌স শিক্ষা দেয়া হত। কিন্তু সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্সে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেসমেন্টের ওপরে কোনো ধরনের ব্যাপক অধ্যয়নের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কায়দা (tactics) করে লড়াই (battle) জেতা গেলেও যুদ্ধ (war) জয় করতে চাই কৌশল (strategy)। সামরিক কৌশলের শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া খুবই প্রয়োজনীয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমেরিকানরা ভিয়েতনামের সবগুলো লড়াই জিতলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ জয় করতে পারেনি।

১৯৭১-এর সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্ভবত এটাই যে, কোনো অভিযান পরিচালনার জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ এবং রসদ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি। এপ্রিল মাসে বস্তুত এই অবকাঠামোর, বিশেষত ত্রিপুরার রেল ও সড়ক যোগাযোগ-ব্যবস্থার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। ১৬ অগাস্টের আগে পর্যন্ত আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে অপারেশনের কোনো নির্দেশ না পেলেও মে মাসের মাঝামাঝি সময়েই আমরা ত্রিপুরাতে এক কোরের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং রসদ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করতে শুরু করি। নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকলে যুদ্ধ পুরোপুরি শুরু হওয়ার সময়ে আমরা লড়াই চালিয়ে যেতে পারতাম না। আসন্ন অপারেশন সম্পর্কে আমাদের ধারণা থেকে সরঞ্জামাদি ও রসদসামগ্রী স্থানান্তরে আমরা হিসাব-করা ঝুঁকি নিয়েছি। যুদ্ধ যখন ঘোষিত হল, তখন প্রায় সবকিছুই তৈরি অবস্থায় ছিল। অন্য যে কোনো বিষয়ের তুলনায় এই বিষয়টি পূর্ব রণাঙ্গনে আমাদের যুদ্ধ জয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করলে যে কী ধরনের সাফল্য আসে, ১৯৭১ সেটাও আমাদেরকে শিখিয়েছে। সৌভাগ্যবশত পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কম্যান্ডার ও সৈন্যরা পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছে। পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কম্যান্ডগুলো অসাধারণ দক্ষতায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে।

১৯৭১-এর যুদ্ধে উভচর অপারেশনে আমাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার দৈন্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। ৭,৬০০ কিলোমিটার উপকূলরেখা, ৫০০ দ্বীপ ও উপকূল থেকে দূরে অবস্থিত হাইড্রোকারবন স্থাপনা থাকার কারণে দরকারমতো উভচর

অপারেশন পরিচালনার জন্য আমাদের সুশিক্ষিত সুসজ্জিত বাহিনী থাকা প্রয়োজন। আমার ধারণা, এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পেরেছি এবং বর্তমানে উভচর যুদ্ধের দিকে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ও পরবর্তীতে সামরিক অভিযান চলাকালীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনলাভ অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। ১৯৭১-এর মার্চে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন তেমন উত্তপ্ত ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমসমূহের পাকিস্তানি নিষ্ঠুরতা ও তাণ্ডবের চিত্র বিশ্ব-জনমতের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। প্রধান পশ্চিমা সংবাদপত্রসমূহ ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলোর প্রচুর বিদেশী সাংবাদিক এখানে ছিলেন। সেনাবাহিনীর প্রধান অনানুষ্ঠানিকভাবে এই সাংবাদিকদেরকে ব্রিফ করেছেন। প্রথমদিকে পাকিস্তানিদের বর্বরতার কথা এই সাংবাদিকরা তেমন বিশ্বাস করেননি। পরবর্তীতে অবশ্য তাঁদের প্রতিবেদনগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে বিদেশী সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলোর অবদানকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭১-এর শিক্ষাগুলো আজ কালের গর্ভে বিস্মৃত। বিদেশী সাংবাদিকগণ ও আন্তর্জাতিক ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোর ব্যাপারে আরো অনেক কিছু করণীয় ছিল এবং এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথ গুরুত্ব পায় না।

স্মৃতিচারণ

পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আমার উত্থান-পতনে পূর্ণ সাঁইত্রিশটি বছর ছিল জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় ও উপভোগ্য সময়। তরুণ অফিসার হিসেবে একটি ট্রুপের কম্যান্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি ব্যাটারির দায়িত্বপ্রাপ্তি থেকে আমার ধারণা জন্মায় যে, কেউ যদি তার কাজে দক্ষ ও কুশলী হয়, তাহলে পুঞ্জীভূত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর সে অবশ্যই রাখতে পারবে। যাদের সাথে কাজ করতাম, সেই ব্রিটিশ অফিসাররা সামগ্রিকভাবে আমার সাথে মোটামুটি ভাল ব্যবহার করলেও যেখানে অফিসারেরা প্রায় সকলেই ব্রিটিশ, সেখানে ভারতীয় হবার কারণে মাঝে মাঝে বিদ্বেষের মুখোমুখিও আমাকে হতে হয়েছে। পেশাগত দক্ষতার প্রতি ব্রিটিশ কম্যান্ডারদের শ্রদ্ধা ছিল এবং অপারেশনের সময় রেজিমেন্টের অনেক ব্রিটিশ অফিসারকে ডিঙিয়ে আমাকে একটি ব্যাটারির কম্যান্ড দেয়া হয়। আমি আসলেই ভাগ্যবান যে, খুব অল্প বয়সেই আমি কম্যান্ড ও দায়িত্ব লাভ করেছিলাম। মরুভূমি অঞ্চলে মোবাইল (যুদ্ধরত অবস্থায় স্থান পরিবর্তন) যুদ্ধের সমস্যাবলি আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম এবং সেইসাথে পাহাড়ে অথবা আরাকানের জঙ্গলে গতিপথ দ্রুত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোঝারও সুযোগ হয়েছিল। আমার সৌভাগ্য যে, আরাকান উপকূলে বিভিন্ন উভচর অপারেশনে অংশগ্রহণ এবং সুমাত্রায় অস্থিতিশীলতা দমনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম প্রচণ্ডতাসম্পন্ন যুদ্ধও করেছি। সবচেয়ে মূল্যবান যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করি, সেটা হল জনশক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা। নিজের বাহিনীর সৈনিকদের ভালমন্দের দিকে লক্ষ রাখা যে কতটা প্রয়েজনীয়, কর্মজীবনের প্রথম থেকেই সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমার মনে পড়ে, আরাকানে অপারেশন কিছুটা প্রশমিত হলে আমি মথুরা (Mathura)-তে ফিল্ড আর্টিলারি ট্রেনিং সেন্টারের অ্যাকাউন্টস সেকশনে গিয়ে হাজির হতাম এবং লক্ষ রাখতাম যে, প্রত্যেক সৈনিকের সমস্ত পাওনা ঠিকমত জমা করা হচ্ছে কি না। ট্রুপ কম্যান্ডার এবং পরবর্তীতে ব্যাটারি কম্যান্ডার হিসেবেও আমি প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম এবং তাদের পরিবার ও গ্রামের সমস্ত খবর আমার জানা ছিল। দুর্ভাগ্যবশত আজকাল জনশক্তি ব্যবস্থাপনাকে তার প্রাপ্যের চেয়ে কম গুরুত্ব দেয়া হয়।

এ যুগে অভীষ্ট ও লক্ষ্যের ধরনও বদলে গেছে। বর্তমানকালের অধিকাংশ অফিসার তাদের কমিশনিংয়ের আগে আর্মি সার্ভিস কোর অথবা আর্মি অর্ডন্যান্স কোর বেছে নেয়। খুব স্বল্প-সংখ্যক অফিসার ইনফ্যান্ট্রি ও আর্টিলারি বা আর্মার্ড কোরের মতো কমব্যাট আর্ম বেছে নেয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক মূল্যবোধের কারণে সম্ভবত তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অন্য রকম। আজকাল এই তরুণ অফিসাররা তাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য নিখুঁত ও বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করে নেয়। আগের যুগের তুলনায় বর্তমান যুগের অফিসারদের জীবনে তাদের স্ত্রীদের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে সবচেয়ে নিচের ইউনিট কম্যান্ডারের স্ত্রী পর্যন্ত একটি সমান্তরাল চেইন অভ্ কম্যান্ড এ যুগে তৈরি হয়ে গেছে।। কল্যাণের ছদ্মবেশে এই চেইন অভ্ কম্যান্ড এমন সব বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে, যেখানে তাদের কোনো ধরনের ভূমিকা থাকাই সঙ্গত নয়।

আমি যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিই, তখন সার্ভিস অফিসারের পদটি ছিল বেশ আলাদা ধরনের মর্যাদাপূর্ণ এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও পুলিশের সাথে তাঁর সম্পর্কের ভিত্তিও ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। সময়ের সাথে সাথে এই সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তি নষ্ট হতে থাকে। সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ ক্যাডারের সাথে তুলনামূলক বিচারে সার্ভিস অফিসারের অবস্থান বেশ কয়েক ধাপ নিচে নেমে যায়। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ও পুলিশের পদ ও মর্যাদার সাথে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে কেরিয়ার ইনসেন্টিভের জন্য সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সংখ্যাবৃদ্ধি এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে ফেলে। বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদাও দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। ব্যবসার আকর্ষণীয় আর্থিক সুবিধার তুলনায় এর সীমাবদ্ধতার কারণে সেনাবাহিনীতে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত অফিসার যোগ দিচ্ছে না। এর ফলে কনিষ্ঠ ও মধ্যম পর্যায়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন অফিসারের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

জলপাই রঙের পোশাকধারী আমলারাই সাউথ ব্লক ও সেনাভবন থেকে এখন সেনাবাহিনী চালায়। মাথাভারি আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে উঁচু র‍্যাঙ্কের অফিসারদের সংখ্যা এত বেশি যে, যেসব পর্যায়ে আগে মেজর ও লেফ্‌টন্যান্ট কর্নেলরা থাকত, সেখানে এখন আসেন ব্রিগেডিয়ার ও মেজর জেনারেলরা। ব্রিটিশদের থেকে পাওয়া হোয়াইটহল (Whitehall — সরকারি দপ্তরে পূর্ণ লন্ডনের একটি রাস্তা) সিস্টেম এখন খোদ হোয়াইটহলের চেয়েও বেশি হোয়াইটহল। আর্থিক অনুমোদন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসামরিক কর্মকর্তাদের ক্ষমতার পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির ফলে উদ্যোগ স্তিমিত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। সামরিক বাহিনীর বেসামরিক নিয়ন্ত্রণকে আমলাতন্ত্র ভুলভাবে সিভিল সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ হিসেবে ব্যাখ্যা করছে। বাহিনীপ্রধানদের কর্তৃত্বের পরিধিও খাটো করা হয়েছে। বাহিনীপ্রধানদের ও জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফদের ওপর দিয়ে প্রতিরক্ষা সচিব ও সিভিল সার্ভিসের তাঁর

অধস্তনরা যাবতীয় ক্ষমতা জাহির করেন। বাহিনীপ্রধানদের মর্যাদা খর্ব হওয়ার কিছু দায়িত্ব স্বয়ং বাহিনীপ্রধানদের ওপরেও বর্তায়। কারণ বাহিনীসমূহের মধ্যেকার পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সুযোগ নিয়েছে সিভিল সার্ভিস, যারা এক বাহিনীকে অন্যটির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। পরবর্তী সরকারগুলোও প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন প্রধান নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং চিফ্স অভ্ স্টাফ কমিটির সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে একটি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি সব সময়ই বিরোধিতার মুখে পড়েছে। কারণ প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন দৃঢ়চেতা প্রধান অভ্যুত্থানের কারণ হতে পারেন। ভারতের প্রেক্ষাপটে এধরনের ভয় অমূলক। ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছে বিভিন্ন জাতিসত্তার সদস্যদেরকে নিয়ে এবং এর নেতৃত্বেও আছেন বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মের নাগরিক। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে যেমন পাঞ্জাবিদের একচেটিয়া আধিপত্য, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তেমন নির্দিষ্ট কোনো জাতিসত্তার প্রাধান্য নেই।

ঊর্ধ্বতন কিছু সেনাকর্মকর্তার মধ্যে রাজনৈতিক অনুগ্রহলাভের এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। একজন আর্মি কম্যান্ডার একবার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের গুণগান করে এবং রাজ্য সরকারে অধিষ্ঠিত বিরোধী দলের সমালোচনা করে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন এবং প্রতিদানে তাঁর এক সিনিয়র সহকর্মীকে ডিঙিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান পদে নিয়োগ লাভ করেন। সেনাবাহিনীর প্রধান পদে নিয়োগ লাভের জন্য বাধ্যতা একটি বড় গুণ বলে প্রতীয়মান হয়। এমন উদাহরণও আছে, যেখানে রাজনৈতিক নীতিমালা অনুযায়ী সামরিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। দুর্বলভাবে পরিকল্পিত শ্রীলঙ্কায় হস্তক্ষেপের ঘটনাটি এর একটি বড় উদাহরণ। খুবই সিনিয়র একজন জেনারেলের হিসেবের ভিত্তিতে তাড়াহুড়ো করে অপারেশন চালানো হয়। তাঁর মতে এই অপারেশন শেষ করতে সাতদিনের বেশি লাগবে না! নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা-তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত সুনির্দিষ্ট সামরিক পরিকল্পনা ছাড়াই অপারেশন শুরু হয়। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে অর্জিত বিচ্ছিন্ন সাফল্য এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহরণের মধ্যে দিয়ে এটা শেষ হয়।

আমাদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সব সময়ই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। তাদেরকে নিয়ে জাতির গর্ব করা উচিত। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেও তাদেরকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা প্রয়োজন। তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও অন্য সুবিধাদিও তাদের প্রাপ্য। শান্তির সময়ে যে সশস্ত্র বাহিনীকে উপেক্ষা করা হয়েছে, বিপদের সময় রাতারাতি তাদেরকে উপযুক্ত মর্যাদা দিলেও তারা কার্যকরভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হবে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালানোর জন্য তার সাথে সম্যক পরিচিতি থাকা আবশ্যক এবং এর ওপরে দক্ষতা অর্জন করতে যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা যে পরিমাণ গুরুত্ব দাবি করে, সেটা তাকে দেয়া হয়নি। অস্থিতিশীল ও বিস্ফোরোন্মুখ ভূসামরিক (geomilitary)

পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত বর্তমান ও আগামী দশকের সম্ভাব্য হুমকির পুনর্মূল্যায়ন সরকারকে করতে হবে এবং রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার স্বার্থে সশস্ত্র বাহিনীকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে।

নয়াদিল্লীর ইন্ডিয়া গেটে অবস্থিত অমর জওয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল (Amar Jawan War Memorial)-এ যে রাইফ্‌ল ও হেলমেট দিয়ে সেন্টার-পিস তৈরি করা হয়েছে, সেটা যশোরের উপকণ্ঠে নিহত এক অজ্ঞাতপরিচয় সৈনিকের। এই মেমোরিয়ালে কোনো বাণী উৎকীর্ণ করা নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কোহিমা (Kohima)-তে নির্মিত ওয়ার মেমোরিয়ালের প্রস্তরে খোদাই করা আছে:

When you go home
Tell them of us and say
For your tomorrow
We gave our today.

(তোমাদের প্রিয়জনদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে আমাদের কথা বলো যে, তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য আমরা আমাদের বর্তমান বিসর্জন দিয়েছি।)

বহু যুগ আগে থার্মোপোলায়ে (Thermopolaye)-তে পরাহত স্পার্টান (Spartan)-দের সম্পর্কেও একই ধরনের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বাংলাদেশের ধানক্ষেতে আমাদের যেসব জওয়ান তাঁদের জীবন দান করেছেন, তাঁদের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। আমরা যেন তাঁদেরকে ভুলে না যাই।

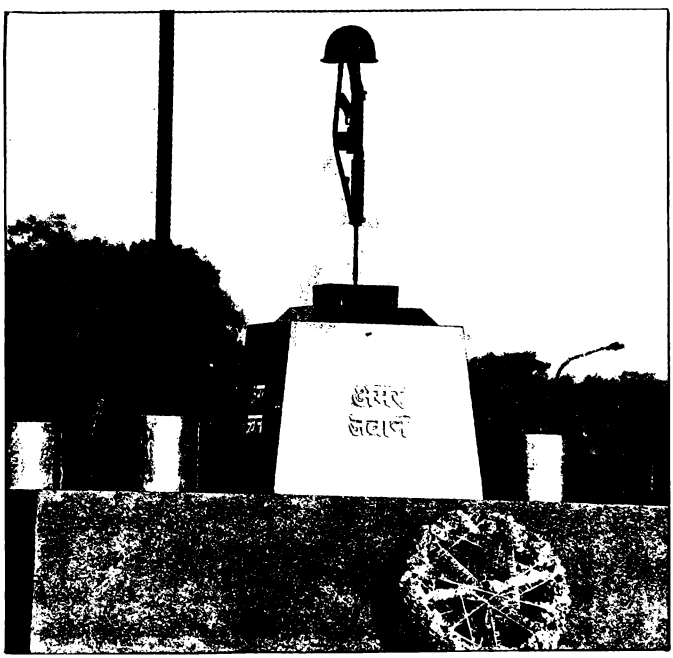

পরিশিষ্ট ১

৮ মার্চ ১৯৭৮-এ ফিল্ড মার্শাল এস এইচ এফ জে মানেকশ'র
প্রেরিত প্রশ্নমালা এবং
লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল জে এফ আর জেকবের উত্তর

১. ১৯৭১-এর যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ক. প্রয়োজনীয় সৈন্য-সংখ্যা;
খ. নৌ ও আকাশশক্তির ব্যবহার;
গ. গোয়েন্দা-কার্যক্রমে আমাদের সৈন্যদের ক্ষমতা;

ঘ. সামগ্রিক বিজয় অর্জনের সময়সীমা।

২. অপারেশনের সাফল্যের পেছনে যেসব উপাদান কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, যেমন: সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য, চমৎকার আন্তঃবাহিনী সহযোগিতা, উদ্দীপিত সুশিক্ষিত সেনানায়ক ও সেনানীরা।

৩. ১৯৭১-এর ইন্দো-পাক যুদ্ধকে এঞ্জিনিয়রদের যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এঞ্জিনিয়রদেরকে এই যুদ্ধে ১০,০০০ ফুট ব্রিজ তৈরি করতে হয়। অনেক সমস্যা ছিল: যেমন: উভচর যানবাহনগুলোকে নদী পার করা, খরস্রোতা নদী, নদী ও খালের প্রাচুর্য, কর্দমাক্ত নদীতট এবং শক্ত মাটির অভাবে হেলিকপ্‌টার 'এয়ার ব্রিজিং'-এর সঙ্কট। পরিকল্পনায় ও পরবর্তীতে যুদ্ধ পরিচালনায় এই বিষয়গুলোকে কেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল? সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় সেনাবাহিনীর জন্য ব্রিজস্থাপন কীভাবে আমরা নিশ্চিত করেছি এবং সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মূল বাহিনীকে কীভাবে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি?

৪. যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধ চলাকালীন ট্যাক্‌টিক্যাল ও স্ট্র্যাটেজিক্যাল গোয়েন্দা-তথ্যের ওপরে আমাদের বেসামরিক ও সামরিক গোয়েন্দা-ব্যবস্থার কতটুকু নিয়ন্ত্রণ ছিল। অপারেশনের আগে ও অপারেশনের সময় গোয়েন্দা-তথ্য সংগ্রহে ও প্রকৃত লড়াইয়ে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা। গোয়েন্দা-তথ্যাদি সংগ্রহ ও আমাদের সৈন্যদেরকে তা প্রদানের কাজে বেসামরিক জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছিল কি?

৫. ট্যাকটিক্যাল যুদ্ধে বিমান-আক্রমণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল কি না এবং করে থাকলে কীভাবে সেটা সমন্বিত ও সংঘটিত হয়?

৬. যুদ্ধে সৈন্যদল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জুনিয়র কম্যান্ডার ও এনসিও (NCO)-দের গুরুত্ব আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?

ফিল্ড মার্শাল এস এইচ এফ জে মানেকশ', এমসি
৮ মার্চ ১৯৭৮

মানেকশ'র প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমি নিচের উত্তর পাঠিয়ে দিই:

১. ১৯৭১-এর যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচিত বিষয়সমূহ

ক. *প্রয়োজনীয় সৈন্য-সংখ্যা:* আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে দেয়া আঞ্চলিক দায়িত্ব পালনের জন্য যে পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়, সেটা পর্যাপ্ত ছিল। অগাস্ট ১৯৭১-এ আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে ইস্যু করা অপারেশন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে সৈন্য বরাদ্দ করা হয়, যা পরবর্তীতে (১) 'প্রবেশপথ খুলনা ও চট্টগ্রাম' দখল; এবং (২) যত বেশি সম্ভব এলাকা অধিকারে নিয়ে আসাতে এসে থামে।

আপনার হয়ত স্মরণ আছে যে, অপারেশন রুমে অনুষ্ঠিত আলোচনায় অপারেশনের লক্ষ্য, বিশেষত 'আক্রমণের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত খুলনা' প্রসঙ্গে আপনার ডিএমও (DMO), কেকে (KK) ও আমার মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়। সে সময় আমি বলেছিলাম, সমাসন্ন নৌ-অবরোধের কারণে এই বন্দরগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি আরো বলেছিলাম, প্রধান ভূ-রাজনৈতিক কেন্দ্র হল ঢাকা। তাই উত্তরাঞ্চলে আক্রমণের জন্য প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত সৈন্যসংখ্যা অপর্যাপ্ত ছিল। আপনি ভালভাবেই অবগত আছেন, পরবর্তীতে ঢাকা দখলের লক্ষ্যে উত্তরদিকের চীন সীমান্ত থেকে আমরা আরো সৈন্য আনার ব্যবস্থা করি।

খ. *নৌ ও আকাশশক্তির ব্যবহার:* পাকিস্তানের সামগ্রিক শক্তি বিবেচনা করে আমাদের নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ওপরে যথাক্রমে একটি নৌ-অবরোধ আরোপ এবং সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার লক্ষ্যে আকাশে একটি সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি করার দায়িত্ব অর্পিত ছিল ।

রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের নৌ ও আকাশশক্তি খুব সীমিত থাকায় এই দায়িত্বগুলো কার্যকরভাবে পালিত হয়। পাকিস্তানের আকাশশক্তি প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আকাশযুদ্ধে তারা তেমন কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। একমাত্র এয়ারফিল্ড ঢাকায় তাদের ফাইটারগুলো জড়ো করা ছিল। আমাদের বিমানবাহিনীর উপযুক্ত আক্রমণ সেগুলোকে অকার্যকর করে রাখে। এরপরে আর কোনো বিমান আক্রমণ হয়নি। এই অঞ্চলে নৌবাহিনী নিয়োজিত করার ব্যাপারে পাকিস্তানের সামর্থ্যের অভাবের কারণে নৌ-অবরোধও সফলভাবে কার্যকর করা হয়।

গ. *গোয়েন্দা কার্যক্রমে আমাদের সৈন্যদের ক্ষমতার পরিধি:* একমাত্র যে গোয়েন্দা-ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে কার্যকরভাবে কাজ করে, সেটা সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স (SI)। যেসব যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম আমরা ব্যবহার করেছিলাম, সেসব ছিল সেকেলে এবং অপরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত। তার ওপরে এর নিয়ন্ত্রণ ছিল ডিরেক্টর অভ্ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স (DMI)-এর হাতে। কোনো নিখুঁত নির্দেশনা দেবার পক্ষে দিক-নির্দেশক যন্ত্রগুলো অনুপযোগী ছিল। আপনার হয়ত মনে আছে, আমার ক্রমাগত অনুরোধের প্রেক্ষিতে সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্সের নিয়ন্ত্রণভার আপনি সরাসরি ইস্টার্ন কম্যান্ডের ওপরে ন্যস্ত করেন। যন্ত্রপাতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কার্যকরভাবে

আমরা সেগুলোর পুনর্বিন্যাস করি এবং পাকিস্তানি সেনাবিন্যাস ও শক্তি সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক ধারণা লাভ করতে সমর্থ হই। প্রকৃতপক্ষে, এটাই ছিল আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। পরে আমরা কোড-ব্রেকিংও শুরু করি, কিন্তু শুধু ন্যাভাল কোডটাই আমরা ভাঙতে পেরেছি।

ঘ. *সামগ্রিক বিজয় অর্জনের সময়সীমা:* 'সময়সীমা'র বিষয়টি আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারিনি এবং 'সামগ্রিক বিজয় অর্জন' বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন, সেটাও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। যুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত আগে আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে সামগ্রিক বিজয়ের ধারণাটি জন্ম নেয়। আমার জানা মতে, এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা কখনো বেঁধে দেয়া হয়নি। ইস্টার্ন কম্যান্ডে প্রাথমিকভাবে আমরা তিন সপ্তাহের একটি সময়সীমা ধরে নিয়ে কাজ করেছি। আমাদের আশা ছিল, পরিস্থিতি অনুকূল হলে সময় আরো কম লাগবে।

২. অপারেশনের সাফল্যের পেছনে যেসব উপাদান কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, যেমন: সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য, চমৎকার আন্তঃবাহিনী সহযোগিতা, উদ্দীপিত সুশিক্ষিত সেনানায়ক ও সেনানীরা।

ক. *সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য:* কী ছিল আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য? রাজনৈতিক লক্ষ্য যদি হত বাংলাদেশের স্বাধীনতা, তাহলে কর্ম-পরিকল্পনা হওয়া উচিত ছিল ঢাকাসহ সারা দেশ দখল করা। এটা পরিষ্কার হয়ে থাকলে অগাস্টের অপারেশন নির্দেশিকায় উল্লেখ না করে যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত আগে করা হল কেন? সুনির্দিষ্টভাবে যদিও কোনোকিছুই বলা হয়নি, আমার ধারণা, মুক্ত অঞ্চলে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং সরকার প্রতিষ্ঠিত করার পর তাকে স্বীকৃতি দেয়াই ছিল আমাদের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য। আপনার স্মরণ থাকতে পারে যে, ময়মনসিংহ এলাকায় এই চেষ্টা করা হয় এবং এটা ব্যর্থ হয়ে যাবার পরে পূর্বাঞ্চলের দিকে মনোযোগ দেয়া হয়। তখন সেখানে সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল কি?

খ. *আন্তঃবাহিনী সহযোগিতা:* কম্যান্ড পর্যায়ে আন্তঃবাহিনী সহযোগিতার ক্ষেত্রে চমৎকার বোঝাপড়া ছিল।

গ. *উদ্দীপিত সুশিক্ষিত কম্যান্ডার ও সৈন্যদল:* ছিল।

৩. ১৯৭১-এর ইন্দো-পাক যুদ্ধকে এঞ্জিনিয়রদের যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এঞ্জিনিয়রদেরকে এই যুদ্ধে ১০,০০০ ফুট ব্রিজ তৈরি করতে হয়। সমস্যা ছিল অনেক: যেমন: উভচর যানবাহনগুলো নদী পার করা, খরস্রোতা নদী, নদী ও খালের প্রাচুর্য, কর্দমাক্ত নদীতট এবং সে কারণে হেলিকপ্টার 'এয়ার ব্রিজিং'-এর প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি। পরিকল্পনায় ও পরবর্তীতে যুদ্ধ পরিচালনায় এই বিষয়গুলোকে কেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল? কীভাবে আমরা সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় সেনাবাহিনীর জন্য ব্রিজ স্থাপন নিশ্চিত করেছি এবং সাজসরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মূল বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি?

এই যুদ্ধকে বরং কৌশলের যুদ্ধ বলাটা অধিকতর সঙ্গত হবে। যুদ্ধের সময় চলাচল ও লড়াই করতে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করাই এঞ্জিনিয়রদের কাজ। ব্রিজ তৈরি এ ধরনেরই একটি ব্যাপার। স্ট্র্যাটেজিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল বিবেচ্য বিষয় ছিল বিশেষত লক্ষ্যস্থল নির্বাচন এবং পাকিস্তানিদের সুরক্ষিত এলাকার পেছনে অবস্থিত যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র চিহ্নিত করে অগ্রসরের জন্য গতিপথ নির্ধারণ। জেনারেল নিয়াজির নিয়োজিত সুরক্ষিত নগরদুর্গসমূহকে আমরা পাশ কাটিয়ে যাই। এর অর্থ, পাকিস্তানিদের মূল প্রতিরোধ-ব্যবস্থা এড়িয়ে অগ্রসর হবার গতিপথ নির্ধারণ করতে হয়। কারণ প্রায় সমস্ত প্রধান সড়কেই পাকিস্তানি প্রতিরোধ ছিল। মেইন্টেন্যান্সের জন্য অক্ষরেখা পরবর্তীতে খুলে দেয়া হয়। যুদ্ধের পুরোটা সময় এটাই ছিল আমাদের ধরন। অন্যভাবে বলা যায় যে, অগ্রসর হবার অক্ষরেখা আর মেইন্টেন্যান্সের অক্ষরেখা যে একই হতে হবে, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। উপযুক্ত মেইন্টেন্যান্স লাইন উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা দিয়েও অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

হেলি-লিফ্‌ট

হেলিকপ্‌টার লিফ্‌ট ছিল আমাদের সচলতার একটি অংশ। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিশ্রুত এমআই৮ (Mi8)-গুলো সময়মতো না আসায় স্বল্প সংখ্যক এমআই৪ (Mi4)-এর মধ্যেই আমাদের হেলি-লিফ্‌ট সীমাবদ্ধ থাকে।

ব্রিজ তৈরি

ব্রিজ তৈরির সরঞ্জামাদি ইস্যু করার ব্যাপারে আর্মি হেডকোয়ার্টার্স ছিল ধীর গতিসম্পন্ন, এবং শেষ পর্যন্ত ডিএমও কে কে সিং যখন অগাস্টে তাঁর বিদায়ের আগে এগুলো ইস্যু করেন, তখন সেগুলো বিভিন্ন ডিপো থেকে সংগ্রহ করার পর প্রয়োজনীয় মেরামতি শেষ করে অকুস্থলে নিয়ে যেতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ডিসেম্বরের প্রারম্ভে শেষ ব্রিজটি অকুস্থলে পৌঁছায় এবং যুদ্ধ শেষ হবার পর আমাদের হাতে ব্রিজ তৈরির কোনো সরঞ্জামই আর অবশিষ্ট ছিল না — প্রতিটি ফুট কাজে লাগানো হয়েছে। কাঁচা রাস্তা দিয়ে ব্রিজ তৈরির সরঞ্জাম পরিবহন এবং ব্রিজে ওঠা ও নামার জায়গা নির্মাণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা দেখা দেয়। নিজেদের ও স্থানীয় সংস্থান ব্যবহার করে ব্যাপক ফেরি পারাপারের ওপরেও আমাদেরকে নির্ভর করতে হয়।

৪. যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধ চলাকালীন ট্যাক্‌টিক্যাল ও স্ট্র্যাটেজিক্যাল গোয়েন্দাগিরিতে আমাদের বেসামরিক ও সামরিক গোয়েন্দা-ব্যবস্থার কতটুকু প্রবেশ ছিল। অপারেশনের আগে ও অপারেশনের সময় গোয়েন্দাগিরিতে ও প্রকৃত লড়াইয়ে মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা। গোয়েন্দা-তথ্যাদি সংগ্রহ ও আমাদের সৈন্যদেরকে তা প্রদানে বেসামরিক জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছিল কি?

আবারও, আমার স্মৃতিশক্তি প্রতারণা না করলে, যুদ্ধের আগের পুরোটা সময়ে আমরা র'-এর তরফ থেকে মাত্র দুটো আধা পৃষ্ঠার গোয়েন্দা-রিপোর্ট পেয়েছি। সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্সই আমাদেরকে মূল তথ্যাদি সরবরাহ করে।

মুক্তিবাহিনী

গেরিলা অপারেশন সংগঠনে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুব সাবধানতার সাথে ধীরেসুস্থে স্থাপন করতে হয়। গেরিলা সৈন্যদেরকে ট্রেনিংয়ের সময় নেতাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচন করে তাদের জন্য ব্যাপক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নিবেদিত ও সুশিক্ষিত নেতৃত্ব ছাড়া গেরিলা অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

অপারেশন জ্যাকপটে ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে মানের চেয়ে সংখ্যার ওপরে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কার্যকর অধস্তন নেতৃত্বের অভাবে দায়সারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক গেরিলা সৈন্য তাদের সংখ্যার তুলনায় সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। নেতা-নির্বাচন ও তাদের ট্রেনিংয়ের ওপরে আরো গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন ছিল।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশী বাহিনী ও গেরিলাদের সাফল্য পুরোপুরি আমাদের আশানুরূপ হয়নি। তবে ট্রেনিং ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাভূত করার পেছনে তাদের অসাধারণ ভূমিকা ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়:

ক) প্রত্যন্ত এলাকা দখল

খ) প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়া এবং তাদের গতিবিধির স্বাধীনতা হরণ করে তাদের আস্তানায় তাদেরকে আটকে রাখা।

৫. বিমান আক্রমণ ট্যাকটিক্যাল যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল কি না এবং করে থাকলে কীভাবে সেটা সমন্বিত ও সংঘটিত হয়?

বিমান আক্রমণ

যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে স্থান পরিবর্তন এবং আমাদের বাই-পাসিং ট্যাক্‌টিক্‌সের কারণে আমরা মূলত যুদ্ধক্ষেত্রকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করা এবং ঢাকার পথে যে নদীগুলো পড়ে, সেগুলোর তীরবর্তী এলাকায় পাকিস্তানিদের গতিবিধি নিষিদ্ধ করার জন্য বিমান ব্যবহার করি। মাটিতে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর ওপরে আক্রমণের জন্য আমরা বিমান ব্যবহার করিনি বললেই চলে। পাকিস্তানিদেরকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা অবশ্য খুবই বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল। এই বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়ায় আমাদের প্ররোচনায় ন্যাট (Gnat) বিমান দিয়ে ছোটখাট যে আক্রমণগুলো চালানো হয়, সেগুলো মোটামুটি সাফল্য লাভ করে। অপারেশনের দ্রুত গতির কারণে সর্টি (আক্রমণের জন্য বিমানের লক্ষস্থলে যাত্রা)-তে যাওয়া যুদ্ধ-বিমানগুলো কাজে লাগানো ছিল আমাদের জন্য এক গুরুতর সমস্যা। আমরা অবশ্য এক সেক্‌টরের অব্যবহৃত সর্টিগুলো অন্য সেক্‌টরে ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ফল লাভ করেছি।

৬. যুদ্ধে সৈন্যদল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জুনিয়র কম্যান্ডার ও এনসিও (NCO)-দের গুরুত্ব আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?

সাধারণভাবে জুনিয়র অফিসার ও এনসিওরা ভাল কাজ করেছেন এবং সাহসিকতা ও উদ্যমের স্বাক্ষর রেখেছেন। জেসিও (JCO)-দেরকে অবশ্য সাবধানী বলে মনে হয়েছে।

পরিশিষ্ট ২

INSTRUMENT OF SURRENDER SIGNED AT DACCA AT 1631 HOURS (IST)

ON 16 DEC 1971

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. The forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

Jagjit Singh — AAK Niazi Lt Gen.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

পরিশিষ্ট ৩

প্রাপক ব্রিগেডিয়ার এইচ এস ক্লের (H S Kler)

ব্রিগেড কম্যান্ডার
৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড
জামালপুর
091735 Dec

শ্রদ্ধেয় ব্রিগেডিয়ার,

আশা করি ভাল আছেন। আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

জামালপুরে আমরা সকলে যুদ্ধ শুরুর অপেক্ষায় বসে আছি। এখনো যুদ্ধ শুরুই হয়নি। কাজেই আর কথাবার্তা না বলে যুদ্ধ শুরু করা যাক।

আমার ধারণা, ৪০টি সর্টি খুবই কম। আমাদেরকে কাবু করতে আপনার আরো বেশ কিছু চেয়ে পাঠাতে হবে।

আপনার দূতের সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য আপনার তরফ থেকে কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন ছিল না। এতে বোঝা যায়, আমার লোকদের সম্পর্কে আপনি কতটা নিচু ধারণা পোষণ করেন। আশা করি, এখানকার চা তার ভাল লেগেছে।

মুক্তিবাহিনীর জন্য আমার ভালবাসা রইল।

পরবর্তীতে যদি দেখা হয়, আশা করছি, আপনার হাতে তখন কলমের পরিবর্তে একটি স্টেন থাকবে, যদিও কলম ব্যবহারেই আপনাকে বেশি পারদর্শী মনে হচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

[কর্নেল সুলতান]
অধিনায়ক, জামালপুর দুর্গ

পরিশিষ্ট ৪

লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল এ কে ফিলিপ
কম্যান্ডিং অফিসার

235 Yantrik Jalparivahan
Parichalan Company Engineers
235 IWT, Op Coy Engineers
Alambazar, Calcutta
01 Jan. 87

প্রিয় জেনারেল,

জুলাই ১৯৭১-এ কলকাতা ও পাটনা থেকে আইডাব্লিউটি জাহাজসমূহের স্থানান্তর সম্পন্ন হয়। যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত জাহাজগুলো ফারাক্কা বাঁধের ভাটিতে জমায়েত করে রাখা হয়। আইডাব্লিউটি টাস্ক ফোর্সের আরো ভাটিতে গঙ্গায় যাবার কথা ছিল এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজে পৌঁছানোর পর ইনফ্যান্ট্রি ও আর্মার বাহিনীকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার কথা ছিল। টাস্ক ফোর্সে কাজ করেছেন, এমন কয়েকজন জেসিও-র সাথে কথা বলে মিলিয়ে দেখেছি যে, ০৫ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ তাঁরা হার্ডিঞ্জ ব্রিজে পৌঁছান এবং এর পর থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ার আগে পর্যন্ত আইডাব্লিউটি টাস্ক ফোর্স সেখান থেকে ফরিদপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোনো নির্দেশ পায়নি। এই ইউনিটকে অবশ্য ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়, যেটা তারা পালন করে এবং ফেরার পথে যুদ্ধবন্দিদেরকে জাহাজে উঠিয়ে নিয়ে আসে।

উষ্ণ অভিবাদন ও শুভেচ্ছা,

এ কে ফিলিপ

লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল জে এফ আর জেকব

পরিশিষ্ট ৫

ব্যক্তিগত

মেজর জেনারেল জে এফ আর জেকব
চিফ অভ্ স্টাফ

হেডকোয়ার্টার্স ইস্টার্ন কম্যান্ড
ফোর্ট উইলিয়াম
কলকাতা
১৫ নভেম্বর ১৯৭১

প্রিয় ইন্দর,

১. পাকিস্তানের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের সামগ্রিক স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে এই চিঠি লিখছি। পূর্বাঞ্চলে ত্বরিৎ আক্রমণের এখনই উপযুক্ত সময়। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রয়োজনে খুব দ্রুত আমাদের লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারব। এ প্রসঙ্গে এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলব না।

২. পশ্চিমাঞ্চলের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সেখানে মজবুত আর্মার্ডসহ সুসজ্জিত এক বাহিনীর মুখোমুখি আপনাকে হতে হচ্ছে। এছাড়াও অসংখ্য প্রতিরক্ষাদুর্গ ও প্রতিবন্ধক থাকার কারণে অগ্রসর হওয়া একই সাথে হবে কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ। এখানে আমরা দেখেছি যে, যথাযথভাবে নির্মিত প্রতিবন্ধকগুলো ভাঙতে অনেক সময় লাগে এবং এজন্য চড়া দাম দিতে হয়। আমার ধারণা, সীমান্তে আমরা আমাদের দিকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছি। উভয় পক্ষের সেনাবিন্যাস অনুযায়ী, পরস্পরকে বড় ধরনের চমক দেবার উপায় নেই। কারণ পরস্পর পরস্পরের শক্তি ও অবস্থান সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত।

৩. ওপরের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি, পূর্বাঞ্চলে ত্বরিৎ আক্রমণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে সাফল্যের সাথে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার কৌশল অবলম্বন করা উচিত। আমাদের দৃঢ় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার ওপরে পাকিস্তানিদেরকে হামলা চালাতে প্রলুব্ধ করতে হবে এবং তাদের সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতির ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হবার পরে এবং প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংসের পরে প্রধান লক্ষ্য পাকিস্তানের ভূ-কৌশলগত প্রাণকেন্দ্র মুলতান আক্রমণের জন্য আমাদের সৈন্যদেরকে আবার নতুন করে সংগঠিত করতে হবে। পূর্বাঞ্চলে আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে পশ্চিমে আমরা পর্যাপ্ত সৈন্য পাঠাতে পারব।

৪. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রাথমিক বিন্যাস সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ থেকে আমার মনে হয় যে, শেখরগড় (Shakargarh)-এর স্ফীতিকে আমাদের সৈন্যদলগুলোকে প্রলুব্ধ করে টেনে নিয়ে আসার জন্য তৈরি করা হচ্ছে। দক্ষিণ অংশেও উল্লেখযোগ্য সৈন্যসমাবেশ হয়েছে এবং সেখান থেকে তারা হিসাম রোড অথবা বিকানের দিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ রচনা করতে পারে। এটা যে আপনি ইতোমধ্যেই বিবেচনা করেছেন, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

৫. বারবার একই কথা বলার ঝুঁকি নিয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, কোনো নির্দিষ্ট এলাকার, বিশেষত মরুভূমির দখল আঁকড়ে পড়ে থাকা সঙ্গত হবে না। নিজেদের দখলে থাকা এলাকাগুলোকে ব্যবহার করতে হবে পাকিস্তানিদেরকে প্রলুব্ধ করার কাজে, যাতে তাদের

জন্য অসুবিধাজনক ও দুরূহ যোগাযোগ-ব্যবস্থাসম্পন্ন অথচ আমাদের পছন্দমতো এলাকায় তাদেরকে আমরা মুখোমুখি পেতে পারি। আমার ধারণা, পশ্চিমে আমরা সারা সীমান্ত জুড়ে তাদেরকে আক্রমণের পরিকল্পনা করছি। এতে করে আমাদের আক্রমণের ধার কমে যাবে এবং কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যথেষ্ট জোরালো আঘাত হানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। রাজস্থা ন থেকে চালানো এসব বিচ্ছিন্ন আক্রমণে সামগ্রিকভাবে আমাদের কী লাভ হবে? বরং শত্রুকে অপ্রয়োজনীয় জায়গা দখল করতে প্রলুব্ধ করে যেসব জায়গা গুরুত্বপূর্ণ এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে যেসব এলাকা আমাদের কাজে আসবে, সেসব জায়গায় আমাদের সৈন্যসমাবেশ ঘটাতে হবে। শত্রুপক্ষের সামগ্রিক বাহিনীকে হারানোই আমাদের মূল লক্ষ্য।

৬. উভয় দিক থেকেই ফোর্ট আব্বাস (Fort Abbas)-এর সংলগ্ন এলাকার গুরুত্বের কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম। কাজে লাগাতে চাইলে এটাই একমাত্র উপযুক্ত জায়গা।

৭. এসব আমার ব্যক্তিগত মতামত। এগুলোকে আপনি যেমন খুশি গুরুত্ব দিতে পারেন। আপনি যদি মনে করেন, এসব পরামর্শে কিছুটা হলেও সারবত্তা আছে, সেক্ষেত্রে আপনার আনুষঙ্গিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সময় এখনো আছে।

৮. সবশেষে জন বানইয়ান (John Bunyan) তাঁর 'পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেস (Pilgrims Progress)' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন:

What is my gold be wrapped
up in ore
who throws away the apple
for the core.

(আকরিকের মধ্যে মোড়ানো আছে সেই আমার রত্ন, যে ভেতরের শাঁসের জন্য আপেল ফেলে দেয়।)

বিশ্বস্ত
জেক

মেজর জেনারেল আই এস গিল, পিভিএসএম, এমসি
ডিএমও

পরিশিষ্ট ৬

১৯৯৬ সালে দেয়া জেনারেল স্যাম মানেকশ'র সাক্ষাৎকার

১৯৭১-এর যুদ্ধের সময়ে অ্যাডমিরাল নন্দ ও অ্যাডমিরাল ডসন (Dawson)-এর মতো ব্যক্তিত্ব ওয়ার রুমে ছিলেন। যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে অথবা যুদ্ধ চলাকালীন তাঁদের এমন কোনো কর্মকাণ্ডের কথা আপনি স্মরণ করতে পারবেন কি, যা আজও মনে পড়ে অথবা কৌতূহলোদ্দীপক কোনো বিষয় হিসেবে আপনার চেতনায় বার বার ফিরে আসে?

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের একটা ঘটনা বলি। তারিখটা আমার সঠিক মনে নেই। এপ্রিলের দিকে কোনো এক সময়কার ঘটনা। একটা কেবিনেট মিটিঙে আমাকে ডাকা হয়। বন্যার পানির মতো পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় শরণার্থীদের অব্যাহত চাপের কারণে শ্রীমতি গান্ধীকে অস্থির ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল।

"দেখুন এদিকে—এত শরণার্থী আসছে—আসামের মুখ্যমন্ত্রী টেলিগ্রাম করেছেন, টেলিগ্রাম করেছেন.... এ ব্যাপারে আপনারা কী করছেন?" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি উত্তর দিলাম, "কিছুই না। এখানে আমার কী করার আছে?"

তিনি বললেন, "কিছুই কি আপনার করার নেই? আপনারা এখনো কিছু একটা করছেন না কেন?"

"আপনি আমাকে কী করতে বলেন?"

"আপনি আপনার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান।"

আমি বললাম, "এর অর্থ যুদ্ধ" এবং তিনি বললেন, "তাই যদি হয়, হোক। কিছু এসে যায় না।"

এর পরে আমি বসে পড়লাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি বাইবেল পড়েছেন?"

সর্দার শরণ সিং (Sardar Swaran Singh) জানতে চাইলেন, "এখানে বাইবেলের প্রসঙ্গ আসছে কোথা থেকে?"

"বাইবেলের আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে আছে, ঈশ্বর বললেন, 'আলোকিত হোক এবং সবকিছু আলোকিত হয়ে গেল (Let there be light and there was light)' — আপনিও অনুভব করছেন, 'যুদ্ধ হোক আর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।' আপনি কি এজন্য প্রস্তুত? আমি তো অন্তত প্রস্তুত নই।"

এর পর আমি বললাম, "কী ঘটছে, সেটা আমি আপনাকে বলছি। এখন এপ্রিল শেষ। আর কয়েকদিন অর্থাৎ ১৫-২০ দিন পরেই শুরু হবে বর্ষাকাল। আর পূর্ব পাকিস্তানে বৃষ্টির মৌসুমে নদীগুলো সমুদ্রের মতো হয়ে যায় — একদিকের পারে দাঁড়ালে অপর পার দেখা যায় না। এ রকম পরিস্থিতিতে আমরা রাস্তায় আটকা পড়ে যাব। বিমানবাহিনীও আমাদেরকে সহায়তা করতে পারবে না। পাকিস্তানিরা তখন আমাদেরকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে — এটা গেল এক দিক।

"দ্বিতীয়ত, আমার আর্মার্ড ডিভিশন এখন বাবিনা (Babina) এলাকায়; অন্য ডিভিশনটি — কোনটি, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না — আছে সেকান্দারাবাদ (Secunderabad) এলাকায়। আমাদের এখন ফসল কাটার মৌসুম। সৈন্য পরিবহনের জন্য প্রতিটি যানবাহন,

প্রতিটি ট্রাক, প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি রেলপথ আমার প্রয়োজন পড়বে। সেক্ষেত্রে শস্য পরিবহন সম্ভব হবে না।" একথা বলে আমি কৃষিমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ (Fakruddin Ali Ahmed)-এর দিকে ফিরে বললাম, "এবং ভারতে দুর্ভিক্ষ শুরু হলে সবাই দোষ দেবে আমাকে। এই দায়ভার আমি ঘাড়ে নিতে চাই না।"

এর পর ঘুরে আমি বললাম, "যে আর্মার্ড ডিভিশন আমার মূল শক্তি, তাদের হাতে কাজ চালানোর উপযোগী মাত্র বারোটি ট্যাঙ্ক আছে।"

ওয়াই বি চ্যবন (Y B Chavan) জিজ্ঞাসা করলেন, "মাত্র বারোটি কেন, স্যাম?"

আমি বললাম, "কারণ আপনিই অর্থমন্ত্রী, স্যার। মাসের পর মাস আমি এটার পেছনে লেগে আছি, এটা নিয়ে দেন-দরবার করেছি। আপনি বলেছেন, 'কোনো টাকা নেই।' — সেই কারণে।"

এর পরে বললাম, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ১৯৬২ সালে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে জেনারেল থাপারের পরিবর্তে আপনার পিতা যদি আমাকে বলতেন, 'চীনাদেরকে ঘাড় ধরে বার করে দাও,' তাহলে আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলতাম, 'দেখুন, এগুলো হল সমস্যা।' এখন আমি আপনাকে বলছি, সমস্যাগুলো কী। এর পরেও আপনি যদি বলেন এগিয়ে যেতে, আমি আপনাকে শতকরা ১০০ ভাগ পরাজয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এবারে আপনি আদেশ করুন।"

জগজীবন রাম (Jagjeevan Ram) তখন বললেন, "স্যাম, মেনে নাও না ভাই *(Sam, maan jao na)*।"

আমি বললাম, "আমি আমার পেশাগত অবস্থান থেকে যা বলার, বলেছি। এখন সরকারকে তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

প্রধানমন্ত্রী কিছু বললেন না। তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, চারটার সময় আবার মন্ত্রিসভার বৈঠক বসবে *(Achchha, cabinet char baje milenge)*।"

সবাই বেরিয়ে গেলেন। কনিষ্ঠতম হিসেবে আমার সবচেয়ে পরে যাবার কথা। প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আমি হাসলাম।

"চিফ, বসুন।"

আমি তখন তাঁকে বললাম, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি কিছু বলার আগে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি চান যে, মানসিক অথবা শারীরিক স্বাস্থ্যগত কোনো কারণ দেখিয়ে আমি পদত্যাগপত্র দাখিল করি?"

তিনি বললেন, "ওহ্ স্যাম, আপনি বসুন। আপনি আমাকে যা যা বলেছেন, সবই কি ঠিক?"

"জি। দেখুন, লড়াই করা আমার কাজ। জয়ের জন্য লড়াই করাই আমার কাজ। আপনি কি তৈরি? আমার কিন্তু প্রস্তুতি নেই। অভ্যন্তরীণ সব বিষয়ে সব ধরনের প্রস্তুতি কি আপনার আছে? আন্তর্জাতিক চাপ সামলানোর প্রস্তুতি কি আপনার আছে? আমার মনে হয় না। আমি জানি, আপনি কী চান। কিন্তু এই কাজ অবশ্যই আমার সময় অনুযায়ী আমাকে করতে হবে। সেটা করতে দেয়া হলে সাফল্যের ব্যাপারে আমি আপনাকে শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারি। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই। যুদ্ধে একজন মাত্র কম্যান্ডার থাকবে। বিএসএফ, সিআরপিএফ বা আপনি যাঁকে পছন্দ করেন, কারো অধীনে কাজ করতেই আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমি চাই না, কোনো সোভিয়েত এসে আমার কর্তব্য

নির্ধারণ করে দিক। আমার একজন রাজনৈতিক অধিকর্তা থাকতে হবে, যাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাজ করব। আমি চাই না, শরণার্থী, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা — সব মন্ত্রণালয় আমাকে নির্দেশ দিক। এবারে আপনি মনস্থির করুন।"

তিনি বললেন, "ঠিক আছে, স্যাম। আপনিই অধিনায়ক এবং কেউ আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।"

"ধন্যবাদ। এবারে আমি আপনাকে সাফল্যের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।"

কাজেই ফিল্ড মার্শাল হওয়া ও চাকরিচ্যুত হওয়ার মধ্যে সূক্ষ্ম এক সীমারেখার অস্তিত্ব ছিল! যে কোনোটা ঘটতে পারত! এই একটা ঘটনার কথা আমি বলতে পারি এবং এটা আপনি আপনার ভাষায় বর্ণনা করতে পারেন।

অন্য দুই বাহিনীপ্রধান সম্পর্কে কিছু বলুন। তাঁরা কখন এতে সংশ্লিষ্ট হন?

প্রাথমিক আলোচনায় তাঁরা ছিলেন না। তাঁদেরকে পরে আমার ব্রিফ করতে হয়। এ সম্পর্কে সবকিছু তাঁদেরকে আমার বলতে হয়।

সূত্র: *কোয়ার্টারডেক*, ডিরেক্টরেট অভ্ এক্স-সার্ভিসমেন'স অ্যাফেয়ার্স, নেভাল হেডকোয়ার্টার্স, নয়া দিল্লী, ১৯৯৬।

পরিশিষ্ট ৭

পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনী
লড়াই শুরুর আগে সেনাবিন্যাস ও অবস্থান

বিন্যাস/ইউনিট	অবস্থান
হেডকোয়ার্টার্স ইস্টার্ন কম্যান্ড (লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি)	ঢাকা
আর্টিলারি	ঢাকা, কিছু অংশ যশোর ও কুমিল্লায়
৪৩ কম্পো. এলএএ রেজিমেন্ট	
৪৬ এলএএ ব্যাটারি	চট্টগ্রাম
৩৬ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন (মেজর জেনারেল মোহা. জামশেদ খান)	
হেডকোয়ার্টার্স	ঢাকা
৯৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার আবদুল কাদির খান)	
হেডকোয়ার্টার্স	ময়মনসিংহ
৮৩ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মর্টার ব্যাটারি	জামালপুর ময়মনসিংহ
৩৩ পাঞ্জাব	ময়মনসিংহ ফুলপুর হালুয়াঘাট
৩১ বালুচ	জামালপুর রাজেন্দ্রগঞ্জ হাতিবান্ধা দেওয়ানগঞ্জ টাঙ্গাইল
৭০ উইং রেঞ্জার্স	ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ
৭১ উইং রেঞ্জার্স	জারিয়াঝাঞ্জাইল শিবগঞ্জ বিরিশিরি বিজয়পুর
৩৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন (মেজর জেনারেল রহিম খান)	
হেডকোয়ার্টার্স	চাঁদপুর (তৈরির প্রক্রিয়ায় ছিল, কিন্তু অপারেশন শুরু হওয়ায় শেষ হয়নি)
৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট	কুমিল্লা ফেনী
৫৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার মোহা: আসলাম নিয়াজি)	
হেডকোয়ার্টার্স	ফেনী
১৫ বালুচ	ফেনী অজল
৩৯ বালুচ	লাকসাম মিয়াবাজার চৌদ্দগ্রাম

পরিশিষ্ট ৭ : পরবর্তী অংশ

বিন্যাস/ইউনিট	অবস্থান
২৩ পাঞ্জাব	মিয়াবাজার পরীকোট
২১ একে ব্যাটালিয়ন	লাকসাম ফেনী
১১৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার শেখ মনসুর হুসেন আত্তিফ)	
হেডকোয়ার্টার্স	কুমিল্লা
স্কোয়াড্রন ট্যাঙ্কস (শ্যাফী)	কুমিল্লা অঞ্চল
৩০ পাঞ্জাব	সালদানদী বিবিরবাজার
২৫ এফ এফ	লালমাই ময়নামতি, সেই সাথে লাকসামের কিছু অংশ
১২ একে ব্যাটালিয়ন (দুই কোম্পানি কম)	কুমিল্লা
৯১ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার মিয়া তাসকিন-উদ-দিন)	
হেডকোয়ার্টার্স (নির্মাণাধীন)	চট্টগ্রাম
২৪ এফএফ	রামগড় করেরহাট জোরারগঞ্জ চট্টগ্রাম
৯৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার আতা মোহা. খান মালিক)	
হেডকোয়ার্টার্স	চট্টগ্রাম
৪৮ বালুচ (গ্যারিসন ব্যাটালিয়ন)	চট্টগ্রাম
২ কম্যান্ডো ব্যাটালিয়ন	রাঙ্গামাটি কাপ্তাই
৬০ উইং রেঞ্জার্স ৬১ উইং রেঞ্জার্স	চট্টগ্রাম রামগড় করেরহাট অঞ্চল, সেই সাথে কক্স বাজারে এক কোম্পানি
১৪ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন (মেজর জেনারেল কাজি আবদুল মজিদ খান)	
হেডকোয়ার্টার্স	আশুগঞ্জ
৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট	সিলেট শমশেরনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮৮ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মর্টার ব্যাটারি	সিলেট
১৭১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মর্টার ব্যাটারি	কুমিল্লা
২০২ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার আসগর হুসেন)	
হেডকোয়ার্টার্স	সিলেট
৩১ পাঞ্জাব	ছাতক—সিলেট—জৈন্তিয়াপুর—চরখাই
৯১ মুজাহিদ ব্যাটালিয়ন (দুই কোম্পানি কম)	সুনামগঞ্জ—শেওলা অঞ্চল

পরিশিষ্ট ৭ : পরবর্তী অংশ

বিন্যাস/ইউনিট	অবস্থান
খাইবার রাইফ্‌ল্‌স থাল স্কাউট্‌স তোচি স্কাউট্‌স	সারা অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের সাথে বিন্যস্ত ছিল
২ কোম্পানি এক্স ১২ একেআর ব্যাটালিয়ন	সিলেট
৩১৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার ইফতিখার রানা)	
হেডকোয়ার্টার্স	মৌলভিবাজার
২২ বালুচ	কুলাউড়া জুরি অঞ্চল
৩০ এফএফ	শ্রীমঙ্গল শমশেরনগর কমলপুর অঞ্চল
৯১ মুজাহিদ ব্যাটালিয়নের দুই কোম্পানি	ফেঞ্চুগঞ্জ শেরপুর অঞ্চল
তোচি স্কাউটসের অংশ	বড়লেখা অঞ্চল
২৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ্ খান)	
হেডকোয়ার্টার্স	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
দুই ট্রুপ ট্যাঙ্ক (শ্যাফী)	আখাউড়া
৩৩ বালুচ	কসবা সাইদবা কুট অঞ্চল
১২ এফএফ	গঙ্গাসাগর আখাউড়া পাহাড়পুর ফকিরমুরা অঞ্চল
১৬ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন (মেজর জেনারেল নাজির হুসেন শাহ্)	
হেডকোয়ার্টার্স	নাটোর (বগুড়া অঞ্চলে স্থানান্তরের অসমর্থিত রিপোর্ট)
স্কোয়াড্রন কম ২৯ সিএভি	ঠাকুরগাঁও দিনাজপুর ঘোড়াঘাট হিলি
৪৮ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ঠাকুরগাঁও হাতিবান্ধা নাগেশ্বরী অঞ্চল
৮০ ফিল্ড রেজিমেন্ট	ক্ষেতলাল হিলি
১১৭ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মর্টার ব্যাটারি	নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
২৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার ইকবাল মোহা. শফি)	
হেডকোয়ার্টার্স	সৈয়দপুর
২৫ পাঞ্জাব (৮ পাঞ্জাবের দ্বারা অব্যাহতি পাবার কথা)	হাতিবান্ধা লালমণিরহাট নাগেশ্বরী কুড়িগ্রাম
২৬ এফএফ	দিনাজপুর ফুলবাড়ি

পরিশিষ্ট ৭ : পরবর্তী অংশ

বিন্যাস/ইউনিট	অবস্থান
৪৮ পাঞ্জাব	ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড়
৮ পাঞ্জাব	লালমণিরহাট রংপুর
৩৪ পাঞ্জাব (রেসি ও স্পেশাল ব্যাটালিয়ন)	ঠাকুরগাঁও বোদা নীলফামারী
৮৬ মুজাহিদ ব্যাটালিয়ন	অংশ বিশেষ হাতিবান্ধা হিলি গাইবান্ধা ও রংপুর
২০৫ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড	
(ব্রিগেডিয়ার তোজাম্মল হুসেন মালিক)	
হেডকোয়ার্টার্স	ক্ষেতলাল
৩২ বালুচ	ঘোড়াঘাট গোবিন্দগঞ্জ
৪ এফএফ	হিলি
৩ বালুচ	জয়পুরহাট জয়পুর ও মুহাব্বতপুর
৩৪ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড	
(ব্রিগেডিয়ার আবদুল নাঈম)	
হেডকোয়ার্টার্স	নাটোর
৩২ পাঞ্জাব	নওয়াবগঞ্জ শিবগঞ্জ রহনপুর রাজশাহী
কোম্পানি ১২ পাঞ্জাব	ঈশ্বরদী
১৩ এফএফ	পত্নীতলা রসুলবাগ সাপাহার গণ্ডারডাঙ্গা
৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন	
(মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারী)	
হেডকোয়ার্টার্স	যশোর
৩ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্মড স্কোয়াড্রন (শ্যাফী)	যশোর (২২ নভেম্বরে স্কোয়াড্রন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়)
৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট	সাতক্ষীরা (এক ব্যাটারি) ও ঝিকরগাছা অঞ্চল (২ কোম্পানি)
৪৯ ফিল্ড রেজিমেন্ট	মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা কুষ্টিয়া
২১১ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মর্টার ব্যাটারি	চৌগাছা
৫৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড	
(ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আহমেদ)	
হেডকোয়ার্টার্স	ঝিনাইদহ্
স্কোয়াড্রন ২৯ সিএভি	কুষ্টিয়া ভেড়ামারা অঞ্চল
১৮ পাঞ্জাব	মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা দর্শনা নাটুদহ অঞ্চল
৫০ পাঞ্জাব	ঝিনাইদহ্ কোটচাঁদপুর অঞ্চল
২৯ বালুচ	ভেড়ামারা সলিমপুর খালিসকুণ্ডি কুষ্টিয়া

পরিশিষ্ট ৭ : পরবর্তী অংশ

বিন্যাস/ইউনিট	অবস্থান
১০৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড	
(ব্রিগেডিয়ার মালিক হায়াত খান)	
হেডকোয়ার্টার্স	যশোর
২২ এফএফ	ঝিকরগাছা বেনাপোল
৩৮ এফএফ	আফরা সাজিয়ালি আশানগর
৬ পাঞ্জাব	যশোর
২১ পাঞ্জাব (রেসি ও স্পেশাল ব্যাটালিয়ন)	সাতক্ষীরা কলারোয়া যশোর
১৫ এফএফ	যশোর
কোম্পানি কম ১২ পাঞ্জাব	যশোর

পরিশিষ্ট ৭ পরবর্তী অংশ

সারসংক্ষেপ

বিন্যাস/ইউনিট	মোট	মন্তব্য
ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন হেডকোয়ার্টার্স	৩	একটি স্কেলেটন (হেডকোয়ার্টার্স ৩৬ ডিভিশন) এবং একটি নির্মাণাধীন (হেডকোয়ার্টার্স ৩৯ ডিভিশন) ছাড়া
ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স	১৩	একটি স্কেলেটন (৯১ ব্রিগেড)-সহ
ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন	৩৫	দুটি একে ব্যাটালিয়নসহ
আর্মার্ড রেজিমেন্ট (২৯ সিএভি)	১ (শ্যাফী)	
ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমার্ড স্কোয়াড্রন	২ (সেই সাথে দুই ট্রুপ পিটি-৭৬)	
ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি	৬	
ইন্ডিপেন্ডেন্ট মর্টার ব্যাটারি আর্টিলারি	৫	
এলএএ রেজিমেন্ট আর্টিলারি	১	
এলএএ ব্যাটারি আর্টিলারি	১	
ফ্রন্টিয়ার কোর উইংস অ্যান্ড রেঞ্জার্স	৭	
মুজাহিদ ব্যাটালিয়ন	৫	

পরিশিষ্ট ৮

সেনাবিন্যাস : ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস

ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস (মেজর জেনারেল মোহা. জামশেদ খান, ডিরেক্টর জেনারেল)	ঢাকা
ঢাকা সেক্টর	
হেডকোয়ার্টার্স	ঢাকা
১৩ উইং	ঢাকা অঞ্চল
১৬ উইং	ঢাকা
যশোর সেক্টর	
হেডকোয়ার্টার্স	যশোর
৪ উইং	চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল
৫ উইং	খুলনা বাগেরহাট বরিশাল অঞ্চল
১৫ উইং	যশোর চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল
রাজশাহী সেক্টর	
হেডকোয়ার্টার্স	রাজশাহী
৬ উইং	রাজশাহী নওয়াবগঞ্জ রহনপুর অঞ্চল
৭ উইং	নওগাঁ পত্নীতলা অঞ্চল
? উইং	বগুড়া সিরাজগঞ্জ অঞ্চল
রংপুর সেক্টর	
হেডকোয়ার্টার্স	রংপুর
৮ উইং	দিনাজপুর
৯ উইং	ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় অঞ্চল
১০ উইং	রংপুর লালমণিরহাট অঞ্চল
কুমিল্লা সেক্টর	
হেডকোয়ার্টার্স	কুমিল্লা
১ উইং	কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩ উইং	
১২ উইং	কুমিল্লা

পরিশিষ্ট ৮ : পরবর্তী অংশ

বিন্যাস/ইউনিট	অবস্থান	
চট্টগ্রাম		
হেডকোয়ার্টার্স	চট্টগ্রাম	
২ উইং	ফেনী অঞ্চল	
১১ উইং	চট্টগ্রাম অঞ্চল	অংশত
১৪ উইং	চট্টগ্রাম অঞ্চল	কক্সবাজারে

পরিশিষ্ট ৯

১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত অপারেশনের জন্য
ইস্টার্ন কম্যান্ডের সৈন্যদল-বিভাজন

Formation	*Groupings of*			
	Infantry	*Armour*	*Artillery*	*Engineers*
(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*
II CORPS (Lt Gen T N Raina) Corps Tps			HQ 8 Mtn Arty Bde Bty 48 AD Regt Tp 107 AD Regt (TA) 4 Air Op Flt less two Secs 11 Air Op Flt	CE Corps HQ 58 Engr Regt 268 Army Engr Regt One Pl ex 702 Engr Plant Coy Det 235 IWT Op Coy with 4xRPLs and 2x40 man boats Adv Engr Pk Kankinara One Pl 972 Tpt Coy ASC (Tipper) 63 Engr Regt

পরিশিষ্ট ৯ : পরবর্তী অংশ

(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*
4 Mtn Div (Maj Gen M S Barar)	HQ 7 Mtn Bde (Brig Zail Singh) 22 Rajput 5 Jat Naga Regt	A Sqn 45 Cav	HQ 4 Mtn Arty Bde 22 Mtn Regt (76 mm) 194 Mtn Regt (76 mm) 7 Fd Regt (25 Pr) 181 Lt Regt (120 Tampella) Bty 78 Med Regt (130 mm)	
	HQ 41 Mtn Bde (Brig Tony Michigan) 5 Guards 9 Dogra 5/1 GR			
	HQ 62 Mtn Bde (Brig Rajinder Nath) 5 Maratha LI 4 Sikh LI 2/9 GR			
9 Inf Div (Maj Gen Dalbir Singh)	HQ 32 Inf Bde (Brig M Tewari) 7 Punjab 8 Madras 13 Dogra	45 Cav less a Sqn Sqn 63 Cav	HQ 9 Arty Bde 6 Ft Regt (25 Pr) 14 Fd Regt (25 Pr) 67 Fd Regt (25 Pr) 78 Med Regt (130 mm) less one Bty 88 Lt Regt (120 mm Brandt)	102 Engr Regt

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	HQ 42 Inf Bde (Brig Rajinder Nath) 14 Punjab 19 Maratha LI 2 Sikh LI		201 Div Loc Bty 264 SBRL Increment (Grad-P)	
	HQ 350 Inf Bde (Brig H S Sandhu) 26 Madras 4 Sikh 1 J&K Rif			
MAIN IV CORPS (Lt Gen Sagat Singh) Corps Tps		No 1 Indep Sqn 7 Cav No 5 Indep Sqn 63 Cav No 5 Ad-hoc Sqn Ferret Cars	HQ IV Corps Arty Bde Tp 46 Ad Regt (L/60) 124 Div Loc Bty 24 Med Regt Bty 48 Ad Regt 6 Air Op Flt 11 Air Op Flt	CE IV Corps 4 Engr Regt 62 Engr Regt 234 Army Engr Regt 967 Engr Wksp and Pk Coy Engr Park/Advance Parks Parks Silchar/Dharamnagar/ Teliamura

পরিশিষ্ট ৯ : পরবর্তী অংশ

(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*
				971 Tpt Coy ASC (Tipper) 108 Engr Regt
8 Mtn Div (Maj Gen K V Krishna Rao)	HQ 59 Mtn Bde (Brig C A Quinn) 9 Guards 6 Rajput 4/5 GR		HQ 2 Mtn Arty Bde 99 Mtn Regt (75/24 mm) 93 Mtn Regt (75/24 mm) Bty 85 Lt Regt (120 Brandt) Bty 40 Med Regt (5.5 in)	
	HQ 81 Mtn Bde (Brig R C V Apte) 3 Punjab 4 Kumaon 10 Mahar			
23 Mtn Div (Maj Gen R D Hira)	HQ 83 Mtn Bde (Brig B S Sandhu) 2 Rajput 3 Dogra 8 Bihar		HQ 23 Mtn Arty Bde 57 Mtn Regt (76 mm) 197 Mtn Regt (76 mm) 198 Mtn Regt (76 mm) 183 Lt Regt (120 Brandt)	3 Engr Regt
	HQ 181 Mtn Bde (Brig Y C Bakshi) 6 Jat 9 Kumaon 18 Kumaon		262 SBRL Increment (Grad-P)	

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	HQ 301 Mtn Bde (Brig H S Sodhi) 14 Jat 3 Kumaon 1/11 GR			
57 Mtn Div (Maj Gen B F Gonsalves)	HQ 61 Mtn Bde (Brig Tom Pande) 7 Raj Rif 2 Jat 12 Kumaon		HQ 57 Mtn Arty Bde 23 Mtn Regt (75/24 mm) 59 Mtn Regt (75/24 mm) 65 Mtn Regt (75/24 mm) 82 Lt Regt (120 Brandt) 124 Div Loc Bty	15 Engr Regt
	HQ 73 Mtn Bde (Brig Tuli) 14 Guards 19 Punjab 19 Raj Rif			
	HQ 311 Mtn Bde (Brig Misra) 4 Guards 18 Rajput 10 Bihar			

পরিশিষ্ট ৯ : পরবর্তী অংশ

(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*
Mizo Hills Range	(Allotted to Kilo Force) HQ Mizo Hills Range 31 Jat (Mod I) 32 Mahar (Mod I)			
Ex 2 Mtn Div	HQ 5 Mtn Bde 3 Rajput 2 Dogra 2 Garh Rif	Allotted to101 Comm Z for Dacca thrust	Allotted by Eastern Command in November. Released by Army HQ for employment on 8 Dec.	
Ex 5 Mtn Div	HQ 167 Mtn Bde 6 Sikh LI 6 Bihar 10 J & K Rif	Allotted to Comm Z for Dacca thrust		
XXXIII CORPS (Lt Gen M L Thapan) Corps Tps		63 Cav less Sqn 69 Armd Regt	HQ XXXIII Corps Arty Bde Bty 46 AD Regt Two Secs 4 Air Op Flt 15 Air Op Flt	CE XXXIII Corps HQ 471 Engr Bde 11 Engr Regt 52 Engr Regt 111 Engr Regt 235 Army Engr Regt 651 Engr Plant Coy 342 Engr Wksp and Pk Coy

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
				585 Engr Park Bengdubi Br Coy Normal 1133 ASC Bn 972 Tpt Coy ASC (Tipper) less one Pl
6 Mtn Div (Maj Gen P C Reddy)	HQ 9 Mtn Bde 5 Grenadiers 4 Rajput HQ 99 Mtn Bde 18 Sikh 11 Garh Rif 16 Kumaon	Army HQ reserve for Bhutan	HQ 6 Mtn Arty Bde 94 Mtn Regt (75 mm USA) 98 Mtn Regt (75 mm USA) 184 Lt Regt less one Bty (120 Brandt)	51 Engr Regt
20 Mtn Div (Maj Gen Lachhman Singh)	HQ 66 Mtn Bde (Brig G S Sharma) 1 Guards 6 Guards 17 Kumaon HQ 165 Mtn Bde (Brig R S Pannu) 20 Maratha LI 16 Rajput 6 Assam		HQ 20 Mtn Arty Bde 64 Mtn Regt (75/28 mm) 95 Mtn Regt (75/24 mm) 100 Mtn Regt (75/24 mm) 33 Lt Regt (120 Brandt) 38 Med Regt (5.5 in)	13 Engr Regt

পরিশিষ্ট ৯ : পরবর্তী অংশ

(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*
	HQ 202 Mtn Bde (Brig F P Bhatty) 8 Guards 22 Maratha LI 5 Garh Rif			
	HQ 164 Mtn Bde 9 Grenadiers 1 Assam 2 /1 GR			
340 Mtn Bde Gp	HQ 340 Mtn Bde Gp (Brig Joginder Singh) 4 Madras 2 /5 GR 5/11 GR		97 Mtn Regt (75/24 mm)	
71 Mtn Bde (under Corps HQ)	HQ 71 Mtn Bde (P N Kathpalia) 7 Maratha LI 12 Raj Rif 21 Rajput			

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
50 Indep Para Bde (Brig M Thomas)	HQ 50 Indep Para Bde 2 Para 7 Para 8 Para		17 Para Fd Regt (75 mm USA)	411 Para Fd Coy
Bengal Area	1/3 GR 11 Bihar 12 Garh Rif			CE Bengal Zone 261 Bomb Disposal Pl 8 Engr E and M Coy
101 Comn Z area (Maj Gen Gurbax Singh, Maj Gen G C Nagra)	HQ 95 Mtn Bde (Brig H S Kler) 13 Guards 1 Maratha LI 13 Raj Rif 5/5 GR	Allotted 167 and 5 Mtn Bdes	56 Mtn Regt (76 mm) Bty 85 Lt Regt (120 Brandt) Bty 90 Mtn Regt (75/24 mm) Bty 85 Lt Regt (120 Brandt)	CE/North Eastern Zone 94 Fd Coy ex 59 Engr Regt 262 Bomb Disposal Pl 583 Engr Pk Narangi 584 Engr Pk Jorhat
312 Indep AD Bde	Moved to Western Sector 6 Dec		HQ 312 Indep AD Bde 19 AD Regt (L/70) 28 AD Regt (L/60) 46 AD Regt less three tps (L/60) Bty 48 AD Regt (L/60)	

পরিশিষ্ট ৯ : পরবর্তী অংশ

(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*
342 Indep AD Bde	Moved to Western Sector 6 Dec		HQ 342 Indep AD Bde 25 AD Regt (L/70) 47 AD Regt (L/60) 48 AD Regt less one Bty (L/60)	
Comd reserve				203 Army Engr Regt 457 IWT Engrs and one P1 235 IWT Op Coy ESD Panagar HQ 191 Bomb Disposal Gp

পরিশিষ্ট ১০

আমাদের পক্ষের হতাহত

বিন্যাস	অফিসার			জেসিও			ওআর			এনসিও		
	নিহত	আহত	নিখোঁজ	নিহত	আহত	নিখোঁজ	নিহত	আহত	নিখোঁজ	নিহত	আহত	নিখোঁজ
২য় কোর	১৭	৫৫		২০	৫০		৩৩০	১১৭৪	৫	১	৩	
৪র্থ কোর	২৫	৮৪		২৩	৫৮		৪৮৮	১৪০০	২৩	২	৫	
৩৩শ কোর	১৬	৫৪		১১	৩৩	২	৩৪৪	৮৭৪	৮		২	
বাংলা অঞ্চল							২	৩				
১০১ সাধারণ এলাকা	৭	১৭		৬	১৯	১	১২৩	২২৫	১৭		১	
৫০ ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্যারা ব্রিগেড	৩	১					৩					
মোট	৬৮	২১১		৬০	১৬০	৩	১২৯০	৩৬৭৬	৫৩	৩	১১	

পরিশিষ্ট ১১

আওয়ামী লীগের ছয় দফা
আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র থেকে উদ্ধৃত

ছয়-দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান একটি ফেডারেশন হিসাবে গঠিত হবে, যার প্রতিটি অংশ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসন অর্জন করবে।

১ নং দফা

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশনরূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২ নং দফা

ফেডারেশন সরকারের এক্তিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার — দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকবে।

৩ নং দফা

এই দফায় দুটি বিকল্প প্রস্তাব আছে। এর যে কোনো একটি গ্রহণ করলেই চলবে:

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র 'স্টেট ব্যাংক' থাকবে।

খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে; দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪ নং দফা

সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হয়ে যাবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকের ওপরে বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হবে।

৫ নং দফা

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে।
২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এক্তিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এক্তিয়ারে থাকবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রপ্তানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

৬ নং দফা

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আঞ্চলিক সরকারের ওপরে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি বাহিনী গঠনের ক্ষমতা ন্যস্ত করতে হবে।

সূত্র: *পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র*

পরিশিষ্ট ১২

২৬ মার্চ ১৯৭১-এ প্রচারিত
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণ

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

এ মার্সের ৬ তারিখে আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন বসবে। আমি আশা করেছিলাম, নির্দিষ্ট দিনে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার মতো পরিস্থিতি বিরাজ করবে। সংঘটিত ঘটনাবলি অবশ্য এই আশার যথার্থতা প্রমাণ করেনি। জাতি আজ এক ভয়াবহ সঙ্কটের মুখোমুখি।

আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এক অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করেছে এবং এর ফলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। খুব দ্রুত পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এই লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সাথে আমি বেশ কয়েক দফা আলোচনা করি এবং অবশেষে ১৫ মার্চ আমি ঢাকায় যাই।

আপনারা অবগত আছেন যে, বিদ্যমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমি বেশ কয়েকবার আলোচনা করি। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী আমার জন্য একই কাজ সেখানেও করার প্রয়োজন পড়ে, যাতে মতৈক্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা এবং একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসা যায়।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকা ও অন্যান্য সংবাদ-মাধ্যমসমূহের প্রচারিত সংবাদ অনুযায়ী, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার আলোচনার অগ্রগতি হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার আলোচনা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে আরেক দফা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করি।

মি. জুলফিকার আলি ভুট্টো ২১ মার্চ ঢাকায় পৌঁছান এবং তাঁর সাথে আমি বেশ কয়েক দফা আলোচনা করি।

আপনারা অবগত আছেন যে, আওয়ামী লীগের নেতা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগেই সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছেন। আলোচনার সময় তিনি প্রস্তাব দেন, যাতে আমি এই অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক আইন প্রত্যাহার, প্রাদেশিক সরকার গঠন এবং শুরু থেকেই দুটি পৃথক কমিটিতে — যার একটিতে থাকবেন পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যবৃন্দ এবং অন্যটিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যবৃন্দ — জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিই।

আইনগত ও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রস্তাবনার বেশ কিছু গুরুতর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বার্থে এতে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করতে নীতিগতভাবে রাজি ছিলাম, কিন্তু এক শর্তে। শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা আমার এই শর্তটি হল এই যে, এতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের দ্ব্যর্থহীন মতৈক্য থাকতে হবে।

এর পরে এই প্রস্তাব নিয়ে আমি অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার সাথে আলোচনা করি। তাঁরা সকলে একই মত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, আমার প্রস্তাবিত ঘোষণার কোনো আইনগত ভিত্তি থাকবে না। এতে না থাকবে সামরিক আইনের মোড়ক, না হবে এটা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন। এর ফলে এক শূন্যতার সৃষ্টি হবে এবং এক গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। পৃথকভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলে তা সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে উৎসাহিত করবে বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে, অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় অধিবেশনের একটি অন্তর্বর্তীকালীন অধিবেশনে এ-সংক্রান্ত একটি সাংবিধানিক বিল আনয়ন করে সেটা আমার অনুমোদনের জন্য পেশ করা যেতে পারে। এতে আমি সম্পূর্ণ সম্মত হই এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে এ প্রসঙ্গে যৌক্তিক মনোভাব পোষণ করতে বলার জন্য তাঁদেরকে অনুরোধ করি।

নেতৃবৃন্দকে তাঁর কাছে আমি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে বলি যে, এ ধরনের একটি প্রক্রিয়া —যার মাধ্যমে একদিকে ক্ষমতার যাবতীয় উৎস, যেমন: সামরিক আইনকে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে এবং অন্যদিকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতেও ব্যর্থ হচ্ছে — তা শুধু গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিরই জন্ম দিতে পারে। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে তাঁর কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তাঁর সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করবেন বলে কথা দেন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আলাদাভাবে দুই অংশে করার জন্য শেখ মুজিবের প্রস্তাবে রাজনৈতিক নেতারাও শুরু থেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ ধরনের একটি পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতার পরিপন্থী বলে তাঁরা অনুভব করেন।

পাকিস্তান পিপ্‌ল্‌'স পার্টির চেয়ারম্যানও শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সাথে আমার আলোচনার সময় একই দৃষ্টিভঙ্গির কথা মুজিবকে জানান।

যেসব নেতা এই প্রসঙ্গে মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন, ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় তাঁরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে জানান যে, প্রস্তাবনার কোনো পরিবর্তন করতে মুজিব রাজি নন। একমাত্র যে জিনিসটি তিনি চান, তা হল, সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আমার ঘোষণা।

শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলন রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। তিনি ও তাঁর দল তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রের আইনসঙ্গত কর্তৃপক্ষকে অস্বীকার করেছেন। তারা পাকিস্তানের পতাকা ও জাতির পিতার ছবির অবমাননা করেছে। তারা একটি সমান্তরাল সরকার চালাবার চেষ্টা করেছে। তারা ব্যাপক গোলযোগ, সন্ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিয়েছে।

আন্দোলনের নামে বেশ কিছু হত্যা সংঘটিত হয়েছে। কোটি কোটি বাঙালি ভাই ও পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অন্যান্যরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক লোকজন প্রাণভয়ে এই অংশ ত্যাগ করেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সব ধরনের বিদ্রূপ ও অপমানের সম্মুখীন হচ্ছে। চরম উস্কানির মুখেও তারা যে স্থৈর্যের স্বাক্ষর রেখেছে, সেজন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তাদের শৃঙ্খলাবোধ প্রশংসার দাবিদার। তাদের জন্য আমি গর্বিত।

কয়েক সপ্তাহ আগেই আমি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর অনুচরদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে আমার পরিকল্পনা যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য আমি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছি। এই লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থেকে আমি একের পর এক বেআইনি কার্যকলাপ সহ্য করেছি এবং একই সাথে একটি যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সমস্ত সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখেছি। শেখ মুজিবুর রহমানকে যুক্তিপূর্ণ পথে আনার লক্ষ্যে আমার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের প্রচেষ্টার কথা আমি ইতোমধ্যেই বলেছি। কোনো সম্ভাবনাই আমরা অপরীক্ষিত রাখিনি। কিন্তু তিনি গঠনমূলক সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে তিনি ও তাঁর লোকজন, এমন কি ঢাকায় আমার উপস্থিতিতেও, সরকারি কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত ঘোষণার পরিকল্পনাটি একটি ফাঁদ ছাড়া কিছুই নয়। তিনি জানতেন, এই প্রস্তাবনার মূল্য এক টুকরো কাগজের চেয়ে বেশি নয় এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার করলে সেই শূন্যতার সুযোগে কোনো ঝুঁকি ছাড়াই তিনি যা-খুশি-তাই করতে পারতেন। তাঁর একগুঁয়েমি, জেদ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনায় অস্বীকৃতি থেকে একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যেতে পারে — এই ব্যক্তি ও তাঁর দল পাকিস্তানের শত্রু এবং তাঁরা এই দেশ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চান। এই রাষ্ট্রের সংহতি ও অখণ্ডতার ওপরে তাঁরা আক্রমণ করেছেন। তাঁর এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

কতিপয় ক্ষমতালিপ্সু দেশদ্রোহী ব্যক্তিকে এই দেশ ধ্বংস করে বারো কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে আমরা ছিনিমিনি খেলতে দেব না।

৬ মার্চে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমার ভাষণে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা, সংহতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্তব্য। সরকারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আমি তাদেরকে তাদের কর্তব্য পালন করতে নির্দেশ দিয়েছি।

এদেশে বিদ্যমান সঙ্কটময় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমি সারা দেশে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হল। সংবাদপত্রের ওপরে আমি সম্পূর্ণ সেন্সরশিপ আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত সামরিক আইনের বিধিসমূহ অবিলম্বে ইস্যু করা হবে।

সবশেষে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমি অবিচল আছি। পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ামাত্র এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমি নতুন করে উদ্যোগ নেব।

আমি আশা করি, পূর্ব পাকিস্তানের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবিলম্বে স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং আমরা আবার আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারব।

পাকিস্তানবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সৃষ্ট এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আমি দেশবাসীকে ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে নিজেদের কর্তব্য পালনের আহ্বান জানাই। কারণ এর মধ্যেই নিহিত আছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও মুক্তি।

খোদা আপনাদের সহায় হোন। খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।

সূত্র: *পাকিস্তান হরাইজোন*, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা ১০৭~১০।

পরিশিষ্ট ১৩

৩১ মার্চ ১৯৭১-এ ভারতের লোকসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত
শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর উত্থাপিত

পূর্ববঙ্গে সংঘটিত সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে লোকসভা প্রগাঢ় বেদনা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পরিচালিত সশস্ত্র বাহিনী এক ব্যাপক আক্রমণে সমগ্র পূর্ববঙ্গের জনগণের দাবিদাওয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা দমন করতে তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর ১৯৭০-এর নির্বাচনে সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে পাকিস্তান সরকার জনগণের এই ম্যান্ডেটকে অবজ্ঞা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পাকিস্তান সরকার শুধু নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকারই করেনি, বরং নিয়মবহির্ভূত উপায়ে জাতীয় পরিষদকে তার ন্যায্য ও সার্বভৌম ভূমিকা পালনে বাধা দিয়েছে। সামরিক শক্তির নগ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের জনগণকে লক্ষ্য করে বেয়নেট, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভারতের সরকার ও জনগণ সব সময়ই পাকিস্তানের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করেছে। এই উপমহাদেশের জনগণের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত পারস্পরিক বন্ধন যেহেতু বহু-শতাব্দী-প্রাচীন, সীমান্তের এত কাছে সংঘটিত প্রলয়সম মর্মান্তিক ঘটনাবলিতে এই সভা নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ওপরে নজিরবিহীন এই বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনগণ সন্দেহাতীতভাবে তাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছে।

পূর্ববঙ্গের জনগণের গণতন্ত্রের সংগ্রামে এই সভা তাদেরকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন এবং তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে।

শান্তি রক্ষায় ভারতের স্থায়ী স্বার্থ এবং মানবাধিকার সংরক্ষণে আমাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি শিরোধার্য করে এই সভা অরক্ষিত জনগণের নিধনযজ্ঞ থেকে সামরিক বাহিনীকে বিরত থাকার দাবি জানাচ্ছে। পাকিস্তান সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে অবিলম্বে এই পরিকল্পিত গণহত্যা বন্ধ করার জন্য বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের প্রতিও এই সভা আহ্বান জানাচ্ছে।

পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঐতিহাসিক জাগরণ যে শেষ পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করবে, এই সভা সে ব্যাপারে তার দৃঢ় আশাবাদ নথিভুক্ত করছে। এই সভা এই মর্মে তাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে, তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগে তারা সব সময় ভারতের জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করবে।

সূত্র: *বাংলা দেশ ডকুমেন্টস*, পৃষ্ঠা ৬৭২

পরিশিষ্ট ১৪

২ এপ্রিল ১৯৭১-এ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে লেখা প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোরনির চিঠি

সম্মানিত মি. প্রেসিডেন্ট,

ঢাকায় আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক প্রশাসন চরম ব্যবস্থা গ্রহণকে যথাযথ বলে মনে করেছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে তারা সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করেছে, এই সংবাদে সোভিয়েত ইউনিয়ন শঙ্কিত।

এ ধরনের একটি পদক্ষেপ পাকিস্তানের জনসাধারণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি, অবর্ণনীয় কষ্ট ও বঞ্চনা ডেকে এনেছে, তাতে সোভিয়েত জনগণ উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সমর্থনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী এম. রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার ও নির্যাতনেও সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বিগ্ন। সোভিয়েত জনগণ সব সময়ই আন্তরিকভাবে পাকিস্তানি জনগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করেছে এবং সে দেশের যে কোনো জটিল সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পন্থার সাফল্যে উৎফুল্ল হয়েছে।

পাকিস্তানি জনগণের এই দুর্দশার দিনে বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না। আমরা সবসময়ই বিশ্বাস করে এসেছি এবং এখনো মনে করি যে, পাকিস্তানে সম্প্রতি যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তার সমাধান অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করেই করতে হবে। অব্যাহত পীড়ননীতি ও রক্তপাতের ফলে সমস্যার সমাধান নিঃসন্দেহে সুদূরপরাহত হয়ে যাবে এবং তা পাকিস্তানের জনগণের সামগ্রিক মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করবে।

ইউএসএসআর (USSR)-এর সুপ্রীম সোভিয়েতের পক্ষ থেকে, মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার কাছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করাটা আমরা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করছি এবং সেই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত দমন-পীড়ন ও রক্তপাত অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে বিদ্যমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি। আমরা আশাবাদী, পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণের স্বার্থ এবং এই অঞ্চলের শান্তি রক্ষার স্বার্থ সংরক্ষণে এই পদক্ষেপ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। উদ্ভূত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হলে সোভিয়েত জনগণ স্বস্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে সাধারণভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং পাকিস্তানের বন্ধুপ্রতিম জনসাধারণের কল্যাণের জন্য আমাদের উদ্বেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে আমরা আপনার কাছে এই আবেদন জানাচ্ছি।

যে মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে আমরা এই আবেদন জানাচ্ছি, আশা করি, মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি সেটা সঠিকভাবে অনুধাবন করবেন। আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি, সম্ভাব্য ন্যূনতম সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক।

সূত্র: *বাংলা দেশ ডকুমেন্টস,* পৃষ্ঠা ৫১০–১১।

পরিশিষ্ট ১৫

১৩ এপ্রিল ১৯৭১-এ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে লেখা মি. চৌ এন লাই-এর চিঠি

আপনার চিঠি আমি পড়েছি এবং আপনার সাথে রাষ্ট্রদূত চ্যাং টুং (Chang Tung)-এর আলোচনাসম্পর্কিত তাঁর রিপোর্টটিও পড়েছি। চীন সরকারের ওপরে আপনার আস্থার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। চীন এবং পাকিস্তান বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী। পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনাবলির ব্যাপারে চীনের সরকার ও জনসাধারণ পর্যবেক্ষণ করছে। পাকিস্তানের সংহতি বজায় রাখা এবং বিচ্ছিন্নতা রোধ করার লক্ষ্যে আপনি ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবর্গ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আপনার ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবর্গের প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত ও প্রচেষ্টার ফলে খুব শিগ্‌গিরই বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আমরা মনে করি, পাকিস্তানের অখণ্ডতা এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ঐক্যই পাকিস্তানের সমৃদ্ধি ও সাফল্যের নিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতিতে হাতে-গোনা কিছু ব্যক্তি যারা পাকিস্তানের সংহতি ধ্বংস করতে চায়, তাদেরকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পাকিস্তানের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে আপনার সদয় বিবেচনার জন্য আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করছি।

একইসাথে আমরা লক্ষ করেছি যে, আপনার দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সুযোগে ভারত সরকার পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একের পর এক সেই একই কাজ করে যাচ্ছে। এ ধরনের অযৌক্তিক ও অন্যায় হস্তক্ষেপের খবর এবং আপনার দেয়া পদগোরনিব চিঠির উত্তর চীনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। চীন সরকার মনে করে, পাকিস্তানে যা কিছু ঘটছে, সেটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, যা কেবল পাকিস্তানের জনগণ নিজেরাই সমাধান করতে পারে। এখানে বিদেশী হস্তক্ষেপের কোনো অবকাশ নেই। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, সম্প্রসারণবাদী ভারত পাকিস্তানে আগ্রাসন চালালে বরাবরের মতো পাকিস্তানের সরকার ও জনগণকে তাদের রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও জাতির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে চীনের সরকার ও জনগণ দৃঢ় সমর্থন প্রদান করবে।

সূত্র: *পাকিস্তান হরাইজোন*, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা ১৫৩~৪।

পরিশিষ্ট ১৬

১৯ জুলাই ১৯৭১-এ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিকে দেয়া উ থান্টের স্মারকলিপি

গত কয়েক মাস যাবত পূর্ব পাকিস্তান ও তৎসংলগ্ন ভারতীয় রাজ্যসমূহে সংঘটিত ঘটনাবলি এবং তার পরিণাম ও সম্ভাব্য পরিণামের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং জাতিসংঘের কিছু সংখ্যক সদস্য গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। মার্চ ১৯৭১-এর ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমার উদ্বেগের কথা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আমি জানিয়েছি এবং জাতিসংঘে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট স্থায়ী প্রতিনিধি ও অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান — উভয় দেশের সরকারের সাথে আমি এ ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ক মহাসচিবসহ আমি জাতিসংঘের দ্বৈত কর্তব্যের বিষয়টি তীব্রভাবে অনুভব করেছি। এ সংক্রান্ত ধারা ২, অনুচ্ছেদ ৭ পালনের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ ও মানবতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার সীমারেখার মধ্যে কাজ করতে হবে।

আমার দ্বিতীয় কর্তব্য মাথায় রেখে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থী এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের সাহায্যের জন্য আমি আবেদন জানিয়েছিলাম। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সাহায্য যথাযথভাবে প্রদানের লক্ষ্যে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের সাহায্যার্থে আমি ইউনাইটেড নেশন্স হাই কমিশনার ফর দি রিফিউজীজকে দায়িত্ব প্রদান করি এবং পাকিস্তান সরকারের সম্মতিক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের সাহায্যার্থে প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক সাহায্য সামগ্রীর উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে ঢাকায় একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করি। মানবিক এইসব উদ্যোগ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ১৬ জুলাই ১৯৭১-এ দিনব্যাপী আলোচনার ব্যবস্থা করে। পরিষদের কাছে প্রদত্ত ইউনাইটেড নেশন্স হাই কমিশনার ফর দ্য রিফিউজীজ ও ইন্টার-এজেন্সি অ্যাফেয়ার্সের সহকারী মহাসচিবের দেয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আমার আবেদনে উদারভাবে সাড়াদানকারী সরকারসমূহ, জাতিসংঘের সংস্থা ও কার্যক্রমসমূহ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের কাছে আমি আমার উষ্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। আমার প্রতিনিধির সাথে সমন্বয় রক্ষা করে চলার কারণে আমি ভারত ও পাকিস্তান সরকারকেও ধন্যবাদ জানাই।

মার্চ মাসের পরে বেশ কয়েক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, অথচ এই এলাকার সার্বিক পরিস্থিতির ধারাবাহিক ক্রমাবনতি ঘটছে। এতে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তিত বোধ করছি। আমার আবেদনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদার সাড়া সত্ত্বেও ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য প্রাপ্ত অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী এখনো প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। ভারত সরকার এখনো অনির্দিষ্টকালের জন্য লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর তত্ত্বাবধানের পাহাড়সম দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। শরণার্থীদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে পর পর দুটি, এর মধ্যে একটি প্রাকৃতিক, বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার ও

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্যম বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে এবং জনপ্রশাসন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রচুর পরিমাণে ত্রাণসামগ্রীর ব্যবস্থা করতে না পারলে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যসঙ্কট এমনকি দুর্ভিক্ষও — দেখা দিতে পারে। এ বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, ভারত থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শরণার্থীর প্রত্যাবর্তনের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক আবহ এবং ব্যাপক ত্রাণ-কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এক অতি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। পরিস্থিতি আসলে এমনই যে, সেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াবলি এক অচ্ছেদ্য বিষচক্র তৈরি করেছে, যা এই মানবতা সংরক্ষণে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্যোগকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলছে।

মানুষের এই দুর্দশার পরিণাম হবে আরো ব্যাপক। উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিসত্তাসমূহের মধ্যেকার সামগ্রিক পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরে এই সহিংস বিদ্বেষ বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কও এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার নীতিমালা ও ব্যক্তিত্বগত বিরোধ প্রায়ই ভ্রাতৃহত্যার মতো ঘটনার জন্ম দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ধরনের ঘটনার ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। বর্তমান বিষয়টিতে বিপদের বাড়তি একটি উপাদান আছে। সেটা হল, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিরোধ, যে বিরোধ মাত্র ছয় বছর আগেও দু'দেশের মধ্যেকার যুদ্ধের কারণ হয়েছিল। যদিও বিরোধ মিটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো দেশের সরকারেরই দ্বিমত থাকার কথা নয়, তবুও দেখা যাচ্ছে যে, কোনো পক্ষই নমনীয় হতে রাজি নয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় সংঘটিত ঘটনাবলি বাড়তি জটিলতার জন্ম দিচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় সংঘর্ষ, চোরাগোপ্তা হামলা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের হার দিনে দিনে বেড়েই যাচ্ছে এবং শরণার্থী প্রত্যাবাসনকে বাস্তবায়িত করতে হলে সীমান্ত অতিক্রমের বিপদটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেবে। এমন কি জাতিসংঘে আমাদের এটা ভুলে যাবার উপায় নেই যে, এই উপমহাদেশে যে কোনো বিবাদ খুব সহজেই বিস্তার লাভ করতে পারে।

উপমহাদেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির মতো দুঃখজনক পরিস্থিতিতে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলা খুবই সহজ। কিন্তু এই পরিস্থিতির রাজনৈতিক ও মানবিক বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া এবং মানুষের দুর্দশা দূর করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর সমাধান খুঁজে বার করতে তাদেরকে সহায়তা করা সত্যিই কঠিন। আমার মতে, এই পরের কাজটিই জাতিসংঘকে করতে হবে।

আমার মনে হয় না যে, বর্তমান পরিস্থিতি ও তার সম্ভাব্য পরিণতির খুব হতাশাব্যঞ্জক ছবি আমি এঁকেছি। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা লাঘব ও সম্ভাব্য সর্বনাশ রোধের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পরিস্থিতির অবনতি পর্যবেক্ষণ করে যখন আশা করতে পারত যে, ত্রাণ কার্যক্রম, মানবোচিত উদ্যোগ ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে এলেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, সেই সময় পেরিয়ে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিণতির ব্যাপারে আমার গভীর উদ্বেগ শুধু মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যাপারেও এটা এক গুরুতর হুমকি, যা

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কর্মকাণ্ডের কার্যকর সাংগঠনিক মাধ্যম হিসেবে জাতিসংঘের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত করে তুলবে। আমার ধারণা, মানবিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার মিশ্রণে এই দুঃখজনক পরিস্থিতি এমনভাবে জট পাকিয়ে গেছে যে, সেগুলোকে আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই। এটা জাতিসংঘের সামনে সামগ্রিকভাবে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে, যেটা অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতি ভবিষ্যতেও তৈরি হতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করতে পারলে ভবিষ্যতে উদ্ভূত এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার মতো দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা জাতিসংঘ অর্জন করতে পারবে।

এসব কারণে, পরিষদের আলোচ্য বিষয়সূচিতে নেই — এমন একটি বিষয়ে পরিষদের সভাপতির কাছে রিপোর্ট করার মতো একটি অস্বাভাবিক পদক্ষেপ আমি নিয়েছি। এই বিষয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব এমনই সুদূরপ্রসারী যে, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা এই সমস্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার আগে মহাসচিবের পক্ষে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। অবশ্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শান্তি রক্ষায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং সালিশি ও রাজি করানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থানের সাহায্যে জাতিসংঘের উচিত মানুষের দুর্দশা উপশমের লক্ষ্যে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা, যাতে এই পরিস্থিতির আর অবনতি না হয়।

সর্বোচ্চ মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং তার সমাধানে সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদেরই পালন করার কথা। এই প্রক্রিয়াগুলো কি আনুষ্ঠানিকভাবে না কি অনানুষ্ঠানিকভাবে, প্রকাশ্যে না গোপনে পালিত হবে, সঙ্গত কারণে এটা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদেরকেই নির্ধারণ করতে হবে। এই পর্যায়ে আমার প্রাথমিক কর্তব্য হল, এ ধরনের আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ সৃষ্টি করা এবং আমার উদ্বেগ প্রকাশ করা, যাতে বিদ্যমান দুঃখজনক পরিস্থিতি নিরসনে সহায়ক সম্ভাব্য সকল পথ ও পদ্ধতি যাচাই করে দেখা হয়।

আমার পরামর্শ এই যে, পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত বিচার্য বিষয়ের অধিকার দিয়ে হাই কমিশনারের পক্ষ থেকে স্বল্প সংখ্যক প্রতিনিধিকে অকুস্থলে পাঠানো হোক। সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সরকারের সাথে ইউনাইটেড নেশন্‌স হাই কমিশনার ফর দ্য রিফিউজীজের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে যে, কোন এলাকায় এসব প্রতিনিধি কাজ করবেন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শরণার্থীদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে এই পরামর্শ দেয়া হল।

অন্য একটি নথি (নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে দেয়া উ থান্টের স্মারকলিপি)-তে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, যা এ ধরনের বিষয়ে মহাসচিবের এক্তিয়ারের অতিরিক্ত এবং প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতার আওতাভুক্ত। আমার মনে আছে যে, ২ ডিসেম্বর ১৯৬৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩২৯তম সভায় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে একটি বিবৃতি অনুমোদন করেন যে, "জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের বিরোধী বিষয়াবলি এবং তাঁদের জানামতে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে উদ্ভূত অশান্ত পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাঁর — মহাসচিবের —পদাধিকার ও কার্যক্রমকে তাঁরা সম্মান করেন।"

এই স্মারকলিপি নিরাপত্তা পরিষদের কোনো দাপ্তরিক নথি নয়, বরং এই অঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থিতি যে আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে, সে ব্যাপারে আমার গভীর উদ্বেগ নথিভুক্ত করা এবং এই গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়াই এর লক্ষ্য।

সূত্র: *পাকিস্তান হরাইজোন*, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠা ১২৭–৩০।

পরিশিষ্ট ১৭

৯ অগাস্ট ১৯৭১-এ ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি

পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে,

বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার আরো অগ্রগতি এশিয়া ও সারা বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক জাতীয় কল্যাণ নিশ্চিত করে, এই বিশ্বাসে,

বিশ্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তা সুসংহত করা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস হ্রাস ও উপনিবেশবাদের অবশিষ্টাংশ নির্মূল করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে,

স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতিতে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সমুন্নত রেখে,

বর্তমান বিশ্বে বিরোধ নয়, বরং সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যাবলির সমাধান করা যেতে পারে, এ ব্যাপারে প্রত্যয়ী হয়ে,

জাতিসংঘের সনদ (United Nations Charter)-এর লক্ষ্য ও নীতিমালা মেনে চলার ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা পুনরায় ব্যক্ত করে,

এক পক্ষে ভারত প্রজাতন্ত্র (Republic of India) এবং অপর পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন (Union of Soviet Socialist Republics),

বর্তমান চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যে কারণে নিম্নবর্ণিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছে:

ভারত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে: সর্দার শরণ সিং, পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে: মি. এ এ গ্রোমিকো (A A Gromyko), পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী।

যাঁরা উপযুক্ত আকারে যথার্থ ক্রম অনুযায়ী তাঁদের নিজ নিজ অভিজ্ঞান উপস্থাপন করেছেন, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলিতে একমত হয়েছেন:

(ধারা ১)

চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় নির্দিষ্ট বিধিসম্মতভাবে ঘোষণা করছে যে, দুই দেশ ও তাদের জনগণের মধ্যে স্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্ব বিদ্যমান থাকবে। প্রত্যেক পক্ষ অপরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে। চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় উল্লিখিত নীতিমালা এবং সাম্য ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে গঠিত পরস্পরের সাথে বিদ্যমান আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সৎ প্রতিবেশীসুলভ ও ব্যাপক সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ককে আরো সংহত করবে।

(ধারা ২)

তাদের দেশসমূহের জনগণের স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করার সদিচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় কার্যকর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে এশিয়া ও সারা বিশ্বে শান্তিরক্ষা ও সুসংহত করা এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে পারমাণবিক ও প্রচলিত অস্ত্রসহ সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ কার্যকর করার লক্ষ্যে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

(ধারা ৩)

জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত জাতি ও জনগোষ্ঠীর সমতার মহিমান্বিত আদর্শের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় সব ধরনের উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের প্রতি নিন্দা জানাচ্ছে এবং এসবের চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ দূরীকরণের সংগ্রামে তাদের প্রতিজ্ঞার কথা পুনর্ব্যক্ত করছে।

উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সমর্থনে অন্যান্য রাষ্ট্রকেও চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

(ধারা ৪)

সব দেশের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিকামী নীতির প্রতি ভারত প্রজাতন্ত্র শ্রদ্ধাশীল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বিশ্বজনীন শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই নীতিমালায় সন্নিবেশিত আছে, তা পুনর্ব্যক্ত করছে।

(ধারা ৫)

এসব লক্ষ্য অর্জন করতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বিশ্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গভীরভাবে আগ্রহী চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় উভয়পক্ষের ওপরে প্রভাব পড়ে —এমন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলিতে দুই সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কূটনীতিকদের মধ্যে আলোচনা সভা, পারস্পরিক মত বিনিময়, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ও বিশেষ দূতদের ভ্রমণ এবং কূটনৈতিক মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

(ধারা ৬)

পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক সহযোগিতার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় এসব ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধাজনক ও সম্পূরক সহযোগিতা প্রসারিত করবে এবং সমতা, পারস্পরিক কল্যাণ ও সবচেয়ে সমর্থিত রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করে বর্তমান চুক্তি ও ২৬ নভেম্বর ১৯৭০-এ সম্পাদিত ইন্দো-সোভিয়েত বাণিজ্যচুক্তিতে বর্ণিত সন্নিহিত রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ ব্যবস্থাসাপেক্ষে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রসার ঘটাবে।

(ধারা ৭)

বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, পর্যটন ও ক্রীড়াক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় পরস্পরের সাথে পরস্পরের বন্ধন ও সম্পর্কের আরো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(ধারা ৮)

দুই দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে বিধিসম্মতভাবে ঘোষণা করছে যে, অপরপক্ষের বিপক্ষে পরিচালিত কোনো সামরিক অভিযানে তারা যোগ দেবে না বা অংশ নেবে না।

চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আগ্রাসন থেকে বিরত থাকা এবং অপর পক্ষের সামরিক ক্ষতির কারণ হয় —এমন কোনো কাজে এবং তার সীমানাভুক্ত এলাকার ব্যবহার রোধ করার অঙ্গীকার করছে।

(ধারা ৯)

চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নিয়োজিত কোনো তৃতীয় রাষ্ট্রকে কোনো ধরনের সহায়তা প্রদান থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করছে। যে কোনো পক্ষ এ ধরনের আক্রমণ বা আক্রমণের হুমকির মুখোমুখি হলে চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় এই হুমকি নিরসন এবং তাদের রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে যথাশীঘ্র দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসবে।

(ধারা ১০)

চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের কোনো পক্ষই অন্য কোনো রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসমূহের সাথে প্রকাশ্যে বা গোপনে এমন কোনো দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ হবে না, যা এই চুক্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে আরো ঘোষণা করছে যে, অন্য কোনো রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রসমূহের সাথে তারা এমন কোনো দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ হবে না, যা অপর পক্ষের সামরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

(ধারা ১১)

এই চুক্তি বিশ বছর মেয়াদের জন্য সম্পাদিত হল এবং কোনো পক্ষ মেয়াদ অতিক্রান্ত হবার বারো মাস আগে অপর পক্ষকে চুক্তি বাতিলের নোটিশ প্রদান না করলে পরবর্তীতে প্রতি পাঁচ বছরের জন্য আপনা-আপনিই এর মেয়াদ বেড়ে যাবে। এই চুক্তি অনুমোদনসাপেক্ষ এবং স্বাক্ষরের এক মাস পর মস্কোতে অনুমোদিত চুক্তিপত্রের হস্তান্তরের তারিখ থেকে এই চুক্তি বলবৎ হবে।

(ধারা ১২)

এই চুক্তির কোনো ধারা অথবা ধারাসমূহের ব্যাখ্যায় দ্বিমত দেখা দিলে তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার মানসিকতা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা হবে।

উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সমানভাবে বিশুদ্ধ ভাষ্যসহ হিন্দী, রুশ ও ইংরেজিতে প্রস্তুতকৃত বর্তমান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন এবং তাঁদের সিলমোহর দিয়েছেন।

নয়া দিল্লীতে এক হাজার নয় শত একাত্তর সালের অগাস্ট মাসের নবম দিবসে সম্পাদিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে
(স্বাক্ষর) এ এ গ্রোমিকো
পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী

ভারত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে
(স্বাক্ষর) সর্দার শরণ সিং
পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রী

সূত্র: *সারভাইভ্যাল*, বর্ষ ৮, অক্টোবর ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৩৫১~৩।

পরিশিষ্ট ১৮

৭ নভেম্বর ১৯৭১-এ প্রদত্ত মি. চি পেং-ফেইয়ের বিবৃতি

জুলফিকার আলি ভুট্টোর নেতৃত্বে একটি পাকিস্তানি প্রতিনিধিদল ৫ থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত চীন সফর করেছে। চীনের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী চি পেং-ফেই (Chi Peng-fei) সফররত পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সম্মানে ৭ নভেম্বর ১৯৭১-এ এক ভোজসভার আয়োজন করেন। স্বাগতভাষণে মি. চি পেং-ফেই বলেন, "আমাদের দু'দেশের মধ্যেকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা এবং দু'দেশের জনগণের বন্ধুত্ব অব্যাহতভাবে উন্নত ও সংহত হয়েছে।"

সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরোধিতা করার গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক পাকিস্তানের জনগণ সম্পর্কে তিনি তাঁর উচ্চ ধারণা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিদেশী আগ্রাসী, হস্তক্ষেপকারী ও অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি জনগণ অবিরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। পাকিস্তান সরকার তার পররাষ্ট্রনীতি পালন করেছে এবং এশিয়ায় শান্তিরক্ষা ও আফ্রো-এশীয় সংহতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।"

চি পেং-ফেই আরো বলেন, "পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভারত সরকার নগ্নভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে, বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক হুমকির জন্ম দিয়েছে। উপমহাদেশে বিদ্যমান বর্তমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে চীনের সরকার ও জনগণ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা বিশ্বাস করি, কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সেই দেশের জনগণেরই সমাধান করা উচিত। পূর্ব পাকিস্তান ইস্যু পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং তা পাকিস্তানের জনগণেরই নিষ্পত্তি করা উচিত। এক্ষেত্রে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং বিধ্বংসী কার্যকলাপ কোনোক্রমেই অনুমোদনযোগ্য নয়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচটি মূলনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল চীন সরকার কখনো অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না এবং কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করলে কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করে। এই নীতিতেই আমরা দৃঢ় ও অবিচল। আমরা বিশ্বাস করি, পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দেশপ্রেমিক এবং তারা তাদের দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় ঐক্য রক্ষা করে অভ্যন্তরীণ বিভেদ দূর করে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের বিশ্বাস, পাকিস্তানি জনগণ তাদের ঐক্য দৃঢ়তর করে যাবতীয় প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তাদের সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাবে। আমরা লক্ষ করেছি, উপমহাদেশে বিদ্যমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কতিপয় ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাবে পাকিস্তানের ওপরে চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে এবং তাদের সুদূরপ্রসারী স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করছে। চীনের সরকার ও জনগণ সবসময় বিশ্বাস করে এসেছে যে, কোনো বিরোধ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান হওয়া উচিত, চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নয়। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের দেয়া পাকিস্তান ও ভারতের সেনাবাহিনীকে সীমান্ত এলাকা থেকে

প্রত্যাহারের প্রস্তাব উপমহাদেশে বিদ্যমান উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করবে। গ্রহণযোগ্য এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো উচিত। আমাদের পাকিস্তানি বন্ধুরা আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে, পাকিস্তান কোনো বিদেশী শক্তির আগ্রাসনের শিকার হলে অতীতের মতো চীনের সরকার ও জনগণ তাদের বন্ধুপ্রতিম পাকিস্তানের সরকার ও জনগণকে তাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন দান করে যাবে।"

সূত্র: জে এ নায়েক, *ইন্ডিয়া, রাশিয়া, চায়না অ্যান্ড বাংলা দেশ*, (নয়া দিল্লী: এস চান্দ, ১৯৭২)

পরিশিষ্ট ১৯

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ প্রদত্ত ড. হেনরি কিসিঞ্জারের প্রেস ব্রিফিং এবং মি. কেনেথ কিটিং-এর মন্তব্য

(ক) ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ প্রেসিডেন্ট নিক্সন (Nixon)-এর জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা হেনরি এ কিসিঞ্জার (Henry A Kissinger)-এর দেয়া একটি সংবাদ সম্মেলনের জন্য তৈরি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্রিফিং থেকে উদ্ধৃত। অ্যারিজোনার সিনেটর ব্যারি গোল্ডওয়াটার (Barry Goldwater) হোয়াইট হাউস থেকে এর প্রতিলিপি সংগ্রহ করে ৯ ডিসেম্বর *দি কনগ্রেশনাল রেকর্ড (The Congressional Record)*-এ অন্তর্ভুক্ত করেন। ৫ জানুয়ারি সাধারণ্যে প্রচারিত এই নথিতে সে সময়ের নিক্সন প্রশাসনের মার্কিনী নীতিমালা ধরা পড়েছে।

উদ্বোধনী বিবৃতি

এ ধরনের কিছু মন্তব্য শোনা গেছে যে, আমাদের প্রশাসন ভারতবিরোধী। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ভারত একটি মহান রাষ্ট্র। এটা সবচেয়ে জনাকীর্ণ অবাধ রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই দেশ শাসিত হয়।

যুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন প্রশাসন ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ব্যাপারে এক ধরনের আন্তরিক তাগিদ অনুভব করে এসেছে এবং এই লক্ষ্যে মার্কিন জনগণ এ পর্যন্ত ১০ বিলিয়ন ডলার দান করেছে।

ফলে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আমরা যখন ভারতের সাথে কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করছি, তা আমরা করছি অত্যন্ত দুঃখ ও হতাশার সাথে।

আমরা যেমনটি দেখেছি, ২৫ মার্চ থেকে বিদ্যমান পরিস্থিতি আমি একটু বর্ণনা করতে চাই। ২৫ মার্চ নিঃসন্দেহে সেই দিন, যেদিন থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এই কার্যকলাপ, যা বর্তমান দুঃখজনক পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কখনো সমর্থন করেনি এবং যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই স্বীকার করে এসেছে যে, পরিণামে এই ঘটনা ভারতের ওপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। আমরা আরো স্বীকার করেছি যে, ভারতে শরণার্থীদের অব্যাহত প্রবাহ সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রান্তবর্তী একটি দেশে সাম্প্রদায়িক বৈপরীত্যের ঝুঁকির জন্ম দিয়েছে। আমরা জানি যে, উন্নয়নকামী একটি দেশের রুগ্ন অর্থনীতির ওপরে এটা ইতোমধ্যেই একটা চাপ সৃষ্টি করেছে।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র একই সাথে দুটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে: প্রথমত, মানুষের দুর্দশা লাঘব ও শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন; এবং দ্বিতীয়ত, শরণার্থী সমস্যার উদ্ভব যেখান থেকে হয়েছে, সেই সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান।

মার্চ ১৯৭১-এ সংঘটিত ঘটনাবলি যুক্তরাষ্ট্র বিস্মৃত হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে মার্চ ১৯৭১-এর পরে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে উন্নয়ন খাতে কোনো ঋণ বরাদ্দ করেনি।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক রসদপত্র পাঠানোর কথা চারপাশে বেশ জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, এ বছরের মার্চ মাসের শেষদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনাবলির পর যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো নতুন লাইসেন্স মুলতবি রেখেছে। কোনো মার্কিন ডিপো অথবা মার্কিন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো ডিপো থেকে যে কোনো ধরনের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছে। পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছে, সেসব যাচ্ছে পুরনো লাইসেন্সের মাধ্যমে বাণিজ্যিক চ্যানেল দিয়ে। এগুলো মূলত খুচরো যন্ত্রাংশ — কোনো মারণাস্ত্র বা সম্পূর্ণভাবে তৈরি অস্ত্র নয়।

এ বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে গেলে বলা যায় যে, এ বছরের মার্চের শেষভাগ অথবা এপ্রিলের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনাবলির অব্যবহিত পর যুক্তরাষ্ট্র ৩৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যমানের অস্ত্রশস্ত্রের চালান বাতিল করেছে এবং ৫ মিলিয়ন ডলারের চেয়েও কম মূল্যমানের সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। সেখানেও পাইপলাইনে যে অংশ অবশিষ্ট আছে, সেটা বাতিল করা হয়েছে।

এটা সত্যি যে, যুক্তরাষ্ট্র তার দৃষ্টিভঙ্গির বর্তমান বিবর্তন প্রসঙ্গে কোনো ঘোষণা দেয়নি। কারণ, সমস্যার একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির মাধ্যমে শরণার্থী প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র দিল্লী ও ইসলামাবাদ — উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রভাব খাটাতে চেয়েছিল।

একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছিলাম এবং আমি যদি কোনো দ্বিমতের কথা বলি, তাহলে সেটা ভারত সরকার ও আমাদের মধ্যেকার। সেটা এ রকম:

ভারত সরকারের সাথে বিভিন্ন সময়ে আমরা কথা বলেছি ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে সেক্রেটারি অভ্ স্টেট আঠারোবার দেখা করেছেন; অগাস্টের শেষভাগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে তাঁর সাথে আমি সাতবার সাক্ষাৎ করেছি। আমরা সকলেই বলেছি যে, রাজনৈতিক বিবর্তনের অনিবার্য পরিণতি পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্ত্বশাসন এবং আমরাও এটারই পক্ষে। কিন্তু পার্থক্য হল এই যে, ভারত সরকার এত দ্রুত এটার সমাধান চাইছিল যে, সেটা আর রাজনৈতিক বিবর্তন না থেকে তার পরিবর্তে রাজনৈতিক অচলাবস্থায় রূপান্তরিত হত।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখানে এলে তাঁকে আমরা সীমান্ত থেকে পাকিস্তানের একপাক্ষিকভাবে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব সম্পর্কে বলেছি। তাঁর দিক থেকে কোনো সাড়া মেলেনি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখানে থাকাকালীন তাঁকে আমরা বলেছি যে, আমরা পাকিস্তান ও কারারুদ্ধ মুজিবুরের মনোনীত আওয়ামী লীগ সদস্যদের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারি। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ভারতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাঁকে আমরা বলেছি যে, আমরা এমন কি পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি নিখুঁত রাজনৈতিক সময়কাঠামো নির্ধারণের জন্যও আলোচনায় বসতে প্রস্তুত আছি।

আমরা যখন বলি যে, কোনো ধরনের সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন নেই, তখন আমরা এটা বলি না যে, ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আমরা কখনো বলি না যে, ভারতের সমস্যার প্রতি আমাদের কোনো সহানুভূতি নেই অথবা ভারতকে আমরা গুরুত্ব দিই না।

এই দেশ, যে ভারতের সাথে অনেক দিক থেকে ভালবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে আছে, নিদারুণ দুঃখের সাথে শুধু এই বাস্তবতাটুকুই মেনে নিতে পারে যে, গৃহীত সামরিক

পদক্ষেপের পেছনে, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তেমন জোরালো কোনো কারণ ছিল না। এখন আমরা জাতিসংঘে যদি এই মত প্রকাশ করি, যা আমরা কখনো করি না, কারণ উপমহাদেশ ইস্যুতে আমরা নির্দিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে অবিচল থাকতে চাই অথবা আমরা হয়ত বিশ্বের একটি মহান রাষ্ট্রের সাথে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাই; কিন্তু যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি — কথায় যেমন বলে — রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নয়, বরং সংখ্যাধিক্য — ধরা যাক, আক্রমণকারীর আছে ৫০০ মিলিয়ন — সামরিক আক্রমণের অধিকার নির্ধারণ করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই সংখ্যার দিক থেকে শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা এমন এক পরিস্থিতির শিকার হব, যেখানে ভবিষ্যতে আমরা আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য দেখব এবং প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে বড় যে স্বপ্ন শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা, তা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে; শুধু মার্কিনী জনসাধারণই নয়, বরং ক্ষতিগ্রস্ত হবে সারা বিশ্বের শান্তিকামী জনগণ।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্র. এই প্রথম আধা-সরকারি ব্যাখ্যায় আমেরিকা কেন ভারতকে অভিযুক্ত করার অবস্থান গ্রহণ করেছে, এবং আপনি কেনই বা এতদিন পরে এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন? সারা বিশ্বের ধারণা যে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আগ্রাসী হিসেবে দেখছে অর্থাৎ ভারতবিরোধী। অথচ এখানে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আসলে তা নয়। এই কথাটা এত দেরিতে জানাচ্ছেন কেন?

উ. দীর্ঘদিন আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে যে, বিষয়টি বল প্রয়োগের মতো নগ্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে, এবং সামরিক অভিযানের পর প্রথম দুই সপ্তাহ আমরা ডিপার্টমেন্ট অভ্ স্টেটের উদ্যোগে ব্যক্তি পর্যায়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিস্থিতি শান্ত করার লক্ষ্যে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করছিলাম।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা দুই দফা আবেদন জানিয়েছি। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছেও আমরা আবেদন জানিয়েছি।

গত শুক্রবারে পরিস্থিতি সর্বাত্মক যুদ্ধে রূপ নিয়েছে এবং বিষয়টি জনগণকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এখন আমি অবশ্যই, আপনি যেভাবে বললেন, ভারতবিরোধী হিসেবে আমাদের চরিত্রচিত্রণের ব্যাপারটি মেনে নিতে পারি না।

প্র. আমি বলেছি, গত শুক্রবারে স্টেট ডিপার্টমেন্টের দেয়া প্রথম প্রেক্ষাপট ব্রিফিঙের কারণে সারা বিশ্বের জনগণ যুক্তরাষ্ট্রকে যে ভারতবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সে সম্পর্কে।

উ. এই সঙ্কটে আমাদের সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিরোধিতা করা হয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করি না যে, সামরিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। আমরা বিশ্বাস করি, পূর্ববঙ্গে একটি দুঃখজনক ঘটনা হিসেবে যেটা শুরু হয়েছে, এখন সেটা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করে সেই বিচ্ছিন্ন অংশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেবার চেষ্টায় পরিণতি পেয়েছে।

কাজেই, গত শনিবারে যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছিল, আজকের বক্তব্যে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তার কোনো অসামঞ্জস্য নেই। আজকে যা বলা হল, তা প্রেক্ষাপটের

বিশ্লেষণমাত্র, যা শনিবারের আলোচনাকে টেনে এনেছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিষয়টি উপস্থাপন করলেই বোধ হয় ভাল হত।

সূত্র: *নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন*, পারী সংস্করণ, ৬ জানুয়ারি ১৯৭১।

(খ) সেক্রেটারি অভ্ স্টেট উইলিয়াম পি রজার্স (William P Rogers)-এর কাছে ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাঠানো ভারতে নিয়োজিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কিটিং (Kenneth B Keating)-এর গোপন তারবার্তার সামান্য ভিন্ন রূপ: *দি নিউ ইয়র্ক টাইম্স (The New York Times)*-এর কাছে কলামিস্ট জ্যাক অ্যান্ডারসন (Jack Anderson)-এর দেয়া:

মি. কিটিং বলেছেন যে, সকালের অয়্যারলেসে প্রাপ্ত ফাইল রিপোর্টিং 'হোয়াইট হাউস অফিশিয়াল্স'-এ বিদ্যমান বিরোধ ও তার নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার ব্যাখ্যা-সম্পর্কিত ইন্টারন্যাশনাল প্রেস সার্ভিস [ইউ.এস.আই.এ.]-এর প্রতিবেদকের লেখা পড়ার ব্যাপারে তিনি বেশ আগ্রহী ছিলেন। প্রশাসনের বর্তমান অবস্থান জনগণকে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করলেও এটা বলতে তিনি বাধ্য হলেন যে, এই বিবৃতির কোনো কোনো অংশ বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর গত আট মাসের অভিজ্ঞতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিশেষত, পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ১৫৫ মিলিয়ন ডলারের ত্রাণ কার্যক্রম সম্পর্কে আই পি এস কৈফিয়ত দিয়েছে যে, এটা করা হয়েছিল 'ভারত সরকারের সুনির্দিষ্ট অনুরোধের প্রেক্ষিতে'। তাঁর মনে আছে এবং ২৫ মে নয়া দিল্লীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ সিংয়ের সাথে তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে তিনি জানিয়েছিলেন যে, সমস্যার কোনো ধরনের রাজনৈতিক সমাধানের আগে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ কার্যক্রমের ব্যাপারে ভারতের অনীহা আছে। কারণ, এ ধরনের পদক্ষেপ ইয়াহিয়াকে তার দায় থেকে মুক্তি দেবে [জেনারেল মোহাম্মদ আগা ইয়াহিয়া খান তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট]।

শরণার্থীদের জন্য সাধারণ ক্ষমার প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে এই বিবৃতি ৫ সেপ্টেম্বরে দেয়া ইয়াহিয়ার ঘোষণার যথার্থতা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, এই ক্ষমা তাদের জন্য যাদের বিরুদ্ধে 'ফৌজদারি আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই'। পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত কিটিংয়ের কাছে এটা সাধারণ আমলাতান্ত্রিক সাবধানবাণীর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু বলে মনে হয়েছে।

এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, সেক্রেটারি [মি. রজার্স] ও ড. কিসিঞ্জার — দুজনেই রাষ্ট্রদূত ঝা [লক্ষ্মী কান্ত ঝা (Lakshmi Kant Jha), যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োজিত ভারতের রাষ্ট্রদূত]-কে বলেছিলেন যে, ওয়াশিংটন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসনের পক্ষে। মি. কিটিং বলেন, সমস্যা সমাধানের উপায় আমাদের হাতে নেই, এই মর্মে বারংবার দেয়া আমাদের বিবৃতি এবং আলোচনা হলে তার ফলাফল স্বাধীনতা না হলেও স্বায়ত্ত্বশাসন হবে, আমাদের এই ধারণার ব্যাপারে তিনি অবহিত ছিলেন। কিন্তু স্বায়ত্ত্বশাসনের পক্ষে মত দিয়ে কোনো বিবৃতি দানের কথা তিনি জানেন না বলে জানালেন।

বিবৃতি অনুযায়ী, ডিপার্টমেন্ট থেকে ঝাকে ১৯ নভেম্বর এটাও জানানো হয় যে, "পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সময়কাঠামো প্রস্তুত করার জন্য

ওয়াশিংটন ও ইসলামাবাদ [পাকিস্তানের রাজধানী] আলোচনায় বসতে প্রস্তুত।" রাষ্ট্রদূত কিটিং বলেন যে, এই আলোচনা প্রসঙ্গে একমাত্র যে নথিটি [২১ নভেম্বরে তাঁর কাছে পাঠানো ডিপার্টমেন্টের একটি বার্তা] তাঁর কাছে আছে, সেখানে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো কিছুর উল্লেখ নেই।

ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপক প্রচেষ্টা, দিল্লী ও ইসলামাবাদ থেকে পাওয়া রিপোর্ট এবং ওয়াশিংটনের সাথে তাঁর নিজস্ব আলোচনার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদূত কিটিং বলেন, এই বক্তব্যটি তাঁর বোধগম্য হয়নি যে, "সমাসন্ন সামরিক অভিযান সম্পর্কে ওয়াশিংটনকে সামান্যতম ধারণাও দেয়া হয়নি।" উদাহরণের জন্য ১২ নভেম্বর প্রকাশিত ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ইন্টেলিজেন্স বুলেটিন নাম্বার ২১৯-৭১ দ্রষ্টব্য, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধ 'অত্যাসন্ন'।

পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে মুজিবুরের সাথে তাঁর অ্যাটর্নির মাধ্যমে যোগাযোগ করার লক্ষ্যে অনুমতি দিয়েছে বলে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, সেটা অতিকথন বলে মনে হয়। কারণ ইসলামাবাদ ১১৭৬০ [পাকিস্তানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস থেকে পাঠানো বার্তা] অনুযায়ী, ২৯ নভেম্বর ইয়াহিয়া রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড [জোসেফ ফারল্যান্ড (Joseph Farland), পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত]-কে ফারল্যান্ড-ব্রোহীর সম্ভাব্য আলোচনা ছাড়া আর কোনো বিষয়েই কথা বলেননি, যে আলোচনায় বিচারের সর্বশেষ অবস্থা ও ধরন সম্পর্কে ব্রোহীর কাছ থেকে ফারল্যান্ড একটা সামগ্রিক ধারণা পেতে পারেন। মি. কিটিং বলেন যে, ব্রোহীর মাধ্যমে মুজিবুরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ইয়াহিয়ার কোনো অনুমোদন সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই। [মি. ব্রোহী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসন আন্দোলনের নেতা এবং পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তানে কারারুদ্ধ ও বিচারাধীন শেখ মুজিবের ডিফেন্স অ্যাটর্নি।] যা হোক, অত্যন্ত অসন্তোষের সাথে যে কথাটা আমরা সকলেই জানি, তা হল, ২ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে বলেন যে, ব্রোহী তাঁর সাথে দেখা করতে অনিচ্ছুক।

পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘকে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে বলে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, সেটা সত্য গোপন করে। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের মতো যথেষ্ট জনবল জাতিসংঘের কখনো ছিল না বা তারা সেটা করতেও চায়নি। এটা সব সময়ই পাকিস্তান সরকারের হাতে ছিল।

মি. কিটিং বলেন যে, তাঁর মন্তব্য এই দুঃখজনক ঘটনাবলির সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য অতি গোপনীয় নয়, এটা জেনেই তিনি তাঁর ভাষ্য জানিয়েছেন। তিনি যা কিছু জানেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশ্বাস করেন না যে, বিবৃতিতে প্রদত্ত এসব বক্তব্য আমাদের অবস্থান সুসংহত করেছে অথবা, আরো গুরুত্বপূর্ণ, আমেরিকার বিশ্বাসযোগ্যতা সমৃদ্ধ করেছে।

কিটিং

সূত্র: *নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন*, পারী সংস্করণ, ৬ জানুয়ারি ১৯৭২

পরিশিষ্ট ২০

৪, ৬ ও ৮ আগস্ট ১৯৭১-এ অনুষ্ঠিত
ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সভার কার্যবিবরণী
এবং
*জানুয়ারি ১৯৭২-এ প্রকাশিত মি. জ্যাক অ্যান্ডারসনের রচনা**
ব্যবহৃত পরিভাষার জন্য অধ্যায়ের শেষভাগ দ্রষ্টব্য

(ক) ৩ ডিসেম্বরের সভা আহ্বান

গোপন ও স্পর্শকাতর
অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভ্ ডিফেন্স
ওয়াশিংটন, ডি সি ২০৩০১

ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স: ১-২৯৬৪৩/৭১

নথিভুক্তির জন্য স্মারক

বিষয়

ভারত/পাকিস্তান ইস্যুর ওপরে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ (Washington Special Action Group)-এর আলোচনা

অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সহকারী — হেনরি এ কিসিঞ্জার
আন্ডার সেক্রেটারি অভ্ স্টেট — জন এন আরউইন (John N Irwin)
ডেপুটি সেক্রেটারি অভ্ ডিফেন্স — ডেভিড প্যাকার্ড (David Packard)
ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি — রিচার্ড এম হেম্‌স (Richard M Helms)
ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (এ আই ডি)— মরিস জে উইলিয়াম্‌স (Maurice J Williams)
চেয়ারম্যান, জয়েন্ট চিফ্‌স অভ্ স্টাফ — অ্যাডমিরাল টমাস এইচ মুরার (Thomas H Moorer)
অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভ্ স্টেট (এন ই ই এ আর) —জোসেফ জে সিসকো (Joseph J Sisco)
অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভ্ ডিফেন্স (আই এস এ) — জি ওয়ারেন নাটার (G Warren Nutter)
অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভ্ স্টেট (আই ও) স্যামুয়েল ডি পালমা (Samuel De Palma)
প্রিন্সিপ্যাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভ্ ডিফেন্স (আই এস এ) — আরমিস্টেড আই সেলডেন জুনিয়র (Armistead I Selden Jr)
অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (এ আই ডি/এন ই এস এ) ডোনাল্ড জি ম্যাকডোনাল্ড (Donald G MacDonald)

সময় ও স্থান

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, সকাল ১১:০০, সিচুয়েশন রুম, হোয়াইট হাউস

সার-সংক্ষেপ

পশ্চিম অংশে বিদ্যমান পরিস্থিতির ওপরে প্রাপ্ত পরস্পরবিরোধী রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়। সিআইএ ভারতের দখলকৃত পূর্ব পাকিস্তানি এলাকা মানচিত্রে দেখাতে সম্মত হয়। প্রেসিডেন্ট ৯৯ মিলিয়ন ডলারের সাথে সংশ্লিষ্ট আর কোনো অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র (letter of credit) ইস্যু এবং ৭২ মিলিয়ন ডলারের পিএল ৪৮০ (PL 480) ঋণ কার্যকর করার লক্ষ্যে নতুন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বানের উদ্দেশ্যে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আজ বিকেলে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের সাথে আনুষঙ্গিক আলোচনার পরিকল্পনা করা হয়। কিসিঞ্জার ১৯৫৯-এর মার্চে পাকিস্তানের সাথে সম্পাদিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির গোপন/বিশেষ ব্যাখ্যা চান।

কিসিঞ্জার: প্রতি আধা ঘণ্টায় একবার করে প্রেসিডেন্টের অসন্তোষের মুখোমুখি আমি হচ্ছি যে, ভারতের সাথে আমরা যথেষ্ট কঠোর হচ্ছি না। আবার তিনি আমাকে ডেকেছেন। কিছুতেই তাঁকে বিশ্বাস করাতে পারছি না যে, তাঁর ইচ্ছাই আমরা পালন করছি। তিনি পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করতে চান। অথচ তাঁর ধারণা, আমরা করছি ঠিক তার উল্টোটা।

হেম্‌স: পশ্চিম অংশের সংশ্লিষ্ট রিপোর্টগুলো দুই পক্ষেই পরস্পরবিরোধী। অমৃতসর, পাঠানকোট ও শ্রীনগর এয়ারপোর্ট আক্রমণের ক্ষেত্রেই শুধু রিপোর্টগুলোর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পাকিস্তানিরা বলছে, সারা সীমান্ত জুড়ে ভারতীয়রা আক্রমণ করছে, অথচ ভারতীয় অফিশিয়ালরা এটা অস্বীকার করছেন। পূর্ব অংশে সংঘর্ষ ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে এবং পাকিস্তানিরা দাবি করছে যে, বর্তমানে সেখানে মাত্র সাত জায়গায় লড়াই চলছে।

কিসিঞ্জার: ভারতীয়রা কি পাকিস্তানি ভূখণ্ড দখল করে নিচ্ছে?

হেম্‌স: হ্যাঁ, ছোট ছোট এলাকা তো অবশ্যই।

সিসকো: ভারত কোন এলাকাগুলো দখল করেছে, সেটা যদি মানচিত্রে চিহ্নিত করে দেখাতে পারতেন, তাহলে বোধ হয় ভাল হত। পশ্চিমে কি মনে হয় পুরোদমে লড়াই চলছে?

মুরার: বর্তমান পরিস্থিতি বেশ বিভ্রান্তিকর। কারণ, পাকিস্তানিরা ভারতীয়দের এমন তিনটি এয়ারফিল্ড আক্রমণ করেছে, যেগুলোতে স্বল্প সংখ্যক ভারতীয় বিমান থাকে।

হেম্‌স: আজ ১:৩০ মিনিটে মিসেস গান্ধী তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারেন।

মুরার: পাকিস্তানের আক্রমণের ব্যাপারটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটা হয়েছে শেষ বিকেলের দিকে যার কোনো মানে হয় না। এ সম্পর্কে আমাদের হাতে এখন পর্যন্ত যথেষ্ট তথ্য নেই।

কিসিঞ্জার: এমন হতে পারে যে, ভারতীয়রা প্রথমে আক্রমণ করে এবং পাকিস্তানিরা সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগে যতটা সম্ভব জবাব দিয়েছে।

মুরার: এমন অবশ্য ঘটতেই পারে।

কিসিঞ্জার: প্রেসিডেন্ট চান না, ৯৯ মিলিয়ন ডলার ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আর কোনো অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র খোলা হোক। ৭২ মিলিয়ন ডলারের পিএল ৪৮০ ঋণ কার্যক্রমও তিনি স্থগিত রাখতে চান।

উইলিয়াম্স: এটা করলেই চতুর্দিকে এ নিয়ে কথা উঠবে। প্রেসিডেন্ট কি এদিকটা ভেবে দেখেছেন?

কিসিঞ্জার: এটা তাঁর নির্দেশ। তার পরেও এ বিষয়ে আমি কথা বলে দেখব। প্রশ্ন করলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা আমাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখছি এবং উপমহাদেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নতুন অর্থসাহায্য বরাদ্দ স্থগিত করা হয়েছে। এর পরের বিষয়টি হল জাতিসংঘ।

আরউইন: পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে সেক্রেটারি আজ ডেকে পাঠাচ্ছেন। জাতিসংঘকে সংশ্লিষ্ট করার জন্য বিষয়টি তিনি জাতিসংঘে উত্থাপন করতে চান।

কিসিঞ্জার: প্রেসিডেন্ট এটার পক্ষে। তিনি চান, যত দ্রুত সম্ভব নতুন এই বিশাল কাজের কিছু নিশ্চয়তা পাওয়া যাক। এ ধরনের পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ যদি কোনো কার্যকর ভূমিকা না রাখতে পারে, তাহলে বলতেই হবে যে, এর কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেছে এবং মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে জাতিসংঘের দেয়া নিশ্চয়তা অর্থহীন হয়ে গেছে।

সিসকো: রাষ্ট্রদূতের সাথে আজ বিকেলের আলোচনাশেষে আপনার জন্য আমাদের একটি সুপারিশ থাকবে। রাষ্ট্রদূত যাতে দেশে তার করার মতো পর্যাপ্ত সময় পান, সেটা মাথায় রেখেই আমরা নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বানের পরিকল্পনা করতে পারি।

কিসিঞ্জার: আমাদেরকে অ্যাকশন নিতে হবে। যত দোষ, প্রেসিডেন্ট আমাকে দিচ্ছেন, অথচ আপনারা দিব্যি আছেন।

সিসকো: সেটাই দস্তুর !

কিসিঞ্জার: বুশের জন্য তৈরি আগের খসড়াটিও নিরপেক্ষ।

সিসকো: আমি আবার বলছি, পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাতের পর সেক্রেটারি আপনাকে রিপোর্ট করবেন। আমরা বুশের বক্তৃতার খসড়া আপডেট করব।

কিসিঞ্জার: আমরা বলতে পারি যে, আমরা রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের মূল কাজ হবে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করা।

সিসকো: কোসিগিন বা মিসেস গান্ধী —কারো তরফ থেকেই আমরা কোনো সাড়া পাইনি।

উইলিয়াম্স: আমাদের অর্থনৈতিক পদক্ষেপ কি পাকিস্তানের জন্যও প্রযোজ্য হবে?

কিসিঞ্জার: প্রেসিডেন্টের সাথে আমার আলোচনা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। এ বিষয়ে পাকিস্তান সম্পর্কে এখনো তিনি কিছু বলেননি।

সিসকো: আমরা ভারতের সাথে কাজ করলে বলতে পারি যে, পাকিস্তান পরিস্থিতি আমরা 'পর্যবেক্ষণ' করছি।

কিসিঞ্জার: ভারতের প্রতিটি পদক্ষেপ পাকিস্তানের পদক্ষেপের সাথে মেলাতে গেলে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে থাকা আমাদের জন্য কঠিন হবে। আগামী সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমি প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত পেতে পারি।

প্যাকার্ড: সামনে সাপ্তাহিক ছুটি বলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে আমাদের এখনই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে রাখা উচিত।

কিসিঞ্জার: সকালে আমাদের একটি ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ প্রয়োজন হবে। চুক্তিতে আমাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে ভাবতে হবে। একটি চিঠি অথবা স্মারকলিপির কথা আমার মনে পড়ছে, যেখানে বিদ্যমান একটি চুক্তির এরকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ভারতের দিকে আমাদের একটু বিশেষ পক্ষপাত আছে। জানুয়ারি ১৯৬২-তে আমি যখন পাকিস্তান ভ্রমণ করি, তখন একটি গোপন দলিল অথবা মৌখিক বোঝাপড়ার কথা আমাকে ব্রিফ করা হয়, যেটা সিয়াটো (SEATO)-র প্রেক্ষাপটের অতিরিক্ত একটি অনুষঙ্গ। সম্ভবত সেটা ছিল প্রেসিডেন্টের একটি চিঠি। মার্চ ১৯৫৯-র দ্বিপাক্ষিক চুক্তির একটি বিশেষ অনুবাদ।

প্রস্তুতকারী:
/-অনুস্বাক্ষর
জেম্‌স এম নয়েস (James M Noyes)
ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ফর নিয়ার ইস্টার্ন আফ্রিকান অ্যান্ড সাউথ এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স
অনুমোদিত:
(স্বাক্ষর অস্পষ্ট)
জি ওয়ারেন নাটার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভ্ ডিফেন্স ফর ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স-এর পক্ষে
বিতরণ: Secdef, Depsecdef, CJCS, ASD (ISA), PDSAD (ISA), DASD: NEASA & PPNSCA, Dep Dir: NSCC & PPNSCA, CSD files, R & C files, NESA.

সূত্র: *নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন*, পারী সংস্করণ, ৬ জানুয়ারি ১৯৭২

(খ) ৪ ডিসেম্বরের সভার কার্যবিবরণী

বর্ণনাসম্বলিত স্মারক
দ্য জয়েন্ট চিফ্‌স অফ্ স্টাফ
ওয়াশিংটন, ডি সি ২০৩০১

গোপন ও স্পর্শকাতর স্মারক: চিফ অফ্ স্টাফ, ইউ.এস. আর্মি
চিফ অফ্ স্টাফ, ইউ.এস. এয়ার ফোর্স
চিফ অফ্ নেভাল অপারেশন্‌স
কম্যান্ডান্ট অভ্ দ্য মেরিন কোর

বিষয়

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ওপরে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সভা; ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

১. আপনার অবগতির জন্য উল্লিখিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি স্মারক সংযোজিত হল।

২. এন.এস.সি. সিস্টেমের তথ্যাদির স্পর্শকাতরতা ও স্মারকের বিস্তারিত ধরনের কারণে এটা সম্পর্কে জানার অধিকার সীমিত রাখার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, জে সি এস-এর পক্ষে:
এ কে নোইজেন (A K Knoizen)
ক্যাপ্টেন, ইউএস নেভী
এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট টু দ্য চেয়ারম্যান, জয়েন্ট চিফ্স অফ্ স্টাফ

সভার প্রতিবেদন
গোপন ও স্পর্শকাতর
দ্য জয়েন্ট চিফ্স অফ্ স্টাফ
ওয়াশিংটন, ডিসি ২০৩০১

৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

নথির জন্য স্মারক

বিষয়

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ওপরে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সভা; ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।

১. এনএসসি ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ শনিবার ১১০০টায় হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে ভারত-পাকিস্তান পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য সভায় মিলিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. কিসিঞ্জার।

২. উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক. প্রধান:
ড. হেনরি কিসিঞ্জার
ড. জন হান্না (John Hannah), এআইডি
মি. রিচার্ড হেম্স, সিআইএ
ড. জি ওয়ারেন নাটার, ডিফেন্স
অ্যাডমিরাল এলমো জুমওয়াল্ট (Elmo Zumwalt), জেসিএস
মি. ক্রিস্টোফার ফন হোলেন (Christopher Van Hollen), স্টেট

খ. অন্যান্য:

মি. জেম্‌স নয়েস, ডিফেন্স
মি. আরমিস্টেড সেলডেন, ডিফেন্স
রিয়ার অ্যাডমিরাল রবার্ট ওয়েল্যান্ডার (Robert Welander), ওজেসিএস
ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড কে (Howard Kay), ওজেসিএস
মি. হ্যারল্ড সন্ডার্স (Harold Saunders), এনএসসি
কর্নেল রিচার্ড কেনেডি (Richard Kennedy), এনএসসি
মি. স্যামুয়েল হোসকানসন (Samuel Hoskanson), এনএসসি
মি. ডোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড, এআইডি
মি. মরিস উইলিয়াম্‌স, এআইডি
মি. জন ওয়ালার (John Waller), সিআইএ
মি. ব্রুস ল্যানিজেন (Bruce Lanigen), স্টেট
মি. ডেভিড শ্নেলডার (David Schnelder), স্টেট

৩. সারসংক্ষেপ: অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বান করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুরোধ জানাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, রাষ্ট্রদূত বুশের বক্তৃতার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হবে। মার্কিন সরকার-জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতিত্ব থাকবে পাকিস্তানের দিকে। পাকিস্তানের প্রতি বর্তমানে বহাল অর্থনৈতিক সাহায্য বাতিল করা হবে না। জয়েন্ট চিফ্‌স অফ্ স্টাফের ওপরে বাড়তি কোনো চাহিদা আরোপ করা হয়নি।

৪. মি. হেম্‌স এই বলে সভা আরম্ভ করেন যে, ভারতীয়রা এখন পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক আক্রমণ চালাচ্ছে এবং আজ সকালে তারা সবদিক দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেছে। ভারতীয়রা পাকিস্তানের আটটি এয়ারফিল্ড আক্রমণ করলেও পশ্চিমে এখন পর্যন্ত কোনো স্থল-আক্রমণের লক্ষণ দেখা যায়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেন, "ভারতের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ আমাদের সামনে।" মিসেস গান্ধী এই বলে এর জবাব দিয়েছেন যে, পাকিস্তানের এই যুদ্ধ ঘোষণা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ভারত অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করবে না বলে ঠিক করেছে। ভারতীয়রা করাচীর একটি প্রধান তেল-ডিপোতে আক্রমণ চালিয়েছে এবং এর ফলে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড তৈরি হয়েছে। এটা বেশ কিছুদিন ধরে জ্বলবে এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্য একটি সহজ টার্গেট হয়ে রইবে। মি. হেম্‌স বলেন যে, সোভিয়েতদের ধারণা, বর্তমান সমস্যার প্রেক্ষাপটে বৃহৎ শক্তিবর্গের মুখোমুখি হবার আশঙ্কা নেই।

৫. ড. কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন, ভারত সর্বাত্মক আক্রমণ ঘোষণা করলে আমাদের জাতিসংঘ প্রতিবেদনে অবশ্যই তার প্রতিফলন ঘটা উচিত।

৬. মি. হেম্‌স বলেন, আমরা জানি না কোন পক্ষ এই অ্যাকশন শুরু করেছে। গতকাল পাকিস্তান কেন ছোট ছোট চারটি এয়ারফিল্ড আক্রমণ করল, সেটাও আমরা জানি না।

৭. ড. কিসিঞ্জার অনুরোধ করেন যাতে সোমবারের মধ্যে সিআইএ একটি প্রতিবেদন তৈরি করে, যাতে থাকবে, কে কার উদ্দেশ্যে কী করেছে এবং কখন?

৮. মি. ডি পালমা পরামর্শ দেন যে, আমরা যদি জাতিসংঘে আমাদের আলোচনায় ভারতের ঘোষণার প্রসঙ্গ টানি, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ইয়াহিয়ার মন্তব্যের কথাও উল্লেখ করতে হবে।

৯. ড. কিসিঞ্জার উত্তর দেন যে, তাঁকে প্রেসিডেন্ট বিশেষ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশিত পংক্তিসহ বিবৃতিটি হয় আমলাদের কেউ তৈরি করবেন, না হয় সেটা হোয়াইট হাউসে তৈরি করা হবে।

১০. মি. হেম্‌স ভারতের সরকারি ভাষ্যে উল্লেখকৃত 'সামগ্রিক (no holds barred)' শব্দটির উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, পাকিস্তানি পক্ষ থেকেও একই ধরনের কথা বলা হয়েছে।

১১. ভারতীয়রা যে সর্বাত্মক যুদ্ধের মধ্যে আছে, সেটা তাদের কোনো কার্যকলাপ থেকে বোঝা যাচ্ছে কি না, সেটা ড. কিসিঞ্জার জানতে চান।

১২. মি. হেম্‌স বলেন যে, শব্দটি ছিল 'সামগ্রিক'।

১৩. পাকিস্তানিরা কী বলেছে, ড. কিসিঞ্জার তা জানতে চান। মি. হেম্‌স জানান যে, তাদের ব্যবহৃত পরিভাষা ছিল 'ভারতের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ'। ড. কিসিঞ্জার বলেন যে, এর মধ্যে আপত্তিকর কিছু নেই। তারা (পাকিস্তানিরা) নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে, বরং এটা বললে তেমন অসংযত বা আক্রমণাত্মক শোনা যায় না।

১৪. এরপরে ড. কিসিঞ্জার জানতে চান জাতিসংঘে কী হচ্ছে। এর উত্তরে মি. ডি পালমা জানান যে, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, জাপান ও সম্ভবত ফ্রান্স নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বান করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সভা আহ্বানের জন্য আমাদের অনুরোধসম্বলিত চিঠিতে জাপান কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব খুঁজে পেয়েছে। জাপানিরা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পক্ষে। আমরা অবশ্য জাপানিদের কাছে আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিনি।

১৫. ড. কিসিঞ্জার চিঠিটি দেখতে চান এবং অনুরোধ করেন, জাতিসংঘে আমাদের প্রস্তাবনা যাতে এই চিঠির মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়। মি. ডি পালমা এতে সম্মতিসূচক সাড়া দেন।

১৬. ড. কিসিঞ্জার বলেন যে, এই চিঠিতে কোনো জোরালো বক্তব্য নেই বলে জাতিসংঘে আমাদের অবস্থান অবশ্যই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে হবে।

১৭. রাষ্ট্রদূত বুশ যদি বুঝতে পারেন কী তাঁর বলা উচিত, তাহলে অন্য কে কী মনে করল, সেটার পরোয়া তিনি করেন না।

১৮. ড. কিসিঞ্জার বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যাঁরা দূরে রাখছেন, তাঁরা প্রেসিডেন্টের ক্রোধ উৎপাদন করছেন। প্রেসিডেন্ট এক 'প্রহেলিকা'র মধ্যে আছেন যে, তাঁর নির্দেশে সবকিছু হচ্ছে; এই নয় যে, যা কিছু ঘটছে, সেটা শুধু তাঁকে জানানো হচ্ছে।

১৯. মি. ডি পালমা জানান যে, নিরাপত্তা পরিষদের সভা (সেদিন) বিকেলে না সন্ধ্যায় আহ্বান করা হবে, সেটা তিনি জানেন না। সভার প্রাথমিক বিবৃতিগুলো অবশ্য ভারতীয় ও পাকিস্তানিরাই দেবে। তিনি পরামর্শ দেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ দুটোর বিবৃতি দেয়া হয়ে যাবার পর প্রথমদিকেই রাষ্ট্রদূত বুশের বক্তব্য দেয়া উচিত। শুরুর দিকে আমাদের অবস্থান জানিয়ে দিলে সেটার প্রভাব বেশি হবে বলে তিনি মনে করেন। ড. কিসিঞ্জার এতে কোনো আপত্তি করেননি।

২০. মি. ডি পালমা জানতে চান, আমাদের বিবৃতি প্রকাশ করার আগেই অন্যদেরকে আমরা আমাদের পক্ষে আনতে চাই কি না। এতে অবশ্য সময় লাগবে। ড. কিসিঞ্জার পরামর্শ দেন যে, এভাবে এগুনোর চেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্রয়োজনে এককভাবে, আমাদের বিবৃতি দিয়ে ফেলা উচিত। ড. কিসিঞ্জারের মত অনুসারে, একমাত্র যে পথটি বর্তমানে আমাদের সামনে খোলা আছে তা হল, আমাদের বৃহত্তর স্ট্র্যাটেজির প্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থান পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা। সকলেই জানেন, কীভাবে এটা ঘটবে এবং সকলেই এটাও জানেন যে, ভারত শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেবে। কাজেই, আমাদের অবস্থান ব্যক্ত করে আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত আলোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে। আমাদের প্রয়োজন একটি সিদ্ধান্ত, যা রাষ্ট্রদূত বুশ তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে ঘোষণা করবেন। অন্যেরা যদি আমাদের সাথে আসতে চায়, চমৎকার। কিন্তু যে কোনো অবস্থায় রাষ্ট্রদূত বুশের বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে হবে।

২১. ড. কিসিঞ্জার বলেন, আমাদের অবস্থান ব্যক্ত করাটা জরুরি। জাতিসংঘে আমাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রবল, কারণ সোভিয়েতরা ভেটো প্রয়োগ করতে পারে। এই যুদ্ধ বন্ধ করতে জাতিসংঘেরও খুব সামান্যই করণীয় আছে। তিনি যা বলেন, তার সারসংক্ষেপ হল এই যে, তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রদূত বুশের বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের সিদ্ধান্ত জাতিসংঘে প্রকাশ করা হবে এবং সেটা অবিলম্বে। পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সাধারণ আলোচনায় আমরা অবশ্যই অংশ নেব, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট পরামর্শ, যেমন: মুজিবের মুক্তি, আমরা দেব না।

২২. ড. কিসিঞ্জার জানতে চান, পরিষদে ভারতীয়রা কাজ শুরু করতে কতটা দেরি করতে পারে। মি. ডি পালমা বলেন, তারা দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে পারে অথবা আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। মি. ফন হোলেন বলেন যে, তারা যতটা সম্ভব প্রলম্বিত করবে, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে তারা মনোসংযোগ করতে সমর্থ হবে। মি. ডি পালমা বলেন, তারা বড়জোর তিন-চারদিন দ্বিধাগ্রস্ত থাকবে যা, মি. হেম্‌সের মতে, তাদের পূর্ব পাকিস্তান দখল করার পক্ষে যথেষ্ট সময়। মি. ডি পালমা বলেন, আমরা সব সময়ই ভোটের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারি। ড. কিসিঞ্জার পুনরাবৃত্তি করেন যে, জাতিসংঘ থেকে লাভজনক কিছু পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

২৩. মি. ডি পালমা মত প্রকাশ করেন যে, কোনো না কোনো পক্ষের ভেটো দেবার আশঙ্কা খুবই প্রবল।

২৪. অর্থনৈতিক সাহায্য প্রসঙ্গে ড. কিসিঞ্জার উল্লেখ করেন যে, শুধু ভারতকে অর্থ সাহায্য দেয়া বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অবশ্য বলেন যে, ঘোষণাটি তিনি প্রেসিডেন্টের সামনে পাঠ করতে চান, যাতে প্রেসিডেন্ট অনুধাবন করতে পারেন তিনি কীসের মধ্যে জড়াচ্ছেন। এই মি. উইলিয়াম্‌স জানতে চান, পাকিস্তানকে কেন অর্থ সাহায্য দেয়া বন্ধ হবে না, বিবৃতিতে সেটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে কি না। ড. কিসিঞ্জার বলেন যে, শুধু প্রেক্ষাপটের জন্য তথ্য সংরক্ষণ করা হবে।

২৫. কৃষি বিভাগের বরাত দিয়ে মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোজ্য তেলের দাম কমছে। কাজেই ভারতের সাথে পি এল ৪৮০ বাতিল করলে স্থানীয় বাজারে এর প্রভাব পড়তে পারে। এরপরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, গমের পরিবর্তে তেল পাঠানো যায় কি না। ড. কিসিঞ্জার বলেন, সোমবারে বাজারের লেনদেনের প্রেক্ষাপটে এর জবাব দিতে হবে।

২৬. এর পরে ড. কিসিঞ্জার সামরিক পরিস্থিতির ওপরে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী চান। অ্যাডমিরাল জুমওয়াল্ট বলেন, তাঁর ধারণা ছিল যে, রসদ ও সরবরাহ-সঙ্কট প্রবল হওয়ার আগে পর্যন্ত পাকিস্তানিরা এক অথবা দুই সপ্তাহ নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সমর্থ হবে। তিনি আশা করেছিলেন, সোভিয়েতরা ভারতে তাদের অবস্থান পাকা করবে এবং বিসাগ (Visag)-এ অবস্থিত নৌঘাঁটি স্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য চাপ প্রয়োগ করবে। তাঁর ধারণা ছিল যে, সোভিয়েতরা ভারতের সাথে তাদের বর্তমান সম্পর্কের ভিত্তিতে সামরিক সুবিধা অর্জনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইবে।

২৭. ড. কিসিঞ্জার ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী সভা সোমবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে আহ্বান করা হবে।

/স্বাক্ষর/ এইচ এন কে
এইচ এন কে (H N Kay)
ক্যাপ্টেন, ইউএসএন
সাউথ এশিয়া/এমএপি ব্রাঞ্চ, জে৫
এক্সটেনশন ৭২৪০০

সূত্র: প্রাগুক্ত

(গ) ৬ ডিসেম্বরের সভার ওপরে স্মারক

দ্য জয়েন্ট চিফ্‌স অফ্ স্টাফ
ওয়াশিংটন, ডি সি ২০৩০১

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

নথিভুক্তির জন্য স্মারক

বিষয়

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ওপরে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সভা; ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

১. এনএসসি ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সভা ৬ ডিসেম্বর সোমবার সকাল ১১:০০টায় হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ড. কিসিঞ্জার।

২. উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক. প্রধান:

ড. হেনরি কিসিঞ্জার
মি. ডেভিড প্যাকার্ড, ডিফেন্স
রাষ্ট্রদূত ইউ আলেক্সিস জনসন (U Alexis Johnson), স্টেট
জেনারেল উইলিয়াম ওয়েস্টারমোরল্যান্ড (William Westermoreland), জেসিএস
মি. রিচার্ড হেম্‌স, সিআইএ
মি. ডোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড, এআইডি

খ. অন্যান্য

মি. ক্রিস্টোফার ফন হোলেন, স্টেট
মি. স্যামুয়েল ডি পালমা, স্টেট
মি. ব্রুস ল্যানিজেন, স্টেট
মি. জোসেফ সিসকো, স্টেট
মি. আরমিস্টেড সেলডেন, ডিফেন্স
মি. জেমস নয়েস, ডিফেন্স
মি. জন ওয়ালার, সিআইএ
মি. স্যামুয়েল হোসকানসন, এনএসসি
কর্নেল রবার্ট কেনেডি (Robert Kennedy), এনএসসি
মি. হ্যারল্ড সন্ডার্স, এনএসসি
রিয়ার অ্যাডমিরাল রবার্ট ওয়েল্যানডার, ওজেসিএস

ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড কে. ওজেসিএস
মি. মরিস উইলয়াম্‌স. এআইডি

৩. সারসংক্ষেপ: একটি জাতি হিসেবে বাংলাদেশ যে প্রবল সমস্যার মুখোমুখি, আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল সেটাই। ড. কিসিঞ্জার বলেন যে, সমস্যাটি এখন নিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। পাকিস্তানকে সম্ভাব্য সামরিক সাহায্য দানের বিষয়টিও যাচাই করে দেখা দরকার। কিন্তু সেটা হবে ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে। পূর্ব অঞ্চল থেকে পশ্চিমে ভারতীয় সৈন্য পুনর্বহালের ব্যাপারটি এবং ভারতের সাম্প্রতিক সমুদ্র অবরোধের আইনগত দিকটিও খতিয়ে দেখা হয়।

৪. বর্তমান পরিস্থিতির বর্ণনার মাধ্যমে মি. হেম্‌স সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পাকিস্তান ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পূর্ব অঞ্চলে প্রবল লড়াই চলছে, যদিও পশ্চিম অঞ্চলে ভারত মূলত রক্ষণাত্মক ভূমিকা পালন করছে। মি. হেম্‌সের ধারণা, আগামী দশ দিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের জন্য ভারত চাপ সৃষ্টি করবে। পূর্ব অঞ্চলের আকাশে বর্তমানে ভারতের আধিপত্য সুস্পষ্ট। পাকিস্তানি স্থলবাহিনী ও রসদঘাঁটির ওপরে তারা আনুমানিক এক শত বিমান দিয়ে আক্রমণ চালাতে পারে। ভারতীয় স্থলবাহিনী অবশ্য এখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আক্রমণের মূলধারা প্রধানত এই প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ঢাকার এয়ারফিল্ড ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। যশোর এলাকায় ভারতীরা সামান্যই সফলতা পেলেও জামালপুর দখল করেছে বলে তারা দাবি করছে। পশ্চিমে ভারতীয় আক্রমণ অবশ্যই শুধু বিমান আক্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। স্থলে পাকিস্তানিরা আক্রমণাত্মক ভূমিকাই পালন করছে এবং পাঞ্জাবে তারা বিমান আক্রমণ চালিয়েছে। সামগ্রিক চিত্র হল এই যে, পাকিস্তানিরা ৬২টা ভারতীয় বিমান আর ভারতীয়রা ৪৭টা পাকিস্তানি বিমান ধ্বংস করেছে বলে দাবি করছে। নৌযুদ্ধে ভারতীয়রা একটি পাকিস্তানি ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়ে দিয়েছে এবং আরেকটি ডুবিয়ে দিয়েছে বলে দাবি করছে। ভারতীয়রা পূর্ব-সমুদ্রে একটি পাকিস্তানি সাবমেরিনও ডুবিয়ে দিয়েছে বলে দাবি করছে। ভারতের প্রতি মস্কোর সমর্থন উত্তরোত্তর জোরালো ও সোচ্চার হচ্ছে এবং লড়াই বন্ধ করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের কোনো উদ্যোগকে সমর্থন দেয় নি।

৫. ড. কিসিঞ্জার এরপরে সামরিক প্রসঙ্গে জানতে চান, পাকিস্তানিরা কতদিন পূর্ব অঞ্চলের দখল বজায় রাখতে সমর্থ হবে। জেনারেল ওয়েস্টারমোরল্যান্ড জানান যে, বড়জোর তিন সপ্তাহ।

৬. ড. কিসিঞ্জার প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেয়া হবে। মি. হেম্‌স বলেন যে, বাস্তব সত্য এটাই যে, বাংলাদেশ বর্তমানে ভারতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

৭. রাষ্ট্রদূত জনসন পরামর্শ দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে জামিন হিসেবে রাখা হতে পারে। জেনারেল ওয়েস্টারমোরল্যান্ড এতে গুরুত্ব আরোপ

করে বলেন যে, ভারতীয় নৌবাহিনীর তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নেয়ার কোনো উপায় নেই।

৮ ড. কিসিঞ্জার বলেন যে, নাটকে এর পরের অঙ্কে থাকবে বাংলাদেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করার ব্যাপার।

৯. পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত পনেরো লক্ষ উর্দু ভাষাভাষী (বিহারী) প্রসঙ্গে মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, তাদেরকেও জামিন হিসেবে রাখা হতে পারে।

১০. ড. কিসিঞ্জার জানতে চান যে, এদের ওপরে ইতোমধ্যেই কোনো ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে কি না। মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, তিনি নিশ্চিত যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটবে। ড. কিসিঞ্জার জানতে চান যে, এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু আছে কি না। জবাবে মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, মানবতা সংরক্ষণকারী আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড সম্ভবত তাদের পক্ষে দাঁড়াবে। ড. কিসিঞ্জার জানতে চান যে, এদের দুর্দশার দিকে এখনই আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্ট আমাদের করা উচিত কি না। মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, এদের অধিকাংশই বসবাস করে রেলওয়ে জংশনগুলোর আশেপাশে এবং শহর এলাকায়। ফলে জাতিসংঘের মাধ্যমে তাদের পক্ষে কিছু ত্রাণ কার্যক্রম ভালভাবেই শুরু করা যেতে পারে। ব্যাপক রক্তপাত ঠেকাতে হলে খুব দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে বলে ড. কিসিঞ্জার পরামর্শ দেন। মি. সিসকো বলেন, যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ এ ব্যাপারে এখনই কিছু করতে পারবে না, সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে বিশ্ব জনমতের দৃষ্টি এদিকে ফেরানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

১১. পাকিস্তানে আটকে পড়া ৩০০,০০০ বাঙালি প্রসঙ্গে মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, তারা খুব বিপন্ন অবস্থার মধ্যে আছে। মি. সিসকো এই প্রেক্ষাপটে বলেন যে, সাধারণ পরিষদে এটা খুব আকর্ষণীয় একটি মানবিক ইস্যু হতে পারে এবং আমরা পরিষদের কর্মতৎপরতার ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি। মি. ম্যাকডোনাল্ড ১৯৫৪ সালে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে জনসাধারণের ব্যাপক স্থানান্তরের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

১২. সামরিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মি. উইলিয়াম্‌স বলেন, তাঁর ধারণা, ভারতীয় আক্রমণের প্রাথমিক লক্ষ্য হবে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব অঞ্চলের পাকিস্তানিদের রসদ ও সরবরাহের বাকি অংশটুকুও নষ্ট করে ফেলা। তিনি বলেন যে, ভারতীয়রা পাকিস্তানিদের নিয়মিত বাহিনী ধ্বংস করার লক্ষ্যে মূল আক্রমণ রচনা করবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস, পূর্ব অঞ্চলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাটাই বর্তমান পরিস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যেহেতু এটা বিংশ শতাব্দীর এক ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে।

১৩. জেনারেল ওয়েস্টারমোরল্যান্ড বলেন, মুক্তিবাহিনীর সাথে কাজ করার জন্য ভারতীয়দের সম্ভবত তিন অথবা চার ডিভিশন সৈন্য প্রয়োজন। বাকি অংশ পশ্চিমে অবস্থিত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার কাজে লাগানো হতে পারে।

১৪. মি. সিসকো মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয়রা যেহেতু বন্ধুভাবাপন্ন জনসাধারণের সাথে কাজ করবে, পাকিস্তানিদের নিরস্ত্রীকরণের অব্যবহিত পরেই তারা তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করবে। কাজেই, তারা যত দ্রুত সম্ভব, মুক্তিবাহিনীর হাতে সামরিক দায়িত্ব

অর্পণ করবে। ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ধরন ও সময় পশ্চিমের পরিস্থিতির ওপরে ব্যাপকভাবে নির্ভর করবে বলে তিনি মনে করেন।

১৫. এক প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল ওয়েস্টারমোরল্যান্ড জানান, পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে সৈন্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সীমাবদ্ধতা আছে এবং এর ফলে একটি ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন স্থানান্তর করতে তাদের কমপক্ষে এক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন।

১৬. মি. সিসকো বলেন, বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্যরা দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। মি. ফন হোলেন মন্তব্য করেন যে, পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার দুই অথবা তিন সপ্তাহের মধ্যেও ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার শুরু না হলে বাঙালিরা তাদেরকে 'দখলদার হিন্দু বাহিনী' হিসেবে দেখতে শুরু করবে।

১৭. মি. ফন হোলেন ভারত থেকে শরণার্থী প্রত্যাবাসন সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। বাংলাদেশ যেহেতু মূলত মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চল, ভারত থেকে এক কোটি শরণার্থী, যাদের অধিকাংশই হিন্দু, ফিরে এলে নতুন এক জটিল সমস্যার জন্ম হবে।

১৮. জেনারেল ওয়েস্টারমোরল্যান্ড জানান যে, পশ্চিমে ভারতীয়দের অবস্থা বেশ সুবিধাজনক। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বিন্যাস প্রসঙ্গে তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন এবং বলেন যে, ভারতীয়রা তুলনামূলকভাবে ভাল অবস্থায় আছে। তিনি বলেন যে, তাঁর ধারণা ছিল, পাকিস্তানিরা কাশ্মির ও পাঞ্জাবের দিকে তাদের মূল আক্রমণ পরিচালনা করবে। অন্যদিকে ভারতীয়দের লক্ষ্য হবে হায়দারাবাদ, যাতে করাচী পর্যন্ত পাকিস্তানিদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি চিন্তাও করেননি যে, ভারতীয়রা একেবারে করাচী পর্যন্ত যাবার পরিকল্পনা নিয়েছে। তিনি আরো ইঙ্গিত দেন যে, ভারতীয়দের বর্তমান গতিবিধির উদ্দেশ্য পাকিস্তানিদেরকে কাশ্মির এলাকা থেকে তাদের রিজার্ভ সরিয়ে আনতে বাধ্য করা।

১৯. মি. প্যাকার্ড পাকিস্তানিদের জ্বালানি তেল ও লুব্রিক্যান্ট সরবরাহের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান। মি. হেম্‌স জানান যে, বর্তমান পরিস্থিতি খুবই খারাপ। স্থলপথে, যেমন ইরান থেকে, পরিবহনের জন্য যোগাযোগ-ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল।

২০. মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, দক্ষিণদিকে ভারতের আক্রমণের কারণ নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। সীমান্তে ভারতীয়রা যেহেতু লড়াই করতে চায় না, তাদেরকে কাশ্মিরে অবশ্যই জায়গা দিতে হবে। পার্লামেন্টে সমালোচনা ঠেকানোর জন্য সম্ভবত মিসেস গান্ধী দক্ষিণাঞ্চলে কিছু পাকিস্তানি ভূখণ্ড দখল করতে চান।

২১. এরপরে ড. কিসিঞ্জার জাতিসংঘের উদ্যোগ প্রসঙ্গে জানতে চান। মি. সিসকো জানান যে, বর্তমানে আমরা রাষ্ট্রদূত বুশের সাথে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছি। নিরাপত্তা পরিষদের দুটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েতরা ভেটো প্রয়োগ করেছে। অবশ্য 'শান্তির জন্য হুমকি'-সংক্রান্ত ধারার আওতায় নিউ ইয়র্কে সাধারণ পরিষদের একটি জরুরি সভা আহ্বানের ভিত্তি প্রস্তুত করাই আছে। পরিষদে এই সমস্যা সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে উত্থাপিত হতে পারে।

২২. ড. কিসিঞ্জার ও মি. সিসকো ঐকমত্যে পৌঁছান যে, সাধারণ পরিষদের সভায় গৃহীত যে কোনো প্রস্তাবনায় মূল দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে: যুদ্ধবিরতি ও সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার। ড. কিসিঞ্জার বলেন যে, জাতিসংঘে আমাদের প্রতিনিধি বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় এখন পর্যন্ত খুবই ভাল কাজ করেছেন। মি. সিসকো বলেন যে, যদিও এই সমস্যা ভোটে অনুমোদনসাপেক্ষে সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত হবে বলে মনে হয়, তারপরেও আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সেখানে ১৩৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব আছে। ফলে, যে কোনো ধরনের প্রতিকূলতা মোকাবেলার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। মি. ডি পালমা বলেন যে, পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপিত হবার পর ঘটনা নতুন এক মোড় নেবে; যেমন: ভারতীয়রা আর সমস্যার রাজনৈতিক নিষ্পত্তির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে না। তখন এটা আর কোনো সমস্যা বলে স্বীকৃত হবে না।

২৩. মি. ডি পালমা বলেন যে, আজ ৩:৩০ মিনিটে কাউন্সিলের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা এবং আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি কাউন্সিল যাতে এই সমস্যাটি পরিষদে স্থানান্তর করে। কারণ, নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হচ্ছে না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

২৪. ড. কিসিঞ্জার প্রশ্ন করেন, আজকের মধ্যেই সাধারণ পরিষদে এই ইস্যুটি গৃহীত হবে, এমন আশা আমরা করতে পারি কি না। জবাবে মি. ডি পালমা বলেন, ঘটনা সম্ভবত এ রকমই ঘটবে।

২৫. ড. কিসিঞ্জার বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে আমরা যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম, এখানেও আমরা সেই একই বক্তৃতা দেবো। কিন্তু শরণার্থী ও আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভাষা সম্পর্কে তাঁর কিছু বলার আছে।

২৬. ড. কিসিঞ্জার নির্দেশ করেন যে, ভারতীয়দের প্রতি এখন থেকে আমরা নিস্পৃহ আচরণ করব। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে খুব বেশি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।

২৭. এরপরে বর্তমান ভারতীয় নৌ 'অবরোধ'-এর আইনগত অবস্থান সম্পর্কে ড. কিসিঞ্জার প্রশ্ন করেন। মি. সিসকো বলেন যে, মার্কিন জাহাজকে বাধা দানের দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই আমরা প্রতিবাদ করেছি। অবশ্য যুদ্ধরত অবস্থায় নিজেদের শক্তি প্রদর্শনে নিয়োজিত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মতো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনো পর্যন্ত আপাতদৃষ্টিতে করা হয়নি। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত এটা অঘোষিত যুদ্ধ। স্টেট অবশ্য এ বিষয়ের বৈধতা নিয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন যে, তাঁর জানামতে ভারতীয় অবরোধ আরোপের কোনো বৈধ ভিত্তি নেই।

২৮. ড. কিসিঞ্জার বলেন যে, একটি খসড়া প্রতিবাদ রচনা করতে হবে। আমরা যদি এটা বৈধ নয় বলে মনে করি, তাহলে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানাব। মি. সিসকো বলেন যে, এ ধরনের একটি প্রতিবাদপত্র তিনি তৈরি করবেন।

২৯. ড. কিসিঞ্জার এরপরে জানতে চান যে, পাকিস্তানকে সামরিক সরঞ্জাম হস্তান্তরের জন্য জর্ডান বা সৌদি আরবকে মনোনয়ন দানের অধিকার আমাদের আছে কি না। মি. ফন হোলেন জবাবে বলেন যে, অস্ত্র হস্তান্তরের জন্য কোনো তৃতীয় দেশকে অনুমতি দানের

অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। কারণ, আমরা যখন এটা তাদেরকে দিয়েছি, তখন আমরাই তাদেরকে প্রকৃত প্রাপকের, যেমন পাকিস্তানের, কাছে সরাসরি বিক্রি অনুমোদন করিনি। গত জানুয়ারিতে আমরা পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি না করার একটি বিধানিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মি. সিসকো বলেন যে, এ ধরনের হস্তান্তর করতে হলে জর্ডানের নিজের অবস্থান দুর্বল হয়ে যাবে বলে এই দায় থেকে আমরা তাদেরকে নিষ্কৃতি দিলে তারা কৃতজ্ঞই থাকবে। মি. সিসকো আরো বলেন যে, পাকিস্তানিদের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে বলে তাদের দিক থেকে অব্যাহতভাবে জরুরি সাহায্যের আবেদন আসবে।

৩০. ড. কিসিঞ্জার বলেন যে, প্রেসিডেন্ট হয়ত এ ধরনের অনুরোধ রাখতে পারেন। বিষয়টি যদিও প্রেসিডেন্টের গোচরে আনা হয়নি, তবুও প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই চাইবেন না যে, পাকিস্তানিরা পরাজিত হোক। মি. প্যাকার্ড তখন বলেন যে, এ বিষয়ে কী করা যায়, তা আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত। মি. সিসকো এটি সমর্থন করেন; কিন্তু বলেন যে, এটা করতে হবে গোপনে। আগামীকাল (৭ ডিসেম্বর)-এর মধ্যে ড. কিসিঞ্জার এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবনা চান।

৩১. মি. সিসকো বলেন, যে বিষয়ে আমাদের আগ্রহ আছে তা হল, কী কী রসদ ও সরঞ্জাম সহজলভ্য করা যায় এবং সেসব সরঞ্জাম সরবরাহের সম্ভাব্য উপায়। তিনি বলেন যে, ভারতীয়রা যাতে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'নিশ্চিহ্ন' করে না ফেলে, সেই লক্ষ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

৩২. সাহায্য দানের বিষয়টির দিকে ড. কিসিঞ্জার দৃষ্টি ফেরান এবং অনুরোধ করেন, যাতে এখন থেকে যেসব ঋণপত্র খোলা হবে, সেসব অপ্রত্যাহারযোগ্য না থাকে। মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, ভারতের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়, এ ধরনের যাবতীয় সাধারণ আর্থিক সাহায্য আমরা বাতিল করেছি, যা এই অঙ্ককে ১০ মিলিয়ন ডলারে নামিয়ে এনেছে। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানকে আমরা যে সাহায্য করেছি, সেটা ভারতের প্রতি বিদ্বেষবশত নয়। কারণ, ভারতীয়রা উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত সমস্ত অর্থসাহায্য যুদ্ধখাতে ব্যয় করছে। অথচ সাহায্যের বাকি অংশ পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিখাত ও মানবিক ত্রাণকার্যের জন্য পৃথক করে রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রায়োগিক, রাজনৈতিক ও আইনগত দিক থেকে প্রমাণ করা সম্ভব যে, ভারত ও পাকিস্তানকে দেয়া সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য আছে।

৩৩. আরো নিশ্চিত করার জন্য ড. কিসিঞ্জার বলেন যে, ভারতকে সাহায্য প্রদান বন্ধ প্রসঙ্গে আলোচনায় যা বন্ধ করা হয়েছে, তার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে — যা বহাল আছে তার ওপরে নয়।

৩৪. এরপর ড. কিসিঞ্জার সৈন্য অপসারণ প্রসঙ্গে জানতে চান। মি. সিসকো বলেন যে, ঢাকা থেকে সৈন্য অপসারণ বন্ধ করা হয়েছে।

৩৫ ড. কিসিঞ্জার পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান। মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, এটা নিয়ে এখন খুব বড় সমস্যার মুখোমুখি আমাদের হতে হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু পরবর্তী বসন্তের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হবারই আশঙ্কা বেশি। ড.

কিসিঞ্জার জানতে চান যে, বাংলাদেশে ত্রাণকার্যের জন্য আমাদের কাছে আবেদন জানানো হবে কি না। মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, মাসে ১৪০ টন খাদ্যসামগ্রী যদি আমরা চট্টগ্রামে পাঠাতে পারি, তাহলে সমস্যা খুব জটিল আকার ধারণ করবে না। কিন্তু এখন কিছুই যাচ্ছে না। তিনি আরো বলেন যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সব ধরনের সাহায্য প্রয়োজন হবে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত জনসন যোগ করেন যে, বাংলাদেশ একটি 'আন্তর্জাতিক ঝুড়ি'তে রূপান্তরিত হবে। মি. উইলিয়াম্‌স বলেন যে, শরণার্থী প্রত্যাবাসন, জনগণের স্থানান্তর এবং তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য ব্যাপক সাহায্যের প্রয়োজন হবে। ড. কিসিঞ্জার বলেন, এ বিষয়ে এখন থেকেই আমাদের পর্যবেক্ষণ শুরু করা উচিত।

৩৬. মি. উইলিয়াম্‌স বলেন, শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ভারত বরাবরই নগদ অর্থসাহায্য চেয়েছে। পরিবর্তে ভারত তাদের খাদ্য ও অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করবে। এর ফলে ভারত বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে। নগদ অর্থের পরিবর্তে আমরা সাহায্য হিসেবে দ্রব্যসামগ্রী দিতে পারি কি না, এ বিষয়ে আগামীকালের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। মানবিক সাহায্য আমরা বন্ধ করতে চাই না। আমরা নগদ অর্থের বদলে দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করতে চাই।

৩৭. এরপর সভা মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

/স্বাক্ষর/ এইচ এন কে
এইচ এন কে
ক্যাপ্টেন, ইউএসএন
সাউথ এশিয়া/এমএপি ব্রাঞ্চ, জে৫
এক্সটেশন ৭২৪০০

সূত্র: প্রাগুক্ত

(ঘ) ৮ ডিসেম্বরের সভার ওপরে স্মারক

গোপন ও স্পর্শকাতর
দ্য জয়েন্ট স্টাফ
দ্য জয়েন্ট চিফ্‌স অফ্ স্টাফ
ওয়াশিংটন, ডি সি ২০৩০১

৮ ডিসেম্বর ১৯৭১

নথিভুক্তির জন্য স্মারক

বিষয়

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ওপরে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সভা; ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

১. এনএসসি ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সভা ৮ ডিসেম্বর সোমবার ১১:০০টায় হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ড. কিসিঞ্জার।

২. অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ

ক. প্রধান: ড. হেনরি কিসিঞ্জার; মি. রিচার্ড হেম্‌স, সিআইএ; জেনারেল জন রায়ান (John Ryan), জেসিএস; মি. ডোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড, এআইডি; মি. ডেভিড প্যাকার্ড, ডিফেন্স; রাষ্ট্রদূত অ্যালেক্সিস জনসন, স্টেট।

খ. অন্যান্য: মি. মরিস উইলিয়াম্‌স, এআইডি; মি. জন ওয়াল্টার, সিআইএ; কর্নেল রিচার্ড কেনেডি, এনএসসি; মি. স্যামুয়েল হোসকানসন, এনএসসি; মি. হ্যারল্ড সন্ডার্স, এনএসসি; মি. আরমিস্টেড সেলডেন, ডিফেন্স; মি. জেমস নয়েস, ডিফেন্স; মি. ক্রিস্টোফার ফন হোলেন, স্টেট; মি. স্যামুয়েল ডি পালমা, স্টেট; মি. ব্রুস ল্যানিজেন, স্টেট; মি. ডেভিড শ্লাইডার, স্টেট; মি. জোসেফ সিসকো, স্টেট; রিয়ার অ্যাডমিরাল রবার্ট ওয়েল্যানডার, ওজেসিএস; ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড কে, ওজেসিএস।

৩. সারসংক্ষেপ: ড. কিসিঞ্জার মত প্রকাশ করেন যে, পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানি সেনা ও বিমানবাহিনী ধ্বংসের মাধ্যমে ভারত পাকিস্তানকে নির্বীর্য করার চেষ্টা করতে পারে। তিনি অনুরোধ করেন, পাকিস্তানকে সাহায্য করার জর্ডানি সম্ভাবনার বিষয়টি যাতে নাকচ না করে আপাতত স্থগিত রাখা হয়। কাশ্মিরে অবস্থিত পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর শক্তি নিরূপণ করতেও তিনি অনুরোধ করেন।

৪. বর্তমান পরিস্থিতির ওপরে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে মি. হেম্‌স সভার কাজ শুরু করেন। পূর্ব অঞ্চলে ভারতীয়রা কুমিল্লার প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে ফেলেছে। ঢাকা আর ভারতীয়দের মধ্যে এখন শুধু বড় নদীর বাধা অবশিষ্ট আছে। সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে ভারতীয়রা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। পূর্ব অঞ্চলে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানি যোগাযোগ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে। পশ্চিমে পাকিস্তানিরা সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকা পুন্‌ছ (Poonch) দখল করেছে বলে দাবি করছে। পাকিস্তানিরা অবশ্য যুদ্ধে তাদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে স্বীকার করেছে। সিন্দ/রাজস্থান (Sind/Rajsthan) অঞ্চলে ট্যাঙ্কযুদ্ধ শুরু হয়েছে। মিসেস গান্ধী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যুদ্ধবিরতির জন্য জাতিসংঘের আহ্বানে কর্ণপাত করার আগে আজাদ কাশ্মিরের দক্ষিণ সীমান্ত অঞ্চল নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসতে চান। জানা গেছে যে, সংঘাত বন্ধ করার আগে মিসেস গান্ধী পাকিস্তানি সেনা ও বিমানবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করবেন। এখন পর্যন্ত ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন নয় যে, পাকিস্তানিদের

সাথে সম্পর্ক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই কারণে স্বীকৃতি দানের বিষয়টি সোভিয়েতরা স্থগিত রেখেছে। অল্পদিনের মধ্যেই সোভিয়েতরা অবশ্য স্বীকৃতি দানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৫. পাকিস্তানিরা আর কতদিন পূর্ব পাকিস্তানে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারবে, সে ব্যাপারে মি. সিসকো প্রশ্ন করেন। জবাবে মি. হেম্‌স বলেন যে, বড়জোর ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা। প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে নদীগুলো অতিক্রম করতে ভারতীয়দের কতটা সময় ব্যয় হবে, তার ওপরে।

৬. পশ্চিমের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে জেনারেল রায়ান বলেন যে, ভারতীয়রা খুব বেশি চেষ্টা করছে বলে তাঁর মনে হয় না, বরং তারা অনেক বেশি মনোনিবেশ করছে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার কাজে।

৭. ড. কিসিঞ্জার জানতে চান যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম অংশে সৈন্য স্থানান্তর করতে ভারতীয়দের কতটা সময়ের প্রয়োজন। জেনারেল রায়ান বলেন, এতে বেশ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। কিন্তু বিমানবাহিত ব্রিগেডগুলো তাড়াতাড়িই স্থানান্তর করা সম্ভব, আনুমানিক পাঁচ অথবা ছয় দিনের মধ্যে।

৮ শরণার্থীদের সাহায্য সম্পর্কে ড. কিসিঞ্জার জানতে চান। মি. উইলিয়ামসের সাথে আলোচনার পর নির্ণয় করা হয় যে, প্রদত্ত মার্কিন সাহায্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ শরণার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়, বাদবাকি অংশ ভারতের অর্থনীতির সাথে মিশে যায়। এক কথায়, ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশেই সামগ্রিক ত্রাণ কার্যক্রম বর্তমানে স্থগিত আছে।

৯. এর পরে ড. কিসিঞ্জার গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, হোয়াইট হাউসের অনুমোদন ছাড়া ভারতকে যাতে আর কোনো বৈদেশিক মুদ্রা, পিএল-৪৮০ সামগ্রী অথবা উন্নয়ন ঋণ বরাদ্দ না করা হয়, সে ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন। মি. উইলিয়াম্‌স আশ্বস্ত করেন যে, কোনো কিছু ফসকে যাবার আশঙ্কা নেই।

১০. ড. কিসিঞ্জার জানতে চান, এর পরের প্যাঁচ কী হবে। মি. উইলিয়াম্‌স বলেন, এখন একমাত্র বিকল্প হল বর্তমানে চুক্তিবদ্ধ সাহায্যসামগ্রীর ব্যাপারে নতুন অবস্থান গ্রহণ করা। ব্যাপারটি অবশ্য খুবই জটিল আকার ধারণ করবে, কারণ এর সাথে অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট। মি. উইলিয়াম্‌স আরো বলেন, মার্কিনী ঠিকাদাররা ভারতে যেসব সামগ্রী পাঠাচ্ছে, আমাদেরকে সেসব দখল করতে হবে এবং এভাবে এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে সেসব ঠিকাদারের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১১. মি. প্যাকার্ড বলেন, এর সব কিছুই করা সম্ভব, কিন্তু সেইসাথে এটাও স্বীকার করেন যে, কাজটি অত্যন্ত কঠিন ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সমস্ত পণ্যসামগ্রীর তালিকা বের করতে হবে, এর পরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে এর মালিকানা গ্রহণ করতে হবে, সরবরাহকারীদের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে, সংরক্ষণাগার খুঁজে বের করতে হবে, ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও এটাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে সেটা করা সম্ভব। মি.

উইলিয়াম্‌স বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে সীমিত আকারে এ ধরনের ব্যবস্থা এর আগে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু দাবি নিষ্পত্তিতে শেষ পর্যন্ত কয়েক বছর লেগে যায়।

১২. ড. কিসিঞ্জার জানতে চান, ভারত পরবর্তী বছরের উন্নয়ন ঋণ কার্যক্রমের ব্যাপারে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। জবাবে মি. উইলিয়াম্‌স বলেন, বর্তমানে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা চলছে না।

১৩. ড. কিসিঞ্জার পরবর্তী বছরের [এআইডি] বাজেট সম্পর্কে জানতে চান। মি. উইলিয়াম্‌স বলেন, বাজেটে যা আছে, সেখানে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ড. কিসিঞ্জার বলেন, বর্তমান নির্দেশ হল এই যে, বাজেটে ভারতের জন্য কোনো এআইডি রাখা চলবে না। যে বাজেটে এআইডি ভারতের জন্য অর্থ বরাদ্দ রেখেছে, সেটা ফাঁস করা যাবে না। হোয়াইট হাউস এটা সরিয়ে ফেলবে।

১৪. ড. কিসিঞ্জার মত প্রকাশ করেন যে, ভারতীয়রা যদি পাকিস্তানিদের দিকে মনোযোগ দেয়, তাহলে আজাদ কাশ্মিরই হবে প্রধান ইস্যু। ভারতীরা যদি ধ্বংস করে ফেলে, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, ভারত পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের বিমান ও সশস্ত্রবাহিনীর ধ্বংস পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষাবিহীন করে ফেলবে এবং এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তান একটি পোষ্য রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এই আশঙ্কা থেকে কয়েকটি প্রশ্ন জন্ম নিচ্ছে। আমরা যখন একটি অবরোধে অংশ নিচ্ছি, সেই অবস্থায় আমরা কি ঘটনার সাথে মার্কিনী মিত্রবাহিনীর পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়া অনুমোদন করব? আমরা কি আমাদেরকে ভয় দেখাতে ভারতীয়দের অনুমোদন করব এই বিশ্বাসে যে, যদি মার্কিনী রসদ প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা দেয়া হবে না?

১৫. মি. সিসকো বলেন, ড. কিসিঞ্জার তখন যা বললেন, ঘটনা যদি সে রকম রূপ ধারণ করে, তাহলে তো পশ্চিম পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। ভারতীয়দের আদৌ এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না, সে ব্যাপারে মি. সিসকো অবশ্য সন্দেহ পোষণ করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিং রাষ্ট্রদূত কিটিংকে বলেছেন, পাকিস্তানি এলাকা দখল করা ভারতের উদ্দেশ্য নয়। মি. সিসকো বলেন, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কাশ্মির একটি বিতর্কিত এলাকা।

১৬. মি. হেম্‌স এর পরে বলেন, এর আগে তিনি বলতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, চীন প্রসঙ্গে শ্রীমতি গান্ধী আশা প্রকাশ করেন যে, পশ্চিমে কোনো চীনা হস্তক্ষেপ ঘটবে না। চীনারা লাদাখে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু করতে পারে বলে সোভিয়েতরা তাঁকে সতর্ক করেছিল বলে তিনি বলেন। কিন্তু এ ধরনের কিছু ঘটলে সেক্ষেত্রে সোভিয়েতরা উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। মি. হেম্‌স বলেন যে, বর্তমানে কোথাও কোনো চীনা সমাবেশ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অগ্রসর হয়ে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

১৭. এর পরে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদান সম্পর্কে ড. কিসিঞ্জার জানতে চান। পাকিস্তানকে এফ-১০৪ দেয়ার ব্যাপারে বাদশাহ্ হোসেনের আগ্রহের কথা উল্লেখ করে ড. কিসিঞ্জার প্রশ্ন করেন, এই বিষয়টি প্রেসিডেন্ট বিবেচনা করা পর্যন্ত

কীভাবে আমরা জর্ডানকে হাতে রাখতে পারি। ড. কিসিঞ্জার আরো জানতে চান যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ওপরে যে কোনো বড় ধরনের আক্রমণ হলে এই দেশ বিষয়টি যে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে, এটা ভারত ও গণমাধ্যমকে জানিয়ে দেয়া উচিত কি না।

১৮. মি. প্যাকার্ড ব্যাখ্যা করেন যে, মার্কিন সরকার যা করতে পারেনি, সেটা করার জন্য আমরা জর্ডানিদেরকে অধিকার দিতে পারি না। মার্কিন সরকার যদি পাকিস্তানকে ১০৪গুলো দিতে না পারে, সেক্ষেত্রে জর্ডানকেও এটা করার অধিকার আমাদের না দেয়াই উচিত। এমন যদি হত যে, তৃতীয় একটি দেশের কাছে এমন কোনো জিনিস আছে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নেই, তাহলে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু ১০৪ হস্তান্তরের জন্য জর্ডানকে আমরা অনুমোদন দিতে পারি না, যদি না আমরা দেখি যে, আমাদের কাছ থেকে সেগুলো কেনার মতো যোগ্যতা পাকিস্তানের আছে।

১৯. ড. কিসিঞ্জার বলেন, আমরা যদি পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ না করতাম, তাহলে এই সমস্যা তৈরি হত না। মি. প্যাকার্ড একমত পোষণ করেন।

২০. ড. কিসিঞ্জার বলেন, আমরা যখন পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করি, তখন আমরা বুঝতে পারিনি, বিপদটি আসলে কেমন।

২১. মি. প্যাকার্ড বলেন যে, পাকিস্তানকে জর্ডান এগুলো হস্তান্তর করলে সেসব প্রতিস্থাপিত করার বিষয়টি সম্ভবত বিবেচনা করা যেতে পারে। রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন, আমাদের আর কোনো সামরিক সহায়তা কার্যক্রম নেই।

২২. ড. কিসিঞ্জার বলেন, যে জিনিসটি আমাদেরকে দেখতে হতে পারে, তা হল এমন এক পরিস্থিতি যেখানে সোভিয়েত সাহায্যপুষ্ট একটি দেশ পাকিস্তানের অর্ধেককে নির্বীর্য করে রাখবে এবং বাকি অর্ধেককে ক্রীতদাসে পরিণত করবে। আমাদের পদক্ষেপ সম্পর্কে অন্যান্য রাষ্ট্র কী ভাববে, সেটা অবশ্যই আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে।

২৩. মি. হেম্‌স পাকিস্তানের সাথে আমাদের সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন — সেন্টো (Central Treaty Organization — CENTO) সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করেন। রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন যে, সেন্টোর প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের কাছে আমাদের কোনো আইনগত দায়বদ্ধতা নেই। ড. কিসিঞ্জার এতে একমত পোষণ করলেও উল্লেখ করেন যে, ১৯৬২ সালে ভারতের সাথে আমাদের আকাশ প্রতিরক্ষা-সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়েছিল, সেখানেও আমাদের কোনো আইনগত দায়বদ্ধতা নেই। বিশ্বের বৃহত্তর ঘটনাপঞ্জির প্রেক্ষিতে বর্তমান সমস্যার প্রভাব কীভাবে পড়বে, সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

২৪. ড. কিসিঞ্জার বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে নিরাপত্তা পরিষদের দেয়া নিশ্চয়তা ও অন্যান্য অঞ্চলে তার প্রভাবের আলোকে বর্তমান সমস্যাটি আমাদের অবশ্যই যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। সামরিক সরবরাহ পরিস্থিতিও আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। তিনি যুক্তি দেখান, যে কেউ বলতে পারে যে, বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে আমরা সম্ভাব্য সবকিছুই করছি, তবে তা কমপক্ষে দুই সপ্তাহ দেরিতে।

২৫. মি. প্যাকার্ড বলেন, একমাত্র যে সমাধানটি এখন আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়, তা সম্ভবত এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে এই আশায় আমাদের যথাসম্ভব দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

২৬. রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন, পাকিস্তানকে বাড়তি কোনো সামরিক সাহায্য দিলে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া আমাদের অবশ্যই যাচাই করে দেখা উচিত। এমনও হতে পারে যে, পশ্চিম অঞ্চলে সত্যিকারের লড়াই শুরু হলে আটটি এফ-১০৪ তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে না। এগুলোকে শুধু নমুনা হিসেবে দেখা যেতে পারে। আমাদেরকে প্রকৃতই যদি পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হতে হয়, তাহলে নতুন এক খেলায় আমরা যোগ দেবো।

২৭. রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিংকে একটা জবাব দেয়া যেতে পারে যেখানে ভারতীয় প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে, এলাকা দখলের জন্য তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তানিরা নিজেরাই যে কাশ্মির দখলের চেষ্টা করছে, সেটাও আমাদের বিবেচনায় আনা উচিত।

২৮. পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করে মি. প্যাকার্ড বলেন, এই মুহূর্তে অতি-প্রয়োজনীয় বিবেচ্য বিষয় হল, হয় কার্যকর কিছু করতে হবে, নতুবা কিছুই করা উচিত না। জয়লাভের সম্ভাবনা যদি এতে না থাকে, তাহলে এতে সংশ্লিষ্ট হবার প্রয়োজন নেই। আমরা যদি কিছু করার চেষ্টা করি, তাহলে এটাই নিশ্চিত করতে হবে যে, ফলাফলের ওপরে এর প্রভাব পড়বে। আমরা যদি জানি যে, আমরা হারব, তাহলে এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল।

২৯. মি. উইলিয়াম্‌স বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতির দিকে আমাদের এখন মনোসংযোগ করা উচিত। রাষ্ট্রদূত জনসন কলেন, এতে অবশ্য পাকিস্তানিরা কাশ্মিরের দিকে অগ্রসর হওয়া বন্ধ রাখবে।

৩০. ড. কিসিঞ্জার কাশ্মিরে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্ষমতা ও সম্ভাবনা যাচাই করতে বলেন। শ্রীমতি গান্ধীর সাম্প্রতিক কার্যকলাপের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সিআইএ-কে তিনি রিপোর্ট তৈরি করতে বলেন। তিনি বলেন যে, সামরিক সাহায্য দানের প্রশ্নে আমাদের প্রাথমিক একটি অবস্থান তৈরি করা উচিত। তিনি পুনরাবৃত্তি করেন, তিনি চান যে, পাকিস্তানকে সহায়তার প্রশ্নে হোসেনকে নিরস্ত না করে বরং অপেক্ষমাণ অবস্থায় রাখা হোক। মার্কিন সরকারের উচিত অবিলম্বে হোসেনকে জানানো যে, এ বিষয়ে তাঁর অনুভূতিকে আমরা কখনো তুচ্ছ করে দেখি না।

৩১. অবরোধ প্রশ্নে রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন, ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই অবরোধ আরোপ করেছে, যদিও পাকিস্তানের আরোপ করা অবরোধটি পুরোপুরিই কাগুজে। ড. কিসিঞ্জার বলেন, পাকিস্তানিদেরকেও আমাদের প্রতিবাদ জানানো উচিত। রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন, অবরোধের প্রতিবাদ করার কোনো আইনগত ভিত্তি আমাদের নেই। যুদ্ধ চলা অবস্থায় এ ধরনের অবরোধ আরোপের অধিকার বিবদমান দেশগুলোর থাকে। এটাকে আমরা অদূরদর্শিতা বলতে পারি এবং প্রশ্ন তুলতে পারি, কীভাবে এটা করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে,

আমরা স্বাভাবিকভাবে আমাদের উদ্বেগ ব্যক্ত করেছি। অন্যদিকে *এস এস বাকআই স্টেট (S S Buckeye State)*-এর ঘটনার প্রতিবাদ জানানোতেও আমাদের কোনো সমস্যা নেই।

৩২. ড. কিসিঞ্জার বলেন, আমরা নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করছি না। প্রেসিডেন্ট কী চান, সেটা নিয়ে কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। প্রেসিডেন্ট নিরপেক্ষ হতে চান না। প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস করেন যে, ভারত আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ভারত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করেছে, সেটাই আমরা ভুলে যাবার চেষ্টা করছি। ড. কিসিঞ্জার বলেন, ভারতকে আমরা স্বস্তিতে থাকতে দিতে পারি না। এই 'মহিলা' অত্যন্ত নিরাবেগ ও কঠোর; শুধু শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তিনি সোভিয়েতদের উপগ্রহে পরিণত হবেন না। তাঁকে আমাদের স্বস্তিতে থাকতে দেয়া উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, এমন যে কোনো কাউকে তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার আমন্ত্রণ জানান। তিনি জানান যে, রাষ্ট্রদূত কিটিং তাঁর নিজের দিক থেকে পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

৩৩. পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক বিবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ড. কিসিঞ্জার জানতে জান যে, কখন এ ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ ঘটছে, সে সম্পর্কে কারো পক্ষে কিছু জানা সম্ভব কি না। মি. হেম্‌স বলেন, খুব শিগ্‌গির আমরা কিছু জানতে না পারলেও ঘটনা ঘটার পর আমরা নিশ্চয়ই জানতে পারব।

৩৪. বেলা ১২:১০ মিনিটে সভা মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

/স্বাক্ষর/ এইচ এন কে
এইচ এন কে
ক্যাপ্টেন, ইউএসএন
সাউথ এশিয়া/এমএপি ব্রাঞ্চ, জে৫
এক্সটেশন ৭২৪০০

সূত্র: প্রাগুক্ত

টীকা: এতে ব্যবহৃত পরিভাষা

আইএসএ: ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স অভ্ ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট
আজাদ কাশ্মির: মুক্ত কাশ্মির, কাশ্মিরের পাকিস্তান অধিকৃত অংশের নাম
আর অ্যান্ড সি ফাইল্‌স: রেকর্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল ফাইল্‌স
ইউএসজি: ইউনাইটেড স্টেট্‌স গভর্নমেন্ট
এআইডি: এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভ্‌লপমেন্ট
এএসডি (আইএসএ): অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভ্ ডিফেন্স, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স
এনইএ: নিয়ার ইস্টার্ন অ্যাফেয়ার্স, সেকশন অভ্ স্টেট ডিপার্টমেন্ট

এনইএসএ: নিয়ার ইস্ট অ্যান্ড সাউথ এশিয়া
এনএসসি: ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল
এফ-১০৪: *স্টারফাইটার* জেট এয়ারক্র্যাফ্‌ট
এমএপি: মিলিটারি অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম
এলওসি: লাইন অভ্ কমিউনিকেশন
এস এস *বাকআই স্টেট*: পাকিস্তানি বন্দরে বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন জাহাজ
ওজেসিএস: অফিস অভ্ জয়েন্ট চিফ্‌স অভ্ স্টাফ
জেসিএস: জয়েন্ট চিফ্‌স অভ্ স্টাফ
ডাব্লিউএসএজি: ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের শাখা
ডিএএসডি, এনইএএসএ অ্যান্ড পিপিএনএসসিএ: ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভ্ ডিফেন্স, নিয়ার ইস্টার্ন, আফ্রিকান অ্যান্ড সাউথ এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স; ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভ্ ডিফেন্স, পলিসি প্ল্যান্‌স অ্যান্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল অ্যাফেয়ার্স
ডেপ. ডির., এনএসসিসি অ্যান্ড পিপিএনএসসিএ: ডেপুটি ডিরেক্টর, পলিসি প্ল্যান্‌স অ্যান্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল অ্যাফেয়ার্স
ডেপসেকডেফ: ডেপুটি সেক্রেটারি অভ্ ডিফেন্স
পাক্‌স: পাকিস্তানি
পিএল: পাবলিক ল
পিএল৪৮০: পাবলিক ল ৪৮০, সাহায্য হিসেবে বিদেশে প্রেরিত সরকারি উদ্বৃত্ত
পিওএল: পেট্রোলিয়াম, অয়েল অ্যান্ড লুব্রিক্যান্টস
পিডিএএসডি (আইএসএ): প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অভ্ ডিফেন্স, ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স
সিআইএ: সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি
সিজেসিএস: চেয়ারম্যান, জয়েন্ট চিফ্‌স অভ্ স্টাফ
সেকডেফ: সেক্রেটারি অভ্ ডিফেন্স
সেন্টো: সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন

(ঙ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ প্রকাশিত মি. জ্যাক অ্যান্ডারসনের রচনা

হোয়াইট হাউসের গোপন দলিলে বঙ্গোপসাগর ও গাল্‌ফ অফ্ টনকিন (Gulf of Tonkin)-এর মধ্যেকার বেশ কিছু অশুভ মিল লক্ষ করা যায়। ৪ আগস্ট ১৯৬৪-তে সংঘটিত গাল্‌ফ অভ্ টনকিনের ঘটনা ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকাকে পুরোপুরি জড়িয়ে ফেলে।

মার্কিন জনসাধারণকে বলা হয় যে, উত্তর ভিয়েতনামের টর্পেডো বোট বিনা উস্কানিতে মার্কিন ডেস্ট্রয়ারের ওপরে আঘাত হানে, যদিও পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, আক্রমণের জন্য উস্কানি দেয়া হয়েছিল।

বঙ্গোপসাগরে সংঘটিত একই ধরনের ঘটনা স্টেট ডিপার্টমেন্টে এমন এক গভীর আশঙ্কার জন্ম দেয় যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের তীব্রতার মতো সোভিয়েত টাস্ক ফোর্সের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র তার টাস্ক ফোর্স পাঠায়।

৭ ডিসেম্বর অতি গোপনীয় একটি হুঁশিয়ারি ওয়াশিংটনে বিস্তার লাভ করে যে, "তিনটি সোভিয়েত নৌজাহাজ, একটি সমুদ্রগামী মাইনসুইপার ও একটি ট্যাঙ্কার উত্তর-পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে।

"এই ইউনিটগুলো মালাক্কা স্ট্রেইট (Malacca Strait) থেকে ৫ ডিসেম্বরে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং ৭ ডিসেম্বর তারা সিলোন (Ccylon) থেকে ৫০০ নটিক্যাল মাইল পূর্বদিকে অবস্থান করছিল।"

হোয়াইট হাউসে জরুরি আলোচনার পর ১০ ডিসেম্বর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, নৌবাহিনীর সবচেয়ে শক্তিশালী বিমানবাহী জাহাজ *এন্টারপ্রাইজ (Enterprise)*-কে অগ্রবর্তী রেখে মালাক্কা স্ট্রেইটে মার্কিনী টাস্ক ফোর্স সমবেত করা হবে।

'শক্তি প্রদর্শন' এবং ভারতীয় বিমান ও জাহাজের মনোযোগ পাকিস্তানের ওপর থেকে সরানো ছিল এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

টাস্ক ফোর্স যথাস্থানে পৌঁছানোর পর ১১ ডিসেম্বর আমাদের প্যাসিফিক কম্যান্ডার অ্যাডমিরাল জন ম্যাককেইন (John McCain) 'সিলোনের আনুমানিক ১৮০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সোভিয়েত টাস্ক গ্রুপের ওপরে আকাশ থেকে নজর রাখার সম্ভাব্যতা' সম্পর্কে জানতে চান।

সেইদিনই অনুমোদন চলে আসে, 'এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে টাস্ক ফোর্স ৭৪কে মালাক্কা স্ট্রেইট ধরে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। উপযুক্ত সময়ে নজরদারির জন্য পর্যবেক্ষণ বিমান ব্যবহারের অনুমোদন দেয়া হল।'

স্ট্রেইট পেরিয়ে মার্কিনী যুদ্ধজাহাজগুলো বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের পর ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি থেকে আরো খারাপ রিপোর্ট আসে।

'সম্প্রতি যে খবরগুলো পাওয়া গেছে, তা থেকে মনে হয় যে, ভারত-পাকিস্তান বিরোধে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করছে।'

সংক্ষেপে বর্ণিত অতি গোপনীয় একটি রিপোর্ট: 'নির্ভরযোগ্য একটি গোপন সূত্রের মতে, [পাকিস্তানের] প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দাবি করেছেন আজ যে, ইসলামাবাদস্থ চীনা রাষ্ট্রদূত তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে চীনা সেনাবাহিনী সীমান্তের দিকে যাত্রা করবে।

'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দাবির সত্যতা যাচাই করা যায়নি। অবশ্য সাম্প্রতিককালে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের ভূমিকার বিরুদ্ধে পিকিংয়ের প্রচারণা আরো প্রবল হয়েছে।'

ইতোমধ্যে হিমালয়ের পাদদেশ কাঠমান্ডু থেকে সংবাদ এসেছে যে, মার্কিন মিলিটারি অ্যাটাশে মেলভিন হোল্স্টকে সোভিয়েত ও ভারতীয় মিলিটারি অ্যাটাশে জিজ্ঞাসা করেন, চীনা সেনাবাহিনী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের অগ্রগমন সম্পর্কে তিনি কী জানেন।

'সোভিয়েত অ্যাটাশে লোগিনভ (Loginov)', গোপন বার্তা অনুযায়ী, 'চীনা মিলিটারি অ্যাটাশে চাও কুয়াং চিহ্ (Chao Kuang Chih)-র সাথে কাঠমান্ডুতে দেখা করেন এবং তাঁকে বলেন যে, হস্তক্ষেপের ব্যাপারে চীনের বেশি আগ্রহ দেখানো উচিত নয়; কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে প্রচুর ক্ষেপণাস্ত্র, ইত্যাদি আছে।'

বার্তায় হোল্‌স্ট উপসংহার টেনেছেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত — উভয় দূতাবাসই চীনা হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ক্রমাগত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।'

পাশাপাশি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি একটি অতি গোপনীয় রিপোর্ট দেয়, 'গত ৮ ডিসেম্বর থেকে চীনারা তিব্বত ও সিনো-ভারতীয় (Sino-Indian) সীমান্তের জন্য আবহাওয়া বার্তা পাঠাচ্ছে। ক্রমাগত এ ধরনের আবহাওয়া বার্তা পাঠানোর ঘটনা অস্বাভাবিক এবং এটা সতর্কতামূলক কিছুর ইঙ্গিত দেয়।'

নয়া দিল্লী থেকে সিআইএ রিপোর্ট দিয়েছে: 'নির্ভরযোগ্য একটি গোপন সূত্রের মতে, প্রধানমন্ত্রী গান্ধী তাঁর কংগ্রেস পার্টির এক নেতাকে বলেছেন যে, চীনারা যে ভারতের উত্তর সীমান্তে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে, তার ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন শ্রীমতি গান্ধী বলেছেন যে, চীনারা লাদাখ অঞ্চলে আক্রমণ চালাতে পারে।'

ভারতে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত নিকোলাই এম পেগোভ (Nicolai M Pegov) ১৩ ডিসেম্বর অবশ্য প্রতিশ্রুতি দেন যে, সোভিয়েতরা 'চীনাদের মনোযোগ ভিন্নদিকে নিবদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে' এবং 'সপ্তম নৌবহরকে প্রতিরোধ করবে।'

এখানে মারাত্মক সোভিয়েত আবেদনের সারসংক্ষেপ দেয়া হল, যা সিআইএ-র ভাষ্য অনুযায়ী 'নির্ভরযোগ্য সূত্র' থেকে পাওয়া।

'পেগোভ বলেছেন যে, পাকিস্তান এই যুদ্ধের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন — উভয়কেই জড়াতে চাইছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য বিশ্বাস করে না যে, এদের কেউ এতে হস্তক্ষেপ করবে।

'পেগোভের ভাষ্য অনুযায়ী, সপ্তম নৌবহর হল ভারতকে বোকা বানানোর জন্য এক মার্কিনী চাল, যাতে ভারত পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ থেকে বিরত থাকে এবং একই সাথে পাকিস্তানি সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

'পেগোভ উল্লেখ করেছেন যে, সোভিয়েত নৌবহর এখন ভারত মহাসাগরে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সপ্তম নৌবহরকে প্রতিরোধ করবে।

'চীন যদি লাদাখ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন সেক্ষেত্রে সিনকিয়াং (Sinkiang) আক্রমণ করে তাদের মনোযোগ অন্যদিকে প্রবাহিত করবে।'

পেগোভ আরো মন্তব্য করেন যে, ঢাকা মুক্ত হবার পর সেখানে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের আর কিছু করণীয় থাকবে না এবং সেক্ষেত্রে এই সঙ্কটের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হবে।"

এভাবেই বৃহৎ শক্তিবর্গ ধ্বংসস্তূপের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছিল ঠিক ক্রিসমাসের আগে, যখন মানুষ পৃথিবীতে শান্তি ও কল্যাণের গান গায়।

সূত্র: *ডেইলি টেলিগ্রাফ* (লন্ডন), ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

নির্ঘণ্ট

অপারেশন জ্যাকপট ৬৯,৭০,১৫১
অস্থায়ী সরকার ২৯, ৩০, ৬৯, ১০৬, ১৩৬
অ্যান্ডার্স, জেনারেল ৬
অ্যালান হার্ট ৩২, ১১৮

আইউব খান ১৮
আওয়ামী লীগ ১৯, ১৭৮, ১৮০, ১৮২, ১৯৮
আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ ১৮
আগড়তলা ১৮, ২০, ৩২, ৪৬, ১১৮, ১২১
আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা ১৮
আজমত হায়াত, ব্রিগেডিয়ার ১৫
আনন্দ স্বরূপ, ব্রিগেডিয়ার ৯৯
আনসার ১৯
আবদুল মজিদ কাজি, মেজর জেনারেল ৬৪, ৯৫
আর ডি হিরা, মেজর জেনারেল ৫২, ৫৪, ১৭০
আর্টিলারি স্কুল ৩, ১৪, ১৫, ৬২
আত্মসমর্পন দলিল ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৯, ১২৩

ইমাম, এয়ার কমোডর ১১৫
ইয়াহিয়া খান, জেনারেল ১৮, ১৯, ৭৮, ৮২, ১১০, ১১১,১৮০, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ২০০, ২০১, ২০৭, ২০৮, ২২৫
ইন্দর গিল, মেজর জেনারেল ৩৫, ৩৯, ৬৭, ৭৭, ৭৮, ৮৬, ১০২, ১০৭, ১৩৩, ১৩৬, ১৫৫
ইন্দিরা গান্ধী, প্রধান মন্ত্রী ২১, ৫৩, ৭৯, ৮২, ১৩৪, ১৫৭, ১৮৩, ২০৭, ২১৮, ২২২, ২২৬
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৩৩, ৭৬
ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ৩১, ৬৯
উসমান, মেজর ৬৯
উ থান্ট ৭৯, ১৮৭

এ এম মালিক, ডক্টর ১১০, ১১১
এইচ এস ক্রের, ব্রিগেডিয়ার ১০২,১৫৩
এ কে ফিলিপ, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল ১৫৪
এ কে রায় ৮০
এম আর আপ্তে, মেজর ১০
এম এ খাড়া, কর্নেল
এম এইচ আনসারী, মেজর জেনারেল ৬৪
এম এল থাপান, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল ৫০, ৫২, ১৭২
এম এস বারার, মেজর জেনারেল ১৬৮
এম থমাস ১৭৫
এল কে ঝা ৭৭, ৮১, ২০০
এস এস রাই, ব্রিগেডিয়ার ১০১

ও পি মালহোত্রা, মেজর জেনারেল ৬৬
ওয়েলিংটন ১০
ওসমানী, কর্নেল এম এ জি ২৪, ৩১, ৬৯, ৭৬, ১১৪, ১২০, ১২১
ওঙ্কার সিং কালকাট, মেজর জেনারেল ৬৯

কলকাতা ১৬, ২০,২৪, ২৯, ৩১, ৩২, ৪৭, ৪৮, ৫৪, ৬১, ৬৯, ৮২, ১০১, ১০৬, ১১৯, ১২৩
কলকাতাস্থ সার্ভে অভ ইন্ডিয়া ৩৩
কলেজ অব কমব্যাট ১৩৯
কিটিং, কেনেথ বি ৮০, ৮১, ২০০, ২২০, ২২৩
ক্রিস্টিনসন, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল ৬
কিসিঞ্জার, ড: হেনরি ৭৭, ৭৮ , ৮০, ৮১, ১১৩, ১৯৭, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২২০
কৃষ্ণ রাও, মেজর জেনারেল ৪৭, ৫১, ৫৪, ১৩৩

কৃষ্ণ মেনন ১১, ১২, ৩৮, ১৩১
কৃষ্ণন, ভাইস অ্যাডমিরাল ৪৬, ৪৮, ৮৪, ১০৯, ১২০, ১২১
কে কে সিং, মেজর জেনারেল ৩৯, ৪৮, ৪৯, ১৫০
কে ভি কৃষ্ণ রাও, মেজর জেনারেল ১৭০

খন্দকার, উইং কমান্ডার ২৪, ৩১, ৬৯, ১১৪, ১২০
খারা, কর্নেল ইনটেলিজেন্স ২৯, ৩৯, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৯
খালেদ মেশাররফ, মেজর ৬৯,
খুলনা ৪১, ৪৯, ৫৪, ৭০, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ১০৫, ১৩৬, ১৪৮, ১৬৫,

গীতা মেহ্‌তা ৩২
গুরবক্স সিং গিল, মেজর জেনারেল ৫৭, ৬৮, ১৩৩, ১৭৫
গ্রুব'স অ্যারাব লেজিয়ন ৬
গোপাল বেয়ূর, মেজর জেনারেল ১৪
গোলক মজুমদার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ২১
গ্রোমিকো, এ এ ১৯১, ১৯৪
গ্যাভিন ইয়ং ১১০, ১১৮

চট্টগ্রাম ১৯, ৩৩, ৪১, ৪৯, ৫৩, ৬৪, ৭৬, ৮০, ৯৯, ১০০, ১০৫, ১২৫, ১৩৬, ১৪৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৬, ২১৩, ২১৭
চজ্জু রাম ৩৯, ৪৭, ৬৩
চি পেং ফেই ১৯৫
চেম্বার্স, মেজর জেনারেল ৭
চ্যবন, ওয়াই বি ১৫৮
চ্যাং টুং ১৮৬
জগজিৎ সিং অরোরা, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল ২৯, ৩৮, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৪, ৭০, ৮২, ৯৯, ১০৩, ১০৫, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১৩২, ১৩৬
জগজীবন রাম ১৩১, ১৫৮
জর্জ বুশ ১০৭, ২০৭, ২০৯
জন কৈলি ১০৬, ১১০
জলিল, মেজর ৬৯
জাতিসংঘ ৭৯, ৮০, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১৬, ১৩৪, ১৮৭, ১৯৯, ২০১, ২০৮, ২০৯, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৮
জাতীয় পরিষদ ১৮০, ১৮৩
জামান, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল ৬৯
জামশেদ, মেজর জেনারেল ১১৫
জিয়া, মেজর ১৯, ৬৯
জি এস গিল ৫২
জি সি নাগরা, মেজর জেনারেল ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১৭৫
জেনকিন্‌স, ব্রিগেডিয়ার ৫
জেনেভা কনভেনশন ১০৬, ১১৫, ১১৭
জোসেফ ফারল্যান্ড ২০১
জ্যাক আন্ডারসন ২০০, ২০২, ২২৪

ঝাঁসির রানি ৩

টনি ক্লিফটন ৩২
টমাস, কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ১০২
টিক্কা খান, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল ১৯
টি এন রায়না, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল ৫৪,১৬৭,
টি এন, কাউল ৭৯
ট্যাপি রায়না, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল ৫০, ৫২, ৮৬, ৯০, ১৩৩

ডসন, অ্যাডমিরাল ১৫৭
ডিক পিটার্স, মেজর ৪
ডি পি ধর ৫২, ৭৯, ৮০, ১৩৪
ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ ১৪

তাজউদ্দিন আহমেদ ২২, ২৪, ২৯

থাপার, জেনারেল ১৫৮
থাপার, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল ১৪
থিমাইয়া, জেনারেল ১১

দবির ৪৬
দলবীর সিং, মেজর জেনারেল ৫০, ৫২, ৫৪, ১৬৮
দাল সিং, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল ৭৮
দেওলালি ৩, ১০, ১৫
দেওয়ান, এয়ার মার্শাল ১২০
দেওলালি আর্টিলারি স্কুল ১০
দেবাশর, এয়ারভাইস মার্শাল ৫৮, ১০০, ১১০
দৌলত সিং, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল ৩৮

নজর হুসাইন সাকের, মেজর জেনারেল ৬৪
নজরুল ইসলাম ২৪
নরম্যান হার্ডিং ৪
নরিন্দর সিং, মেজর জেনারেল ২১
নিক্সন ৩২, ৭৯, ৮১, ১৩৪, ১৯৮
নিকোলাস টোমালিন ৩২, ১২১
নিয়াজী, জেনারেল ৩০, ৫৩, ৮৮, ৯৫, ১০৩, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৯

পাকিস্তান ইস্টার্ন কম্যান্ড ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১৩৫
পাকিস্তান পিপ্‌লস পার্টি ১৮, ১৮১
পি কে ঘোষ, ব্রিগেডিয়ার ক্যাপ্টেন ৫৮, ১০৩
পি এন হাকসার ৭৯
পি এন ধর ৭৯
পি সি ভল্ল, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল ৩৪, ১০৬, ১১০
পি সি রেড্ডি, মেজর জেনারেল ১৭৩
পি সি লাল, এয়ার চিপ মার্শাল ৩৬, ১০৯, ১২৪, ১৩৮, ১৩৯
পুরুষোত্তম, এয়ার কমোডর ১১৪, ১১৫
প্রেম চাঁদ, ব্রিগেডিয়ার ১৪

ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ ১৫৮
ফরমান আলী রাও, মেজর জেনারেল ১১০, ১১২, ১১৫, ১১৬
ফিল্ড আর্টিলারি ট্রেনিং সেন্টার, মথুরা ১৪১
ফোর্ট সিলের ফিল্ড আর্টিলারি মিসাইল স্কুল ১৩
ফ্যাটি ফ্রোয়েন, ব্রিগেডিয়ার ১০

বকর সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার ১১৪, ১১৫
বগুড়া ৪১, ৪৫, ৫০, ৫৩, ৯৪, ১০৭, ১৬৫
বর্তার সিকিউরিটি ফোর্স ২১, ২৯, ৬৭
বসরা ৪
বন্যা কেউলি ৩২
বাগদাদ ৪
বাঘা সিদ্দিকী ৫৭, ৬৮, ৬৯, ৭৬, ১০৪, ১১৯, ১২০
বাঙালী নেতা ২৪
বারার, মেজর জেনারেল ৫৪
বালি ৯
'বাবা' ভিদে, ব্রিগেডিয়ার ৩৯
ব্যারি গোল্ডওয়ার ১৯৭
বাশার, উইং কমান্ডার ৬৯
বি এফ গনজালভেস, মেজর জেনারেল ৫২, ৫৪, ৯৭, ১৩৩, ১৭১
বি এম কাউল, মেজর জেনারেল ১১, ১৩, ১৪, ৩৭, ৩৮, ১৩১
বি এস (ডিমি) সরকার, মেজর জেনারেল ৭০
বি এস এফ ১৫৮
বিল স্লিম, জেনারেল ৬
ব্রিগস, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্নেল ৫
ব্রিটিশ গ্যারিসন ব্যাটালিয়ন ২

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি ১৯১
ভান্তি অরোরা ১১৪, ১২০
ভুট্টো ১৮, ১৯, ৮২, ১০৭, ১২৫, ১৮০, ১৯৫

মতিসাগর, লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জেনারেল ১৬
মন্টগোমারী, জেনারেল ১০
মানেকশ, মেজর জেনারেল এস এইচ এফ জে ১৪, ১৬, ২০, ২১, ২৯, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৭০, ১১৩, ১১৪, ১২১
মার্ক হেনরি ১০৬, ১১০

ম্যাথু থমাস, ব্রিগেডিয়ার ৫৮, ৮৬
মুজাহিদ ১৯,৬৫, ১৬১, ১৬৪
মুজিবনগর ২৪, ৬৯, ৭৯
মুক্তিবাহিনী ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৮০, ৮৯, ১০২, ১০৬, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১৩২, ১৩৬, ১৪৭, ১৫০, ১৫৩, ২১৩,
মেলভিন হোলস্ট, কর্নেল ১০৮, ২২৫
মোহন থাপান, মেজর জেনারেল ১৩৩

রজার্স, উইলিয়াম ২০০
রবার্ট জ্যাকসন ৩০
রাজাকার ১৯, ৬৫
রাসেল 'পাশা', ৪
র‍্যামরী দ্বীপ ৭
র‍্যালফ সেটাট্রি ৪
রিজার্ভ অফিসার্স ট্রেনিং কোর ১৩
রিচার্ড সিসন ৮২
রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং ৩৩
রুস্তমজী, কে ২১, ২৩, ২৯, ১৩১
রুহুল আমিন খান, মেজর জেনারেল ৬৫
রেড্ডি, মেজর জেনারেল ৫৩
রোজ, জেনারেল স্যার হিউ ৩

লছমন সিং, মেজর জেনারেল ৪৫, ৫৩, ১৩২, ১৭৩,
লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন ৭,৮
লক্ষনন, লেফ্‌টন্যান্ট কর্নেল ১১
লা মেয়ূর ৯
লার্ক হিল ১০
লাদাখ ১৪, ১৫, ১২৫, ২২০, ২২৬
লিও রোজ ৮২

শরন সিং ১৫৭, ১৯১, ১৯৪, ২০০
শরিফ, রিয়ার অ্যাডমিরাল ১১৫, ১২১
শেখ মুজিবুর রহমান ১৮, ১৯, ১২৪, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৯৮, ২০১
সগত সিং, লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল ৫১, ৫২, ৫৪, ১২০, ১৩৩, ১৬৯
সন্ত সিং, ব্রিগেডিয়ার ৫৭, ৬৮, ১০৪
সমীর সিনহা, ব্রিগেডিয়ার ১২৩
সাবেক সিং, ব্রিগেডিয়ার ৯৯
সামন্ত, কমোডর ৭০
সাম্বা ১৫
সান্ধু, ক্যাপ্টেন ২২
সাবনিন, মেজর ৮
স্টাফ কলেজ ১৩৯
সিভিল অ্যাফেয়ার্স সেল ১২৩
সিভিল অ্যাফেয়ার্স অর্গানাইজেশন ১২৪
সিন্দে, লেফ্‌টন্যানট কর্নেল ৩৭
সিডনি শ্যানবার্গ ৩২, ৮৪
সিদ্দিক সালিক ৩০, ১০৮, ১১৬
সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ১২১
সিমলা ২, ১২৫, ১২৬
সুদ্দার, কর্নেল ১০৩
সুমাত্রা ৮, ১৪১
সুজন সিং উবান, মেজর জেনারেল ১০০
সুলতান, লেফ্‌টন্যান্ট কর্নেল ১০২, ১৫৩
সেনথা, ব্রিগেডিয়ার ৩২, ৩৮, ৬১, ৬৩, ৭৮, ১০৬, ১০৮, ১১৩, ১১৪
সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী চুক্তি ১৩৪

হরপ্রসাদ, লেফ্‌টন্যান্ট জেনারেল ৩৯
হার্বার্ট গর্ডন ১১২
হার্বার্ট স্পিভ্যাক ১১২, ১১৩, ১১৬
হাসান জহির ১১৩
হামদুদুর রেহমান, বিচারপতি ১০৭
হামিদ, জেনারেল ১১১
হার্ডিঞ্জ রেলওয়ে ব্রিজ ৪০, ৪৯, ৫০, ৫৪, ৯০, ১০৫, ১৫৪
হেইডিম্যান, মেজর জেনারেল ২

ইউপিএল প্রকাশনা

আবু সাঈদ চৌধুরী
প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি

রংগলাল সেন প্রমুখ *অনূদিত*
এ কে নাজমুল করিম
পরিবর্তনশীল সমাজ
ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

নুরুল ইসলাম
বাংলাদেশ জাতি গঠনকালে
এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা

মঈদুল হাসান
মূলধারা '৭১

মহিউদ্দিন আহমেদ ও
মুনতাসীর মামুন *সম্পাদিত*
পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর

মুনতাসীর মামুন
সেই সব পাকিস্তানী

শাহ আহমদ রেজা *অনূদিত*
রাও ফরমান আলী খান
বাংলাদেশের জন্ম

সংকলন ও সম্পাদনা:
ড. রংগলাল সেন ও অন্যান্য
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান

জেমস জে. নোভাক
বাংলাদেশ
জলে যার প্রতিবিম্ব

ISBN 978 984 8815 64 9
9789848815649